ভারতের সাধক

ঙ্কর নাথ রায়



ভারতের সাধক

১৩৭০ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত
মহান জীবনী-গ্রন্থ

ভারতের সাধক

৮ম খণ্ড

শঙ্করনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৫

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
সুপ্রকাশ সেন

নয় টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতের সাধক-এর অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই মহান গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলো বাংলার বিশিষ্ট সমালোচক ও সংবাদপত্রের অভিনন্দন বহু পূর্বেই লাভ করেছে। পাঠক-সাধারণও জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের আন্তরিক সমর্থন।

সর্বোপরি ১৩৭০ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কার জয়ী হয়ে এই জীবনী-গ্রন্থ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে গণ্য হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের সাধক-এর হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং হিন্দি সাহিত্য রসিকেরা এ গ্রন্থকে জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও সংবর্ধনা।

বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত আর কোন বাংলা গ্রন্থই সমকালীন বাংলায় বা বহির্বাংলায় এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বলে আমরা জানিনে।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণরস যুগিয়ে আসছেন আমাদের সাধকেরা—অধ্যাত্মজীবনের মহান শিল্পীরা। এঁদের ভেতর রয়েছেন যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক ও মরমীয়া সাধকগোষ্ঠী। বিচিত্র সাধনা ও বিচিত্র মতবাদের ভেতর দিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন শাশ্বত মানব-ধর্মের ঐকতান। এই সাধকদেরই প্রামাণ্য ও পরম রম্য জীবনী রচনা করেছেন গ্রন্থকার, আর সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ভারত-সাধনার প্রকৃত পরিচয়। বলা বাহুল্য, এই পরিচয়ের ভেত নিহিত রয়েছে ভারতবাসীর সত্যকার আত্ম-পরিচয়।

সাধন-অনুভূতি ও আত্মিক বিশ্লেষণ যেমন লেখকের এই রচনাগুলিতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে মনীষা ও সাহিত্যিক প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। ফলে প্রত্যেকটি জীবনী হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, লোকোত্তর মহাপুরুষরা এসে ধরা দিয়েছেন আমাদের মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে। 'ভারতের সাধক' তাই হয়ে উঠেছে এখন অনন্যসাধারণ, বাংলা সাহিত্যে অধিকার করেছে চিরস্থায়ী আসন।

এই কল্যাণকর মহান গ্রন্থের প্রকাশনার সুযোগ পেয়ে আমরা গৌরব বোধ করছি।

প্রকাশক

পরম সুহৃদ ৺হেমচন্দ্র সোমের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
—শঙ্করনাথ

সূচীপত্র

১।	আচার্য্য মধ্ব	১
২।	সনাতন গোস্বামী	৪১
৩।	সমর্থ রামদাস	৮৯
৪।	একনাথ স্বামী	১৪৬
৫।	বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী	১৬৭
৬।	স্বামী বিবেকানন্দ	২০৫

আচার্য্য মধ্ব

ভারতের আত্মিক সাধনা ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের অবদান যেমনি বিপুল তেমনি বৈচিত্র্যময়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমভক্তির নানা সাধনা ও দার্শনিকতার ধারা এই প্রাচীন ভূখণ্ড হইতে উৎসারিত হইয়াছে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেশের দিক্‌বিদিকে।

দক্ষিণভারত আমাদের উপঢৌকন দিয়াছে তাহার যৌগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন শৈবসাধক আর প্রেমভক্তি-সিদ্ধ আড়বার গোষ্ঠী, দিয়াছে শঙ্করের মত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য। রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক বিদ্যারণ্য, জ্ঞানদেব, তুকারাম প্রভৃতি সিদ্ধ সাধক ও ধর্ম্মনেতার একের পর এক এখানে ঘটিয়াছে অভ্যুদয়।

ত্রয়োদশ শতকে আচার্য্য মধ্বের আবির্ভাব শুধু দক্ষিণ ভারতেরই নয়, সমগ্র ভারতেরই এক স্মরণীয় ঘটনা। ব্রহ্মসূত্রের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তিনি এক নবতর দ্বৈতবাদী দর্শনের প্রচার করেন। তাঁহার নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবীয় সাধনা, ভাবময় প্রেরণা ও সংগঠনশক্তি ভক্তি-আন্দোলনকে নূতন প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তোলে। ভারতীয় জন-জীবনে আচার্য্য মধ্ব পরিচিত হইয়া উঠেন ভক্তিবাদী চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে। তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব ও ধর্ম্মাদর্শ যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বল্লভাচারীদের মতবাদকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়াছে একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই।

মধ্ব আবির্ভূত হন ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে।[১] ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম

---

১ মতান্তরে ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে। দ্রঃ Subba Rao : Bhagabat Gita. R. G. Bhanderkar : Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems pp. 59—। স্বরচিত গ্রন্থ 'ভারত তাৎপর্য্য নির্ণয়'-এ মধ্ব আপন জন্ম সম্বন্ধে যে শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দেরই নির্দ্দেশনা দেয়। শ্রীকুর্ম্ম-এ মধ্বের প্রশিষ্য স্বামী নরহরি তীর্থের এক অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনুশাসন মধ্বের জীবনকাল নির্ণয়ের সহায়ক।

উপকূলের কাছাকাছি বেলে-গ্রামের পাজকা ক্ষেত্র তাঁহার জন্মভূমি। তখনকার দিনে এ অঞ্চল ছিল তুলুব দেশের অন্তর্গত। আজিকার দিনের ধারোয়ার জেলা, উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া এবং মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম অংশ নিয়া গঠিত ছিল ত্রয়োদশ শতকের তুলুব। আজও ইহার একাংশ তুলুব নামে পরিচিত। শঙ্করের জন্মস্থান শৃঙ্গেরী ও ম্যাঙ্গোলোরের দূরত্ব মধ্বের জন্মস্থান হইতে চল্লিশ মাইলের বেশী হইবে না।

পাজকার তিন ক্রোশ দূরেই সাগর বিধৌত পবিত্র তীর্থ উড়ুপী।[১] শেষশায়ী অনন্তেশ্বর বিষ্ণু ও চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব, এই দুই জাগ্রত বিগ্রহের মন্দির এখানে অবস্থিত। দেশের দূর দূরান্ত হইতে ভক্ত নরনারী এখানে সমবেত হয়, স্নান তর্পণ ও পূজা শেষে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যায়। বিষ্ণুভক্ত ও শিবভক্তদের এই মিলনভূমিই উত্তরকালে পরিচিত হইয়া উঠে আচার্য্য মধ্বের সাধনপীঠ ও লীলাকেন্দ্ররূপে। ভক্তি-সাধনার এক নূতন ধারা তাঁহার মাধ্যমে এখান হইতে উৎসারিত হয়। তাঁহার উত্তরসূরী ও ভক্ত শিষ্যদের স্মৃতিও এই পবিত্র তীর্থের সহিত নানাভাবে বিজড়িত রহিয়াছে।

মধ্বের পিতার নাম মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্ট। প্রতিভাধর আচার্য্য হিসাবে ভট্ট এ অঞ্চলে সুপরিচিত। বেদ-বেদান্তে তিনি পারঙ্গম, আবার সাধন-জীবনে নিষ্ঠাবান বিষ্ণুভক্ত। স্ত্রী বেদবতী যেমনি রূপসী তেমনি মহাভক্তিমতী। গৃহে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত। এই শিলাময় দেববিগ্রহের সেবা, ভোগরাগ, ধ্যানজপে অধিকাংশ সময় তাঁহাদের অতিবাহিত হয়। বিশেষ বিশেষ পার্ব্বণের দিনে

---

১ উড়ু অর্থে নক্ষত্র, 'প' হইতেছে পতি। নক্ষত্রপতি অর্থাৎ চন্দ্রের নাম উড়ুপ। চন্দ্রের তপস্যায় প্রসন্ন যে শিব তিনিই এ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাই চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের নাম অনুসারে এ তীর্থের নাম হইয়াছে উড়ুপী। প্রাচীন কালে উড়ুপী রজতপীঠপুর নামেও আখ্যাত হইত।

উভয়ে ভক্তিভরে গিয়া উপস্থিত হন উড়ুপীতে। কুলদেবতা অনন্তেশ্বর নারায়ণের অর্চ্চনায় প্রাণমন ঢালিয়া দেন।

মধ্যগেহ ভট্ট মোটেই বিত্তবান নন। সম্বলের মধ্যে রহিয়াছে পৈতৃক একটি বাসগৃহ আর একটি বাগিচা। এই বাগিচার ফসল আর অধ্যাপনার সামান্য কিছু আয় দিয়াই কোন মতে তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

ভট্টবংশ খুবই প্রাচীন। কর্ম্মকাণ্ডের বিখ্যাত আচার্য্য কুমারিল ভট্টের অনুগামী ব্রাহ্মণ ইঁহারা। পঞ্চ বা ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে বনবাসী কদম্ব রাজ ময়ূর বর্ম্মণ এই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণদের কয়েকটি দলকে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় হইতে এই ভট্ট ব্রাহ্মণেরা তুলুব অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। যজ্ঞক্রিয়া, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও শুদ্ধতর জীবনচর্য্যার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এই আগন্তুক ব্রাহ্মণেরা সমাজনেতারূপে নিজেদের করেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণদের অনেকে দুই এক পুরুষের মধ্যেই শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের অনুগামী হইয়া পড়েন। সাধারণভাবে তাঁহাদের মধ্যে শিবভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়।

কালক্রমে এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বিষ্ণু-উপাসনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। আচার্য্য মধ্বের পিতা মধ্যগেহ ভট্ট ছিলেন এমনি এক ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।

মধ্যগেহ ভট্টের দুই পুত্র ও এক কন্যা। কিন্তু ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস, নিতান্ত তরুণ বয়সে দুইটি পুত্রই একে একে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শোকের আঘাতে ভট্টদম্পতি একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন।

কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু পুত্রশোকের দহনজ্বালা মধ্যগেহ তখনো ভুলিতে পারেন নাই। তাছাড়া, মনে এক নূতন দুশ্চিন্তাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ তিনি। বার বারই ভাবিতে থাকেন, অপুত্রক অবস্থায় এদেহ ত্যাগ করিলে

পিণ্ডদান করার তো কেহ থাকিবে না। মাঝে মাঝে তাই উড়ুপীতে অনন্তেশ্বর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, ইষ্টের চরণে নিবেদন করেন অন্তরের আকুতি!

সেদিন ছিল দশহরার শেষ দিন—নবমী। মধ্যগেহ ভট্ট উড়ুপীর নারায়ণ মন্দিরে বসিয়া একমনে জপ ধ্যান করিতেছেন। ভাবতন্ময় অবস্থায় প্রহরের পর প্রহর কি করিয়া কাটিয়া যায় হুঁস নাই। রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠে। ভক্ত দর্শনার্থীরা একে একে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের শয়ান শেষে দীপ নিভাইয়া পূজারীরা নিজ নিজ কক্ষে বিশ্রামরত। শুধু ভক্তপ্রবর মধ্যগেহ ভট্ট শ্রীমূর্তির সম্মুখে রহিয়াছেন ধ্যানস্থ।

হঠাৎ গর্ভ-মন্দিরটি এক ঝলক শুভ্র স্নিগ্ধ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। ভট্টের ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়। বিস্ময়ে আনন্দে তিনি অভিভূত। এসময়ে কানে আসে এক দৈবী কণ্ঠস্বর। করুণা বিগলিত কণ্ঠে ঠাকুর কহেন, "আমার প্রিয় ভট্ট, তুমি প্রচণ্ড শোক পেয়েছ তরুণ বয়সের পুত্র দুটি হারিয়ে। কিন্তু কি করবে বল? প্রাক্তন খণ্ডিত হয়েছে, তাই তো আর তাদের থাকা সম্ভব হয় নি, মর্ত্ত্য থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। দুঃখ ক'রো না ভট্ট,—শোক যেমন আঘাত হানে তেমনি আনে পরম কল্যাণ। শোক মানুষকে করে আত্মস্থ, করে পবিত্রতর।"

মধুর মোহময় ঝঙ্কার প্রভুর দিব্যকণ্ঠে। কিন্তু ভট্টের বুকে তাহা অনুরণন তোলে কই? উপর্য্যুপরি দুইটি পুত্রশোকে হৃদয় তাঁহার আজ মরুভূমি। তাহা শীতল হয় কই, শান্ত হয় কই?

প্রভু আবার স্নেহার্দ্রস্বরে বলিতে থাকেন, "ভট্ট, জেনে রাখো, মানুষ শূন্য হয় পূর্ণ হবে বলে, রিক্ত হয় সিক্ত হবে ব'লে। শোক-বিষাদের কালিমা ঝেড়ে ফেল। আর খেদ করো না। ঈশ্বরীয় বিধানে এক শুদ্ধাত্মা কুলপবিত্রকারী পুত্র আসবে তোমার গৃহে। নবতর ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ হবে সে। আজকে দশহরার

শেষ দিন—নবমী। তোমার একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হবে ঠিক একবৎসর পরে, এমনি পবিত্র তিথিতে।”

দৈবী বাণীর রেশ ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, কিন্তু মধ্যগেহ ভট্টের হৃদয়ে এই বাণী তুলিয়া দেয় ভাবোচ্ছ্বাসের এক উত্তাল তরঙ্গ। অপার আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরপুর ভট্ট তখনই ছুটিয়া যান পাজকায় নিজগৃহে। পুলকভরা কণ্ঠে গৃহিণী বেদবতীর কাছে বর্ণনা করেন মন্দিরের অত্যাশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার কাহিনী। আনন্দাশ্রু ঝরিতে থাকে দুই নয়নে।

উড়ুপীর অনন্তেশ্বর মন্দিরের দৈববাণী ফলিয়া যায়। ঠিক এক বৎসরের ব্যবধানে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের নবমী তিথিতে এক শুভলগ্নে ভট্টগৃহিণীর কোল আলো করিয়া আবির্ভূত হয় এক শিশুপুত্র—উত্তরকালে যে কীর্ত্তিত হইয়া উঠে মহাসাধক মধ্বাচার্য্য নামে।

যেমনি অনিন্দ্যসুন্দর, তেমনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত এই শিশু। ভক্ত ভট্টদম্পতির আনন্দের আর অবধি নাই। ঠাকুরের কৃপাপ্রসাদ-রূপে পাইয়াছেন এই পুত্রটিকে—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই তাহার নাম রাখিলেন বাসুদেব।

বাসুদেবের বাল্য জীবনের নানা অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।[১] একদিন সাথীদের নিয়া সে খেলায়

১ মধ্ব-শিষ্য পণ্ডিত ত্রিবিক্রম আচার্য্যের পুত্র নারায়ণ আচার্য্য মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী নামে নানা কাহিনী সম্বলিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। পৌরাণিক ভঙ্গীতে রচিত এই দুইটি গ্রন্থে মধ্ব সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। মধ্ব জীবনের রূপরেখা অঙ্কনে নারায়ণ আচার্য্যের রচনা আমাদের সাহায্য করিলেও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও অযৌক্তিক শঙ্কর বিরোধিতার ফলে গ্রন্থ দুইটির মূল্যহানি ঘটিয়াছে। আচার্য্য ত্রিবিক্রম, নারায়ণ প্রভৃতি শিষ্যেরা মধ্বকে বায়ুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। মাধ্ব বৈষ্ণবদের মতে, পৃথিবীতে যখনই নারায়ণ অবতার-রূপে আসিয়াছেন, তখনই তাহার সহায়ক হইয়া আসিয়াছেন বায়ু। রাম ও কৃষ্ণ অবতারের সহায়ক হনুমান ও ভীম উভয়েই বায়ুপুত্র। শেষ অবতার মধ্বাচার্য্য।—প্রজ্ঞানানন্দ: বেদান্তদর্শন, পৃষ্ঠা ৫১৮

মাতিয়া আছে। হঠাৎ দেখা গেল, একটি দুর্দ্দান্ত ষাঁড় নিকটস্থ রাস্তা দিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। বালক বাসুদেবের কি এক অদ্ভুত ঝোঁক চাপিয়া যায়—তড়িৎবেগে ষাঁড়ের পুচ্ছ ধরিয়া সে ঝুলিয়া পড়ে। ষাঁড়টিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া উঠে, দ্রুতবেগে ধাবিত হয় সম্মুখের এক নিবিড় অরণ্যে। সঙ্গী সাথীরা ভয়ে সন্ত্রস্ত, আর্ত্তস্বরে সবাই চীৎকার করিতে থাকে, ভট্টগৃহের আশেপাশে মহা সোরগোল পড়িয়া যায়। ধর্-ধর্ শব্দে সবাই পশ্চাদ্ধাবনে রত হয়।

বাসুদেব সেদিন যেন এক উদ্দাম খেলায় মাতয়া উঠিয়াছে। পুচ্ছ হইতে সে যেমন তাহার বজ্রমুষ্টি শিথিল করিবে না, ষণ্ডপ্রবরও কোনমতে হার মানিতে রাজী নয়। বন-বাদাড়, কণ্টকময় পথে কয়েক প্রহর ছুটাছুটির পর ক্লান্তদেহ ষাঁড়টি অবশেষে মধ্যগেহের বাড়ীর কাছে আসিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। বালক বাসুদেবের চোখে মুখে তখন তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকলের উদ্বেগ-ভরা প্রশ্নের উত্তরে সগর্ব্বে সে তাহার অদ্ভুত বন-ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল।

আর এক দিনের কথা। একটি বিশেষ পার্ব্বণ উপলক্ষে সন্ধ্যার পর ভট্টদম্পতি বাসুদেবকে নিয়া উড়ুপীর অনন্তেশ্বর মন্দিরে গিয়াছেন। স্নান তর্পণ পূজা সমাপন করিতে বেলা গড়াইয়া যায়। তারপর সন্ধ্যার সময় বনপথ দিয়া সবাই গ্রামে ফিরিয়া চলিয়াছেন। এমন সময়ে হঠাৎ তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় এক দুষ্ট অশরীরী প্রেত। মধ্যগেহ ও বেদবতী ভয়ে জড়সড়ো হইয়া পড়েন, কিন্তু বালক বাসুদেবের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। মুহূর্তমধ্যে তাহার চোখ মুখের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। গ্রীবা সমুন্নত, চোখদুটি ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মত দৃঢ়স্বরে ঐ প্রেতের উদ্দেশে বিড়্-বিড়্ করিয়া কি এক মারণ-মন্ত্র সে উচ্চারণ করিতেছে।

প্রেতটি তৎক্ষণাৎ ভীতভাবে তাঁহাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবও ফিরিয়া আসিল তাহার বালক স্বভাবে। ইষ্টনাম জপিতে জপিতে অতি সন্তর্পণে বালককে বুকে করিয়া ভট্টদম্পতি ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

কৈশোরে বাসুদেবের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। এবার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে পাঠানো হয় গ্রামের টোলে। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা বাসুদেবের। অধ্যাপকেরা বিস্মিত হইয়া যান। দেখা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন শাস্ত্র তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তত্ত্বের নির্ণয় ও বিচার বিশ্লেষণে জন্মিয়াছে তাঁহার অসামান্য অধিকার।

ক্রীড়া অঙ্গনেও বাসুদেবের সুখ্যাতি কম নয়। অমিত সাহস, বজ্রকঠিন দেহ আর দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিয়া যে কোন প্রতিযোগিতায় অনায়াসে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া নেন। দক্ষিণ কানাড়ার ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুস্তী খেলার প্রচলন খুব বেশী। এই খেলায় বাসুদেব অদ্বিতীয়। তাই সঙ্গীরা রহস্য করিয়া তাঁহার নামকরণ করে ভীম।[১]

যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বাসুদেব পরিণত হইয়াছেন এক পূর্ণাঙ্গ মানবে। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক দুইয়েরই অপূর্ব্ব সমাহার ঘটিয়াছে তাঁহার জীবনে। অসামান্য দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী যেমন তিনি হইয়াছেন, তেমনি অর্জ্জন করিয়াছেন শাস্ত্র-জ্ঞান ও ধ্যান মননের শক্তি। বিচারের শক্তিতেও কম দুর্দ্ধর্ষ তিনি হন নাই।

১ অনেকের ধারণা, প্রথম জীবনের এইসব দৈহিক পরাক্রমের কথা স্মরণ রাখিয়াই উত্তরকালে মধ্বের অনুগামীরা তাঁহাকে বায়ুপুত্র বা বায়ুর অবতার বলিয়া প্রচার করিতে শুরু করেন। নারায়ণ ভট্ট রচিত মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরীতে এই বায়ু-তত্ত্বটি বার বার উল্লেখিত:হইয়াছে।

কয়েকশত বৎসর আগে বাসুদেবের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কর্ম্মকাণ্ডের অনুগামী, যাগযজ্ঞে বিশ্বাসী। একাদশ শতকের কাছাকাছি ইঁহাদের মধ্যে এক দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যায়। এ সময়ে আচার্য্য রামানুজের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাঁহার অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়াই পরিণতি লাভ করে প্রেম-ভক্তি-সিদ্ধ আড়বারদের সাধনা ও মতবাদ। রামানুজীয় ভক্তিবাদ সারা দাক্ষিণাত্যে প্রবল ভাববন্যা প্রবাহিত করে, শঙ্কর বিরোধী দ্বৈতবাদের প্রভাব নানা স্থানে অনুভূত হইতে থাকে। অনন্তশায়ী বিষ্ণু ও মুরলীধর কৃষ্ণের মহিমা কতকগুলি মঠ মন্দির ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। বাসুদেবের পিতা মধ্যগেহ ভট্ট ছিলেন ভক্তি রসাশ্রিত সাধনধারার একজন ধারক ও বাহক। তাঁহার ইষ্ট অনন্তেশ্বর নারায়ণ, আর গৃহে পূজিত হইতেন শালগ্রাম শিলা। পুত্রের বাসুদেব নামকরণ হইতেও অনুমান করা যায়, মধ্যগেহ ভট্ট বেদান্তী বা কর্ম্মকাণ্ডী সাধক ছিলেন না, সাধন-জীবনে ভক্তিমার্গই তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন।

বলা বাহুল্য পিতার ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব আর গৃহের ভজন-পূজনময় পরিবেশ বাসুদেবের ধর্ম্মীয় আদর্শ ও সাধন-জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়া তোলে। অতি তরুণ বয়সেই এই প্রতিভাধর পণ্ডিত পরিণত হন এক শুদ্ধাচারী ভক্তিপরায়ণ সাধকে।

উড়ুপীতে শাস্ত্রবিদ আচার্য্য ও সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম নয়। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবত্তা ও সাধনার দিক দিয়া বিশিষ্টতম হইতেছেন আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশ। বাসুদেব মনে মনে স্থির করিলেন, এবার এই মহাত্মার কাছেই বেদ-বেদান্ত ও ষড়দর্শনের উচ্চতম পাঠ গ্রহণ করিবেন।

সেদিন অতি প্রত্যূষেই উড়ুপীতে অচ্যুতপ্রকাশের মঠে গিয়া তিনি উপস্থিত। শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া নিজের পরিচয়

দিলেন, কহিলেন, "আচার্য্যবর, অনেক আশা নিয়ে আপনার চরণে শরণ নিতে এসেছি। আপনি আমায় কৃপা করুন, শাস্ত্রতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে করুন কৃতকৃতার্থ।"

"বৎস, তোমার পিতা মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্টকে আমি জানি। তিনি সুপণ্ডিত এবং বিষ্ণুর উপাসক। তাঁর ছেলে হয়ে আমার মত অদ্বৈত বেদান্তীর কাছ কেন তুমি শাস্ত্রের পাঠ নিতে এলে? এর রহস্য কি আমায় খুলে বলতো?" জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে থাকেন অচ্যুতপ্রকাশ।

"প্রভু, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, অদ্বৈত বেদান্তী হয়েও আপনি ভক্তিমার্গের উপর খড়্গহস্ত নন। চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের মন্দির আর শেষশায়ী-বিষ্ণু অনন্তেশ্বরের মন্দির, এই দুই পবিত্র পীঠেই রয়েছে আপনার স্বচ্ছন্দ গতায়াত। আর এ কথাও আমি শুনেছি, আপনার গুরু প্রাজ্ঞতীর্থ মহারাজ দশনামী সন্ন্যাসী হয়েও ভক্তিমার্গের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে আপনারই আশ্রমে আমি এসেছি।"

সুন্দর-সুঠাম দেহ এই তরুণ শিক্ষার্থীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন অচ্যুতপ্রকাশ। বাসুদেবের দুই নয়ন প্রতিভার দীপ্তিতে প্রোজ্জল। আননে রহিয়াছে নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। অচ্যুতপ্রকাশ অন্তরে মহা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। বাসুদেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ শাস্ত্রালাপের পর স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "বৎস, আমি বুঝতে পারছি, পরমাত্মার কৃপায় তুমি দিব্য প্রতিভা নিয়েই জন্মেছো। একদিন দেশ ও ধর্ম্মের মহা উপকার সাধিত হবে তোমার মনীষায় ও সাধনায়। আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, আমার এ আশ্রমে থেকে উচ্চতর শাস্ত্রপাঠ তুমি গ্রহণ করতে পারো।"

সেদিন উড়ুপীর মঠে আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছে আশ্রয় লাভের পর হইতে বাসুদেবের জীবনে শুরু হইয়া গেল এক নতুনতর অধ্যায়।

ন্যায়, সাংখ্য বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন অগ্রসর হয়, অপূর্ব্ব নিষ্ঠায় বাসুদেব এগুলি একের পর এক আয়ত্ত করিতে থাকেন। কিন্তু সব সময়েই দেখা যায়, গুরু অদ্বৈত-বেদান্তের পাঠ শুরু করিলেই বাসুদেব তাঁহার বিরুদ্ধে তুলিয়া ধরেন ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা, আপন ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অমানুষী মনীষার সাহায্যে প্রয়োগ করেন বিস্ময়কর শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক। ক্রমে উড়ুপীর বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে ও সন্নিহিত অঞ্চলে আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশের এই প্রতিভাধর ছাত্রের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

পুত্র বাসুদেব এখন শাস্ত্র পারঙ্গম। বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রনিষ্ঠায় বহু লোকের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করিতেছেন। ভট্টদম্পতির অন্তর তাই গর্ব্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

একদিন অবসরমত মধ্যগেহ ভট্ট পুত্রকে নিকটে ডাকিলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "বাসুদেব, তোমার মত কৃতী পুত্রকে পেয়ে আমি ও তোমার জননী পরম সুখী। কিন্তু বাবা, এখন তোমায় আমাদের একটা অনুরোধ রাখতে হবে। এবার তুমি গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করো। সুলক্ষণা একটি পাত্রী আমরা দেখে রেখেছি। তাকে তুমি বিবাহ করো, আর ঘরেই একটি অধ্যাপনার টোল খুলে ব'সো। সংসার জীবনে তুমি স্থির হয়ে বসলে আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

নতশিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাসুদেব উত্তর দেন, "পিতা, আপনি আমায় মার্জ্জনা করুন। গার্হস্থ্য আশ্রম আমার জন্য নয়। আমি সঙ্কল্প করেছি—অচিরেই একটি শুভদিন দেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করবো, এবং আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছ থেকেই নেবো দীক্ষা ও সন্ন্যাস।"

ভট্ট চমকিয়া উঠেন। এ কি অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত সঙ্কল্প তাঁহার পুত্রের? এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! আর্ত্ত কণ্ঠে কহেন, "বৎস,

কেন এমন মর্ম্মভেদী কথা বলছো ? ভেবেছিলাম, তুমি সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ আচার্য্য হবে, যশ-অর্থ মানের হবে অধিকারী, আর তোমার হাতে ঘর-সংসারের ভার দিয়ে আমরা দিন কাটাবো ধ্যান ভজন নিয়ে—পরম নিশ্চিন্তে। তোমার তো সংসার ত্যাগ করা চলে না, বৎস।"

"সংসার অনিত্য বলে, মায়া-বিভ্রম বলে আমি সংসার ছাড়ছিনে, বাবা। সংসার ছাড়ছি, এ সংসারের প্রভু শ্রীনারায়ণের সেবায় লাগবো বলে। আপনাকে আর জননীকে যে তিনিই রক্ষা করবেন। আমার জীবনের লক্ষ্য চিরতরে স্থির হয়ে গেছে। সঙ্কল্প করেছি, ভক্তি-সাধনভ্রষ্ট এই পৃথিবীতে ভক্তিবাদ নূতন করে প্রচার করতে হবে। আর সে প্রচার হবে শাস্ত্রভিত্তিক। আমি ভেতর থেকে শক্তি পেয়েছি, উপলব্ধি করেছি—এই দুরূহ ভগবৎ-কর্মে আমার একটা নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।"

আত্মপ্রত্যয় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠে তরুণ বাসুদেবের চোখে মুখে।

ব্যাকুল কণ্ঠে পিতা কহেন, "বাবা, বাসুদেব, তোমায় যে আমরা লাভ করেছি অনন্তেশ্বর নারায়ণের কৃপায়। দীর্ঘদিন ব্রত উপবাস করে প্রভুর চরণে অন্তরের আবেদন জানিয়েছি, প্রসন্ন হয়ে তিনি তোমায় পাঠিয়েছেন আমাদের ঘরে।"

"প্রভুর বরে আমার জন্ম। তাইতো আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভুর আদিষ্ট কর্ম্মযজ্ঞেই হবে আমার এ জীবন উৎসর্গিত।"

"সবই তো শুনলাম। কিন্তু বাবা, তুমি যে আমাদের একমাত্র পুত্র। তুমি সন্ন্যাস নিলে, তোমার পিণ্ডদান থেকেও যে আমরা বঞ্চিত হবো। এমনতর অধর্ম্মের কাজ তুমি ক'রো না, বাবা।"

নীরবে দাঁড়াইয়া কিছুকাল আত্মাবগাহন করেন বাসুদেব। তারপর ধীর প্রশান্তকণ্ঠে কহেন, "পিতা, আমার দ্বারা আপনার পারলৌকিক কল্যাণের কোন ক্ষতি না হয় তা আমি দেখবো।

বেশ, আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশের আশ্রয়ে থাকলেও, আমার সন্ন্যাস গ্রহণ আমি আপাততঃ স্থগিত রাখবো। আমার অন্তরাত্মা বলছে, অদূর ভবিষ্যতে আমার একটি অনুজ জন্মগ্রহণ করবে। তখন আর আপনাদের পিণ্ডলোপের ভয় থাকবে না। সে ভূমিষ্ঠ হবার পরেই আমি প্রবেশ করবো সন্ন্যাস আশ্রমে।"

পিতৃভক্ত বাসুদেব তাহার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। উত্তর-কালে কনিষ্ঠভ্রাতার জন্মের পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাস না নিলেও অচ্যুতপ্রকাশের কাছে দীক্ষা নিতে বাসুদেব বিলম্ব করেন নাই। আচার্য্যের মঠে থাকিয়া তাঁহার নির্দ্দেশিত পথে অনন্য নিষ্ঠায় তিনি উদ্‌যাপন করিয়া চলেন তাঁহার সাধনা ও স্বাধ্যায়। অচিরে সমগ্র কানাড়া অঞ্চলে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন এক অসামান্য পণ্ডিত ও সাধকরূপে।

এভাবে বারো বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্টের গৃহে আবির্ভূত হয় আর একটি পুত্রসন্তান।[১]

এবার বাসুদেবের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আর কোন বাধা থাকে না, জনক ও জননীর সম্মতি নিয়া তিনি চিরতরে গৃহত্যাগ করেন। পঁচিশ বৎসরের সাধননিষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত জীবনে শুরু হয় সন্ন্যাস আশ্রমের সুকঠোর ব্রত।

গুরু এই নবীন শিষ্যের সন্ন্যাস নাম দেন পূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থ। পূর্ব্বাশ্রমে বাসুদেব ছিলেন আচার্য্য মধ্যগেহের পুত্র, এজন্য আচার্য্য মধ্ব নামেও তিনি সে অঞ্চলে পরিচিত হইয়া উঠেন।

আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশের মঠে ছাত্র ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের ভীড় লাগিয়াই আছে। নিত্যকার সাধনভজনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী ও সাধুরা শাস্ত্রপাঠ ও বিচার বিতর্কে থাকেন সদা তৎপর। আর

১ উত্তরকালে এই শিশু পরিচিত হন বিষ্ণুতীর্থ নামে। পিতা ও মাতার দেহান্তের পর তিনিও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুসরণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

নবীন আচার্য্য মধ্বই ইহাদের মধ্যমণি। বিশেষ করিয়া বেদান্তের ভক্তিবাদী আলোচনায়, ভাগবত ও মহাভারত পুরাণের ব্যাখানে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। ন্যায়শাস্ত্রে মধ্বের দখল অসামান্য। সুযোগ পাইলেই বেদান্তের ভাষ্য নিয়া বর্ষীয়ান গুরুর সঙ্গে তিনি বিতর্ক বাধাইয়া বসেন, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও তর্কশক্তির সাহায্যে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উদ্ঘাটন করেন। এই মতবাদের উপর হানেন প্রচণ্ড আঘাত।

গুরু অচ্যুতপ্রকাশ কেবলাদ্বৈতী সন্ন্যাসী হইলেও অন্তরে অন্তরে ভক্তিরসের রসিক। ভক্তি আন্দোলনের একটা নূতন স্রোতধারা উড়ুপীর শেষশায়ী নারায়ণ বিগ্রহ অনন্তেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তারিত হোক, এই আশা গোপনে এতকাল তিনি পোষণ করিতেছিলেন। এবার প্রতিভাধর নবীন শিষ্য মধ্বকে দেখিয়া, তাঁহার বিরাট প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করিয়া, তিনি মহা উল্লসিত। মনে প্রাণে সদাই উপলব্ধি করেন, উড়ুপীর মঠে যে উৎস তিনি রচনা করিতেছেন অদূর ভবিষ্যতে তাহার লোকপাবনী কল্যাণধারা ছড়াইয়া পড়িবে ভারতভূমির দিকে দিকে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই মঠের নেতৃত্ব ভার মধ্বের উপর আসিয়া পড়ে। গুরু তাঁহাকে একদিন ডাকিয়া বলেন, "বৎস, আমার এ দেহ প্রাচীন হয়েছে, ক্রমে আরও অপটু হয়ে পড়বে। তাই আমার ইচ্ছে, তুমি এখানকার সন্ন্যাসীদের নেতা হয়ে ব'সো, আর মঠ পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নাও।"

এক শুভদিনে অচ্যুতপ্রকাশ স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও সজ্জনদের আহ্বান করেন, সকলের সমক্ষে মধ্বের হাতে তাঁহার উড়ুপী মঠের সর্ব্বময় ক্ষমতা সঁপিয়া দেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "বৎস, আজ হতে এই মঠের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার তোমার ওপর রইলো। এখানকার মঠাধীশরূপে তোমার নূতন নাম হলো— আনন্দ তীর্থ।"

উত্তরজীবনে মধ্বকে তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ ও ভাষ্যে গুরুদত্ত এই মঠাধীশ-নামই ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

মধ্বের সমকালীন ভারতে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে দার্শনিকতা ও ধর্ম্মীয় মতবাদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নিতান্ত কম ছিল না। সারা দেশ তখন বহুতর খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। এই সব রাজসভায় তর্কদক্ষ পণ্ডিতদের সমাদর ছিল প্রচুর। ছোট বড় রাজারা যুদ্ধ বা বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত। পথ-প্রান্তরের অবস্থাও তেমন নিরাপদ নয়। কিন্তু এই অশান্তিময় পরিবেশেও তর্কশূর বা বিচার-মল্লেরা পরমানন্দে দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের সম্বর্ধনায় ও বিচার সভার অনুষ্ঠানে রাজা-প্রজা ধনী-নির্ধন সকলেরই উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা থাকিত না।

বিচারমল্লতার জন্য ঐ সব শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের নানা উপাধি দেওয়া হইত। ইঁহাদের কেউ ছিলেন তর্ক-পঞ্চানন, কেউ বাদীসিংহ, কেউ বা খ্যাত ছিলেন প্রতিবাদী-ভয়ঙ্কর নামে। রাজসভা, মঠ-মন্দির বা ধর্ম্ম অধিবেশনে এই সব তর্কদক্ষ দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিতদের মর্য্যাদা ছিল অসাধারণ।

উড়ুপীর মঠে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশখ্যাত ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতদের আগমন ঘটিত। ইঁহাদের সহিত সংঘর্ষের জন্য আচার্য্য মধ্ব দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। ইতিমধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার নিপুণতার খ্যাতি কম ছড়াইয়া পড়ে নাই। বিদেশী পণ্ডিতেরা উড়ুপীতে আসিলেই আচার্য্য তাঁহাদের সহিত তর্কযুদ্ধে নামিতেন, ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা ও বিচারের মধ্য দিয়া করিতেন তাঁহাদের পর্য্যুদস্ত।

তর্কযুদ্ধে জয়ী হইলে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাড়ে, বিপক্ষকে ধরাশায়ী করিয়া একটা আত্মতৃপ্তিও পাওয়া যায়, একথা ঠিক। কিন্তু মধ্ব এইসব দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে উৎসাহী হইতেন আরও একটা বড় কারণে। তাঁহার জীবন একটি গঠনমূলক ঐশ্বরীয় কর্ম্মের জন্য উৎসর্গীত। ভক্তি-আন্দোলনের একটি নূতন ধারা তিনি প্রবর্ত্তন করিতে চান।

একাজ করিতে হইলে প্রথমত চাই শঙ্করের অদ্বৈতবাদের খণ্ডন, অপর দিকে চাই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ হইতে একটি পৃথক ও নূতনতর ভক্তিবাদের ধারা উৎসারিত করা। ইহা করিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্র পারঙ্গম ও বিচারদক্ষ পণ্ডিতদের পরাভূত করা ও স্বমতে আনয়ন করা দরকার। নতুবা জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে চাহিবে কেন? এ সময়ে উড়ুপীতে আসিয়া যাঁহারাই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাই মধ্বের তর্ক-শরজালে হইয়াছেন ভূতলশায়ী।

প্রিয় শিষ্যের কৃতিত্বে বৃদ্ধ আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশ আনন্দ ও গর্ব্বে ভরপুর। সেদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া কহেন, "বৎস মধ্ব, যে সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করেছো, তাতো শুধু উড়ুপীর মঠে বসেই সিদ্ধ হবে না। দুর্গপ্রাকারের আড়ালে বসে থেকে ক'টি প্রতিপক্ষকে তুমি পরাস্ত করবে? এবার দুর্গের বাইরে যাও। আত্মরক্ষার মনোভাব ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে পড়ো আক্রমণ করতে। আগে দাক্ষিণাত্যের রাজসভা ও মঠ-মন্দিরগুলিতে উপস্থিত হয়ে বিচার-যুদ্ধ আহ্বান করো। তারপর বেরিয়ে পড়ো উত্তর ভারতের ধর্ম্মনেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে।"[১]

গুরুর নির্দ্দেশ মধ্ব সানন্দে মানিয়া নেন। শুরু হয় সদলবলে তাঁহার দক্ষিণ ভারত পর্য্যটন ও শাস্ত্রবিচারের অনুষ্ঠান। এ সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সাধক ও দার্শনিকদের তিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে

---

১ তখনকার দিনে ভারতের সকল দার্শনিক ক্ষেত্রেই তার্কিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ন্যায় ও বেদান্তের ক্ষেত্রে বিচারমল্লতা বেশ চলিয়াছে। এই সময়েই তার্কিক শিরোমণি শ্রীহর্ষ মিশ্র, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, চিৎসুখাচার্য্য, আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্য, লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্য, বেদান্ত দেশিকাচার্য্য ও বিদারণ্য মুনীশ্বরের আবির্ভাব। ইহারা সকলেই তার্কিক, এই কয়েক শতাব্দী তার্কিকতারই যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।—প্রজ্ঞানানন্দ: বেদান্তদর্শনের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৫২০

সমর্থ হন। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হন বিষ্ণুমঙ্গলম তীর্থে। গুরু অচ্যুতপ্রকাশও এস্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরীতে বলা হইয়াছে, ঋদ্ধি সিদ্ধি সম্পন্ন মধ্ব এই সময়ে তাঁহার সঙ্গীদের কাছে কিছু যোগৈশ্বর্য্য প্রকটিত করেন। পথ চলিতে চলিতে সেবার সবাই এক নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে কোন জনমানব নাই, আশ্রয় বা খাদ্য সংগ্রহের কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। অথচ সঙ্গীরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া উঠিয়াছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ চলিতে থাকিলে ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে কয়েকজনের জীবনান্ত ঘটিবে সন্দেহ নাই।

এ সঙ্কটে কি করা যায়? ব্যগ্র ব্যাকুল মধ্ব সহযাত্রীদের নিয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ তাঁহার দেহে দেখা দেয় দিব্য ভাবের আবেশ। এক সঙ্গীর ঝুলিতে ভুক্তাবশিষ্ট এক টুকরা শুকনা রুটি পাওয়া যায়। ভাবাবিষ্ট মধ্ব অস্ফুটস্বরে বার বার কি যেন বলিতে থাকেন আর ঐ রুটিটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরেন। ক্ষণপরেই সকলে সবিস্ময়ে দেখেন—সঙ্গীদের সবার উদরপূর্ত্তির উপযোগী একরাশ রুটি কোথা হইতে ঐ ঝুলির মধ্যে আসিয়া গিয়াছে।

ভক্ত পণ্ডিত নারায়ণাচার্য্যের লেখা গ্রন্থে যোগবিভূতি সম্পন্ন মধ্বের অমানুষী ভোজন সামর্থ্যের একটি চটকদার কাহিনী রহিয়াছে। অনেকের ধারণা, মহাভারতে বায়ুপুত্র ভীমের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এ কাহিনী অনেকটা তাহারই অনুকরণে রচিত।

নানা অঞ্চলের বিচার সভায় জয়ী হইয়া শিষ্যগণ সহ মধ্ব এবার ত্রিবেন্দ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ভক্তিমান ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া এখানকার রাজার খ্যাতি যথেষ্ট। মধ্ব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আগন্তুক সন্ন্যাসীর নবীন বয়স, চোখে মুখে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার দীপ্তি ছড়ানো। প্রথম দর্শনেই রাজা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট

হইলেন। সাদর সম্বর্দ্ধনার পর কহিলেন, "সন্ন্যাসীবর, আদেশ করুন, আপনার কোন্ সেবায় নিজেকে আমি নিয়োজিত করতে পারি।"

"মহারাজ আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নিজের সেবার জন্য আমি মোটেই আগ্রহী নই। এই ভক্তিহীন ভ্রষ্টাচার যুগে ভক্তিবাদ প্রচারের জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প। আপনি কালবিলম্ব না ক'রে একটি বিচার-সভা আহ্বান করুন, সেখানে ভক্তিহীন অদ্বৈতবাদের উপর হানবো আমি চূড়ান্ত আঘাত।"—ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন আচার্য্য মধ্ব।

"আপনি কি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুগামী?"

"না, মহারাজ, আমার ভক্তিবাদ তা থেকে একেবারে পৃথক। আমার মতে, ব্রহ্ম ও জীব নিত্য পৃথক—অর্থাৎ দুটি পৃথক বস্তু। কারণ ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জীব অস্বতন্ত্র। তাই এই দ্বৈতবাদকে বলা হয় স্বতন্ত্র-অস্বতন্ত্রবাদ। এতে রয়েছে শঙ্কর ও রামানুজ দুই-এরই চরম বিরোধিতা।"

"আপনার তত্ত্বের পূর্ব্বসূরী কারা? তাঁদের নাম তো শুনি নি।"

"মহারাজ, সনৎকুমারই এ তত্ত্বের আদি গুরু। ঈশ্বরের কৃপায় আমার মাধ্যমেই এর পুনঃপ্রচার হতে যাচ্ছে।"

"কিন্তু যতিবর, আপনি কি আপনার এই মতবাদের সমর্থনকল্পে ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্য রচনা করেছেন? নইলে দেশের সাধু-সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতসমাজ এ মতবাদ গ্রহণ করবে কেন?"

"মহারাজ, আমার সূত্রভাষ্য বিরাজিত রয়েছে আমার কণ্ঠেই। আপনি সত্বর বিচার-সভার ব্যবস্থা করুন, আর প্রতিপক্ষরূপে আমন্ত্রণ জানান কোন অদ্বৈতবাদী তর্কযোদ্ধাকে।"

"যতিবর, নিকটেই শৃঙ্গেরীতে বিরাজ করছেন আমার গুরু বিদ্যাশঙ্কর মহারাজ। তিনি শুধু শৃঙ্গেরী মঠেরই অধীশ্বর নন, শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের এক শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ সারা দাক্ষিণাত্যে। বেশ কথা, ওঁকেই আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার প্রতিপক্ষ হিসাবে।"

দুই আচার্য্যের বিচার-সভা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সাধক ও অগণিত উৎসাহী জনগণের সম্মুখে শুরু হয় শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের সুতীব্র সংঘাত। নবীন সন্ন্যাসী মধ্ব কিন্তু এই বিচার দ্বন্দ্বে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। অমানুষী প্রতিভার অধিকারী, বর্ষীয়ান পণ্ডিত ও সাধক শিরোমণি বিদ্যাশঙ্করের শ্রুতিসিদ্ধ যুক্তিজাল তিনি ছিন্ন করিতে পারেন নাই। শেষটায় এই শক্তিধর প্রতিপক্ষের কাছে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

এই পরাজয়ের গ্লানি মধ্বের জীবনে আনে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া। এখন হইতে শুধু অদ্বৈতবাদের উপরই তিনি খড়্গহস্ত হন নাই, আচার্য্য বিদ্যাশঙ্কর ও শৃঙ্গেরী মঠকেও জ্ঞান করিতে থাকেন তাঁহার প্রধান বৈরীরূপে।[১] বলা বাহুল্য, ত্রিবেন্দ্রাম সভার সেদিনকার এ করুণ অভিজ্ঞতা মধ্বের বিরোধিতাকে তীব্রতর করিয়া তোলে, আর তাঁহার নিজস্ব দ্বৈতবাদ স্থাপনের সঙ্কল্পকে করে দৃঢ়তর।

তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায়, ১২২৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে আচার্য্য তাঁহার দক্ষিণ-ভারত পর্য্যটন শেষ করেন এবং পর্য্যটনের শেষের দিকেই শৃঙ্গেরীর মঠাধীশ বিদ্যাশঙ্করের সহিত হয় তাঁহার বিচার বিতর্ক।[২] নবীন সন্ন্যাসী মধ্বের বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর।

ত্রিবেন্দ্রাম হইতে মধ্ব সরাসরি চলিয়া যান রামেশ্বরধামে এবং সেখানে চারমাস কাল অতিবাহিত করেন নিভৃত তপস্যায়। এখানেও

---

১ শৃঙ্গেরী মঠ ও উড়ুপীর মধ্বমঠের দ্বন্দ্ব, বাদানুবাদ ও শত্রুতা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। ফলে মধ্ব ও তাঁহার অনুগামীরা নানাভাবে নিগৃহীত হইতে থাকেন। প্রায় এক শতাব্দীর পরে মধ্ব-মত ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করিলে উভয় মঠাধীশের মধ্যে মৈত্রী ও সৌজন্যমূলক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

২ শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ-পঞ্জী হইতে দেখা যায়, স্বামী বিদ্যাশঙ্কর গদীতে আরোহণ করেন ১২২৮ খৃষ্টাব্দে। অনুমিত হয়, ইহার কিছু পরেই মধ্বের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও সংঘর্ষ বাধে।

অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে বিচার-বিতর্কে আহ্বান জানান। কিন্তু তপস্যাপরায়ণ মধ্বকে এসময়ে তর্কসভায় টানিয়া আনা সম্ভব হয় নাই। আপন মনে ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি সমাপ্ত করেন তাঁহার চাতুর্মাস্য ব্রত।

অতঃপর সদলবলে তিনি শ্রীরঙ্গমে উপনীত হন। পরমপ্রভু নারায়ণের সেবা-অর্চ্চনায় কিছুদিন কাটানোর পর পালর নদীর তীর ধরিয়া বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন উড়ুপীতে।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে থাকাকালে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। নারায়ণ আচার্য্য ইহার বিবরণ দিয়াছেন। এই ঘটনাটির মধ্য দিয়া মধ্বের অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া একদল অদ্বৈতী ও শৈব সন্ন্যাসী তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে উত্তেজিত করিয়া টানিয়া আনেন শাস্ত্র বিচারের দ্বন্দ্বে। মধ্বের ভিতরে এ সময়ে দেখা যায় এক দিব্য ভাবের আবেশ। শাস্ত্রের এক একটি শব্দের বহুতর অর্থ ও দ্যোতনা তিনি প্রকাশ করিতে থাকেন তড়িৎবেগে ও অনর্গলভাবে। স্বয়ং সরস্বতী যেন এই নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে সেদিন আবির্ভূত। বিচারকামী পণ্ডিতেরা তাঁহার এই অমানুষী প্রতিভা ও অলৌকিক প্রজ্ঞা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যান। বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী উভয় স্থানেই মধ্বের জয়জয়কার ধ্বনিত হয়।

উড়ুপীর মঠে ফিরিয়া মধ্ব গুরুদেব অচ্যুতপ্রকাশের পদবন্দনা করিলেন। সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন নানা তীর্থের নানা বিচার সভার বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

মধ্বের মনোভাব বুঝিতে গুরুর ভুল হয় নাই। প্রশ্ন করিলেন, "বৎস, পর্য্যটন শেষে তোমার মন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে কেন, বলতো ?"

মৃদু কণ্ঠে মধ্ব নিবেদন করেন, "প্রভু, চলার পথে বহু বিচার-সভার

সম্মুখীন হয়েছি। জয় পরাজয় দুই-এরই অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং পরাজয় থেকে জয়মাল্যই লাভ করেছি বেশীর ভাগ স্থানে। আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, ভক্তি-সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্পও আরো দৃঢ় হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রভু, ত্রিবেন্দ্রামের সভায় শৃঙ্গেরীর অধ্যক্ষের কাছে যে ভাবে আমি পরাস্ত হয়েছি তার গ্লানি যে এখনো ভুলতে পারছিনে।"

"ভালোই হয়েছে বৎস। শক্তিমান প্রতিপক্ষের হাতে এ ধরণের আঘাতের তোমার প্রয়োজন ছিল। এ আঘাত থেকে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো, কোথায় কোন্ ত্রুটি-বিচ্যুতি তোমার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে। নিজের মতবাদের ভিত্তি আর তার দুর্গপ্রাকার আরো বেশী সতর্কতার সঙ্গে এবার গড়ে তোলো।"

"হ্যাঁ প্রভু, আমি উপলব্ধি করেছি—একটা নূতন ভক্তিপন্থী দ্বৈতবাদ ভারতে আমি স্থাপন করতে চাই অথচ আমার স্বপক্ষে নেই আমার এই মতবাদের সমর্থক ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রের কোন নূতন ভাষ্য।"

"ঠিকই বলেছো, সূত্রভাষ্য ছাড়া দেশের সাধক ও দার্শনিকেরা তোমার নূতন মতবাদ গ্রহণ করবে কেন? তাই আমি বলছি, তুমি অতি সত্বর তোমার মতবাদের সমর্থক একটি গীতাভাষ্য রচনা কর। তারপর কয়েক বৎসর উডুপীতে নিবিষ্ট হয়ে ব'সে সমাপ্ত করো ব্যাসসূত্রের ভাষ্য।"

"তারপর?"

"তারপর তুমি হিমালয়ে যাও। মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপালাভের চেষ্টা করো। নূতনতর সূত্রভাষ্য হাতে নিয়ে—দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করো নূতন ভক্তিবাদ এবং তারপর শুরু হোক উত্তর ভারতে তোমার বিজয়-অভিযান। বৎস, স্মরণ রেখো, শৃঙ্গেরী মঠই ভারতবর্ষ নয়। আর শুধু শাঙ্কর মতই তোমার প্রতিপক্ষ নয়। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ ছাড়াও তোমায় যুঝতে হবে ভাস্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতবাদের

বিরুদ্ধে। এখন থেকে তোমার প্রস্তুতিকে আরো দুর্ভেদ্য, আরো নিখুঁত ক'রে তোল।"

গুরুর এই নির্দ্দেশ মানিয়া নিয়া মধ্ব রত হইলেন নিজ মতের সমর্থক ভাষ্য রচনায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল উত্তর ভারতের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র বারাণসী ও হরিদ্বারের দিকে।

মধ্ব মনে মনে স্থির করিলেন, প্রথমে স্বরচিত সূত্রভাষ্য নিয়া বারাণসীতে যাইবেন। সেখানকার সন্ন্যাসী, দার্শনিক ও পণ্ডিত সমাজ তাঁহার যে সমালোচনা করিবেন, তদনুযায়ী করা হইবে ভাষ্যের পরিবর্ত্তন। তারপর হিমালয়ে গিয়া মাগিবেন ব্যাসদেবের আশীর্ব্বাদ। এই আশীর্ব্বাদে বলীয়ান হইয়া হরিদ্বারে নামিয়া আসিবেন—ঘোষণা করিবেন তাঁহার নূতনতর ভক্তিবাদ।

মূল্যবান পুঁথিপত্র ঝুলিতে ভরিয়া মধ্ব পদব্রজে উত্তর ভারতের দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গে রহিল কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্য ও একদল তীর্থযাত্রী।

তখনকার দিনে তীর্থ পর্য্যটনে বিপদের অন্ত ছিল না। পথিমধ্যে প্রায়ই অতিক্রম করিতে হইত বড় বড় অরণ্য। এই সব অরণ্যে ছিল হিংস্র বাঘ ও সাপের ভয়, ইহা হইতেও বিপজ্জনক ছিল দস্যু ভয়। পথচারীরা ধনী কি নির্ধন, গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, কোন কিছু বিচার করিত না। সুযোগ পাইলেই অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পথিকের সর্ব্বস্ব লুটিয়া নিত।

চলার পথে সঙ্গিগণসহ আচার্য্য মধ্বকেও বার বার কম বিপদে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু কখনো ঈশ্বরের অনুগ্রহে, কখনো বা তাঁহার নিজের যোগশক্তির বলে আচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গীরা চরম বিপদ ও লাঞ্ছনার হাত হইতে রেহাই পাইয়াছেন। নারায়ণ আচার্য্য

তাঁহার মধ্ববিজয়ে এ ধরণের নানা অত্যাশ্চর্য্য কাহিনীর বিবরণ দিয়াছেন ঃ

মহারাষ্ট্রের খণ্ডরাজ্য দেবগিরিতে সেবার এক কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। এখানকার তরুণ রাজা মহাদেব কিছুদিন আগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তরুণ বয়স, অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নাই। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এক দীর্ঘ খাল খননের কাজে তিনি হাত দিয়াছেন। প্রকল্প অতি বৃহৎ এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সমাপ্ত করিতে হইবে। তাই রাজা মহাদেব অনেক সময় নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই খননের কাজ পরিদর্শন করেন।

ঢোল শোহরত করিয়া রাজার আদেশ জানানো হইয়াছে। যে কোন পথচারীই এই খালের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিবে, খননের কার্য্যে তাহাকে দিতে হইবে অন্তত একদিনের কায়িক পরিশ্রম। ফাঁকি দিয়া কেহ এই কাজ এড়াইয়া না যায় এ জন্য রাজার ভারী কড়া ব্যবস্থা।

মধ্ব ও তাঁহার শিষ্যেরা একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সেদিন খালের পাশ দিয়া যাইতেছেন। প্রহরীরা তাঁহাদের আটক করিল। রাজার আদেশ শুনাইয়া দিয়া কহিল, "এবার তোমাদের ঝোলাঝুলি রেখে, কোদাল হাতে খাদের ভেতর নেমে পড়ো।"

মধ্বের শিষ্য ও সঙ্গীরা বুঝান, "ভাই, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী। গঙ্গাতীরের তীর্থদর্শনে যাচ্ছি। রাজা যে আইন করেছেন, তাঁর গৃহস্থ প্রজারা তা মেনে চলবে। ভিন্‌দেশী মানুষ, পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসী, এদের ওপর তো এ আইনের প্রয়োগ চলতে পারে না।"

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? রাজরক্ষীরা জোর চেঁচামেচি ও গালাগালি শুরু করিয়া দিল।

পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়া দেবগিরি-রাজ সেদিন খাল-খননের কাজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। রক্ষী ও সাধুদলের সোরগোল শুনিয়া সেদিকে তিনি আগাইয়া আসেন। গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন,

"ব্যাপার কি ? কাজকর্ম্ম না ক'রে এখানে এত হট্টগোল করা হ'চ্ছে কেন ?"

রক্ষীদের পক্ষ হইতে সব বলা হইবার পর মধ্ব রাজাকে উদ্দেশ করিয়া কহেন, "মহারাজ, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনি এই খাল খননের কাজে হাত দিয়েছেন, খুবই ভালো কথা। কিন্তু এতে সাধু-সন্ন্যাসীদের ধরে টানাটানি কেন ?"

"রাজার বিধান সাধু ও অসাধু সবার ওপরই প্রযোজ্য।"

"কাজের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজার আর তাঁর গৃহস্থ প্রজাদের। সাধু-সন্ন্যাসীরা কেন এতে কায়িক পরিশ্রম দিতে যাবে ?"

"কেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা কি সমাজ থেকে কিছু পান না ? তাঁদের খাওয়া-পরা চলে কোথা থেকে ? জনসাধারণ তাঁদের খাবার যোগায়, প্রতিদানে জনকল্যাণের কাজে কিছুটা ভাগ তাঁদের নিতে হবে বৈ কি ?"

"মহারাজ, আপনি ভ্রান্ত। সাধু-সন্ন্যাসীর কাজকে আপনি স্থূল দৃষ্টিতে দেখছেন কেন। আসলে তাঁদের কাজ সম্পন্ন হয় সূক্ষ্ম স্তরে। তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রেরণা ও আশীর্ব্বাদ এনে দেয় প্রকৃত কল্যাণ।"

বিরক্তির স্বরে রাজা মহাদেব বলে উঠেন, "আপনার এতো কিছু তত্ত্বকথা শোন্‌বার সময় আমার নেই। রাজ-সরকার থেকে যে আদেশ প্রচার করা হয়েছে, সবাইকে নির্ব্বিচারে তা মেনে চলতে হবে। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে খাল খননের কাজে আপনারা সবাই নেমে পড়ুন।"

"বেশ, মহারাজের আদেশমতই কাজ হবে, কিন্তু তার আগে একটা ক্ষুদ্র নিবেদন আছে।"—বিনীতভাবে বলেন আচার্য্য মধ্ব।

"কি আপনার সেই নিবেদন ?"

"মহারাজ, আপনি এ রাজ্যের অধীশ্বর, প্রজাদের পিতা, রক্ষা-কর্ত্তা। প্রজার মঙ্গলের জন্য পবিত্র অনুষ্ঠান আপনি শুরু করছেন,

তাতে আপনার মঙ্গল হস্তের স্পর্শ থাকা উচিত। এতো বড় একটা কাজ হতে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে আপনার স্পর্শ পড়েছে কি ?”

“না, তা পড়ে নি বটে,”—নরম সুরে স্বীকার করেন দেবগিরির রাজা।

“সে ভুল আজই এখনি সংশোধন করুন মহারাজ। আনুষ্ঠানিক-ভাবে কিছুটা মাটি কেটে তা মাথায় নিয়ে আপনি দূরে ফেলে আসুন, এতে আপনার কর্ত্তব্য যেমন করা হবে, তেমনি প্রজারাও পাবে উৎসাহ ও প্রেরণা।”

“আপনি ঠিকই বলেছেন, সন্ন্যাসীবর। আমি সানন্দে এখনি খাল-খননের কাজে হাত লাগাচ্ছি।”—বলার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল ও ঝুড়ি নিয়া রাজা খালের ভিতর নামিয়া পড়েন।

খনন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া যান। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকায় বহিতেছে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। যন্ত্রচালিত মানুষের মত কেবলই ঝুড়ি-ঝুড়ি মাটি কাটিয়া চলিয়াছেন, একাজে শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নাই কোন বিরতি। প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও রাজাকে কেহ থামাইতে পারিতেছে না। তবে কি তিনি উন্মাদ হইয়া গেলেন ? অথবা কোন অশরীরী প্রেত তাঁহার উপর ভর করিয়াছে ? মন্ত্রী ও রাজপরিষদেরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রাসাদে খবর দেওয়া হইল, রাণী ও পুরনারীরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন।

তবে ইতিমধ্যে সবাই বুঝিয়া নিয়াছেন, রাজার এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য দায়ী সন্ন্যাসীবর মধ্ব। মধ্বের এক শিষ্য অতঃপর ব্যাপারটা ফাঁস করিয়া দেন। মুচকি হাসিয়া কহেন, “রাজার দুর্ভাগ্য, আমাদের আচার্য্য যে কতবড় মহাপুরুষ তা তিনি বুঝতে পারেন নি। মধ্ব হচ্ছেন বায়ুর অবতার, প্রভু নারায়ণের লীলার প্রধান সহায়ক। রাজার ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাই বায়ুর ভর হয়েছে রাজার

ওপর। আচার্য্যকে প্রসন্ন না করলে, এবার রাজার আর রক্ষা নেই, এভাবে দিনরাত বৎসরের পর বৎসর তাঁকে মৃত্তিকা খনন করে যেতে হবে।”

অতঃপর সবাই মিলিয়া মধ্বের চরণে বার বার ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে থাকে। আচার্য্যের ক্রোধ প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে দেবগিরি-রাজের ভূতাবিষ্ট ভাব কাটিয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠেন।

এবার স্বজনগণসহ রাজা মধ্বের চরণে প্রণত হন, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করেন। প্রসন্ন মনে রাজাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া মধ্ব বলেন, “মহারাজ, একটা কথা সদাই স্মরণ রাখবেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা কর্ম্ম ও ধ্যান মননের ভেতর দিয়েই সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন ক'রে যাচ্ছেন। ভগবান শ্রীনারায়ণের দর্শন ক'জন পায়? কিন্তু নারায়ণের চিহ্নিত সেবক সাধু-সন্ন্যাসীদের দর্শন সবাই অনায়াসে পেতে পারে। এঁদের ভেতর দিয়েই পৃথিবী আর বৈকুণ্ঠের ভেতর রচিত হয় যোগ-সূত্র। তাই লক্ষ্য রাখবেন, আপনার রাজ্যে সাধুদের অমর্য্যাদা যেন না হয়। আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি, আপনার এই খাল খননের কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে।”

অনুতপ্ত দেবগিরি-রাজ মধ্বের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিলেন। এই রাজ্যে কিছুদিন অবস্থানের জন্য তাঁহাকে সানুনয় অনুরোধও জানাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখা গেল না।

আচার্য্য মধ্বের আশীর্ব্বাদ অচিরে ফলিয়া যায়। রাজা মহাদেব স্বহস্তে কোদাল নিয়া সারাদিন খাল কাটিয়াছেন এ সংবাদ বিদ্যুৎ-বেগে ছড়াইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র প্রজা উৎসাহে মাতিয়া উঠে; খাল খননের কাজে লাগিয়া যায়। রাজার মনস্কাম এভাবে পূর্ণ হয়।

পণ্ডিত নারায়ণ-আচার্য্য মণিমঞ্জরীতে পরমগুরু মধ্বের যোগ-বিভূতি প্রদর্শনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

পরিব্রাজনের পথে মধ্ব ও তাঁহার শিষ্যগণ সেবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক তুর্কী-মুসলমান রাজার সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় রক্ষী সেনারা তাঁহাদের বাধা দিল। কিন্তু আচার্য্য মধ্ব পিছু হটিবার পাত্র নন, সেনাদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি কতকগুলি বিশেষ মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সেনাদলটি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িল।

জনশ্রুতি আছে, মধ্ব অতঃপর সরাসরি ঐ মুসলমান রাজার সকাশে গিয়া উপস্থিত হন। আচার্য্য তুর্কী ভাষা কোনকালেই শিখেন নাই। কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিদেশী ভিন্নধর্ম্মী রাজার সহিত বিদেশী ভাষাতেই অবলীলায় তিনি কথাবার্ত্তা চালাইয়া গেলেন।

মধ্বের সুগৌর সুঠাম দেহ, দিব্যকান্তি ও প্রখর ব্যক্তিত্বে মুসলমান রাজা একেবারে মুগ্ধ। বার বার তিনি অনুরোধ জানান, আচার্য্য আরো কিছুকাল তাঁহার রাজ্যে সশিষ্য বসবাস করুন; তাঁহাদের সেবা-পরিচর্য্যার জন্য যে কোন পরিমাণ অর্থব্যয়ে রাজা কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু মধ্বের পক্ষে আর সেখানে বিলম্ব করা সম্ভব নয়। তুর্কীরাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়া সেখান হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মধ্বের প্রিয় শিষ্য ও একান্ত সেবক সত্যতীর্থ সে-বার এক মহা-সঙ্কটে পতিত হন। পথ চলিতে চলিতে সাধুরা সবাই এক বিস্তীর্ণ অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই, খানিক বাদেই চারিদিকে নামিয়া আসিবে ঘন অন্ধকার। এ সময়ে এই দীর্ঘ বনের মধ্য দিয়া পথ চলা কঠিন। তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া সবাই স্থির করিলেন, আজিকার মত এখানেই বিশ্রাম করা যাক, কাল প্রত্যূষে ডেরা-ডাণ্ডা উঠানো যাইবে।

সত্যতীর্থ তাঁহার ঝোলাঝুলি নামাইয়া তাড়াতাড়ি ঐ বনের

দিকে চলিয়া গেলেন। গুরু মহারাজের রাত্রের আহারের জন্য কিছু ফলমূল এখনি তাঁহার সংগ্রহ করা চাই।

কিছুকাল পরেই বনমধ্যে শুনা গেল এক হিংস্র বাঘের গর্জ্জন। সকলেই মহা উৎকণ্ঠিত। বেচারা সত্যতীর্থ এই বাঘের মুখে পড়ে নাই তো? দলবল নিয়া আচার্য্য মধ্ব তখনি সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন।

বনের ভিতর প্রবেশ করিতেই যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহাতে সকলেরই চক্ষুস্থির!

সত্যতীর্থ একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে ফল-পাকড় সংগ্রহ করার জন্য। আর তাহার অনতিদূরেই—থাবা গুটাইয়া বসিয়া আছে এক হিংস্র বাঘ। ভাঁটার মত দুই চোখ জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। বৃক্ষস্থিত শিকারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাঝে মাঝে ছাড়িতেছে হুঙ্কার-ধ্বনি।

শমন-সদৃশ এই বাঘকে দেখিয়া সাধুরা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। এমন সময়ে আচার্য্য মধ্বের দেহে দেখা গেল এক দিব্য ভাবের আবেশ। ভাবকম্পিত দেহে, ধীরপদে ঐ বাঘের দিকে তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন। সম্মোহিতের মত বাঘটি কিন্তু স্থির হইয়া বসিয়া আছে, চোখ দুইটি নিষ্পলক, তর্জ্জন-গর্জ্জন একেবারে স্তব্ধ। উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মধ্ব নীরবে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র বাঘ মাথা নত করিল, সেস্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল গভীর বনাঞ্চলে।

সবাই এবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; সত্যতীর্থকে গাছ হইতে নামাইয়া আনা হইল।

সত্যতীর্থ যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, "গুরুদেব, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা আমি করবো না। কারণ, আপনার চরণেই নিজেকে আমি বিকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু একটি প্রশ্ন আমি না ক'রে পারছিনে। আমার মত নগণ্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য আপনি কেন আপনার অমূল্য জীবন আজ বিপন্ন করতে গিয়েছিলেন?"

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু কহিলেন, "বৎস, তোমার জীবন যে বিষ্ণু-ভগবানের কর্ম্মে উৎসর্গ করা। ঐশ্বরীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করার জন্য তোমার যে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। তুমি আমার গীতাভাষ্য ও সূত্রভাষ্যের অনুলিপি লিখেছো। সেবায় ও কর্ম্মে নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছো। ঈশ্বরের আদিষ্ট কাজে আরো অনেক সাহায্য তুমি করবে। এই কথাটাই তো হিংস্র বাঘটাকে আকারে ইঙ্গিতে আমি বুঝিয়ে বললাম। তাই তো সে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে তোমায় ছেড়ে চলে গেল।"

নিজের যোগবিভূতির কথা, ঐ অলৌকিক ঘটনার কথা, মধ্ব কি সহজভাবেই না বর্ণনা করিলেন। শিষ্য ও সঙ্গীরা সবিস্ময়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

দীর্ঘ পরিব্রাজনের শেষে আচার্য্য মধ্ব এবার বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানকার প্রধান প্রধান মঠ-মণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। গীতাভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে যে নূতন দ্বৈতবাদী ভক্তি-ধর্ম্ম তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে স্থানীয় সাধক ও পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার মত বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। অতঃপর নিজের মতবাদের শাস্ত্রভিত্তিকে আরো দৃঢ় করিয়া নিয়া মধ্ব উপনীত হন পবিত্র সাধন-ধাম হরিদ্বারে।

মধ্বের অনেক দিনের আশা, ব্যাসগুহায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়া তপস্যা করিবেন, লাভ করিবেন শ্রীনারায়ণের অবতার ব্যাসদেবের পুণ্যময় দর্শন, তারপর তাঁহার চরণে সমর্পণ করিবেন স্বরচিত বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য। সে আশা এবার এতদিনে পূর্ণ হইল। দীর্ঘ ধ্যান-মননের ফলে মহামুনি ব্যাস জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন তাঁহার নয়ন সমক্ষে। মৃদু মধুর হাস্যে সূত্রের ভাষ্য স্বহস্তে তুলিয়া নিয়া তাঁহাকে করিলেন কৃতকৃতার্থ।

মহামুনি অতঃপর কহিলেন, “মধ্ব, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন। তোমার মতবাদ ভারতীয় দর্শনকে পুষ্ট করেছে, এযুগের ভক্তিধর্ম্মেরও করেছে বিস্তার সাধন। ভক্তি প্রচারের দিকে দৃষ্টি রেখে এবার তুমি মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণয়কারী একটি গ্রন্থ রচনা করো। এতে তোমার আরব্ধ পুণ্যকর্ম্ম হয়ে উঠবে সহজতর।”

মধ্বের হাতে একটি সম্পুট তুলিয়া দিয়া স্নেহভরে আরো কহিলেন, “বৎস, এতে রয়েছে তিনটি পরমপবিত্র শালগ্রামশিলা। দেশে ফিরে গিয়ে এই শিলা যে-যে স্থানে তুমি স্থাপন করবে সেই সেই স্থান পরিচিত হয়ে উঠবে জাগ্রত পীঠ রূপে।”[১]

এই অযাচিত করুণায় মধ্ব একেবারে অভিভূত। দুই নয়নে বহিতেছে আনন্দের অশ্রুধারা। মহামুনির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া, গুহা হইতে তিনি বাহির হইয়া আসেন।

হিমালয় ক্রোড়স্থিত মহাতীর্থগুলি পরিব্রাজন করার পর মধ্ব সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। এবার হইতে অধ্যাত্ম-ভারতের বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে আসিয়া তিনি দাঁড়ান, শুরু হয় ভক্তিসিদ্ধ মহাসাধক, অদ্বৈতবাদী মহাদার্শনিক, মধ্বাচার্য্যের অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের ভিতর মধ্ব-অনুগামীরা হইতেছেন আপোষহীন কট্টর দ্বৈতবাদী।

সারা জীবন মধ্ব শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, নিজের গ্রন্থসমূহে উপস্থাপিত করিয়াছেন প্রচুর শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি, যুক্তিতর্ক ও তথ্য-প্রমাণ। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির

---

১ এই পরম পবিত্র শিলাত্রয় মধ্বাচার্য্য সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন সুব্রহ্মণ্য, উড়ুপী ও মধ্যতল এই তিনটি মঠে।

উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন, বেদ-উপনিষদ অপেক্ষা পুরাণশাস্ত্রের সহায়তাই নিয়াছেন বেশী।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব আন্দোলনের এক বড় ভিত্তি। মধ্ব কিন্তু তাঁহার এই সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় পূর্ব্বসূরীর মতবাদের উপরও আঘাত হানিতে পশ্চাদপদ হন নাই।

মধ্ব মতের প্রধান ভিত্তি ভেদবাদ। ঈশ্বর ও জীব, সেব্যবস্তু ও সেবক নিত্য পৃথক, নিত্য ভেদযুক্ত। শুধু তাহাই নয়, ঈশ্বর স্বতন্ত্র, আর সবই অস্বতন্ত্র বা ঈশ্বর-নির্ভর। তাঁহার এই দ্বৈতবাদ দার্শনিক মহলে স্বতন্ত্র-অস্বতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। মধ্বপন্থীরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলেন—সদ্-বৈষ্ণব।

মধ্বাচার্য্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্থলে স্থাপন করিয়াছেন বিষ্ণু বা নারায়ণকে। তিনি বলেন, সৃষ্টির আদিতে বিরাজিত ছিলেন এক ও অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ভগবান নারায়ণ, তখন ব্রহ্মা বা শিব কেহই ছিলেন না।[১]

সেই বিষ্ণুর দেহ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে এই বিশ্বচরাচর[২] এবং এই বিষ্ণু বা নারায়ণই একমাত্র সৎ বস্তু, অশেষ সদ্‌গুণের আধারও তিনি বটেন। তিনি নির্দ্দোষ ও স্বতন্ত্র, তাঁহা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই অস্বতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন।[৩]

জীব ও ঈশ্বরের এই কেবল-ভেদ ছাড়া আচার্য্য আরও পাঁচ প্রকার ভেদের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ,

---

১ একো নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ,
আনন্দ এক এবাগ্র আসীন্নারায়ণঃ প্রভু॥

২ বিষ্ণোর্দেহাজ্জগৎ সর্বমাবিরাসীৎ। ৩ মহোপোনিষদের—“যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানা বৃক্ষরসা যথা’—ইত্যাদি শ্লোকে আচার্য্য মধ্বের দ্বৈতবাদের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জড় ও জীবে ভেদ এবং জীবসমূহ ও জড় পদার্থ সমূহের আভ্যন্তরীণ ও পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চ ভেদকে তিনি বলিয়াছেন প্রপঞ্চ।[১]

আচার্য্যের মতে, জীবের মোক্ষ বা মুক্তি তখনই হয় যখন তাহার জন্ম-মৃত্যুর যাতায়াত বা পুনর্জ্জন্মের অবসান ঘটে এবং সে যখন বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে স্থিতি লাভ করে।

তিনি আরও বলেন, মুখ্য প্রাণবায়ুর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ—এবং নারায়ণের পুত্র বায়ুর কৃপা ছাড়া জীবের মোক্ষলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। মধ্বের অনুগামী বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, এ যুগে মধ্বই হইতেছেন বায়ুর অবতার ; তাই তিনিই মানুষের ত্রাণকর্ত্তা। পুণ্যকর্ম্মের জন্য মধ্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন অক্ষয় স্বর্গবাস এবং মাধ্ব বৈষ্ণববাদের বিরোধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন অনন্ত নরকবাস।[২]

মধ্বের মতবাদ অনুসারে জীবাত্মা স্বাভাবিকভাবেই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত। এই অবিদ্যা দূর হয় এবং মোক্ষলাভ সম্ভব হয় ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পর। উন্নতশ্রেণীর জীবাত্মারাই এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং এজন্য তিনি প্রচার করিয়াছেন আঠারোটি অনুশাসন। এগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে—বৈরাগ্য, শম, গুরু-

---

১ বিশ্বকোষ, পৃঃ ১০২।

২ মধ্ব ছাড়া অপর কোন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় দার্শনিক বা সাধক অনন্ত নরকবাসের কথা প্রচার করেন নাই। তাই অনেকের ধারণা, খৃষ্টধর্ম্মের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই মধ্ব একথা বলিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের কল্যাণপুর খৃষ্টানদের প্রাচীন উপনিবেশরূপে খ্যাত। ষষ্ঠ শতকেও পর্য্যটক কস্‌মস্ ইন্‌ডিকো প্লয়ষ্টস্ কল্যাণপুরে এমন একজন ধর্ম্মযাজককে দেখিতে পান যিনি পারস্য হইতে এদেশে আসেন। এই কল্যাণপুর ছিল মধ্বের জন্মস্থান পাজকার কাছে, সমুদ্রের উপকূলে। কাজেই নিকটস্থ খৃষ্টানসমাজের দুই একটি খৃষ্টীয় তত্ত্ব মধ্বের মতবাদের সহিত মিশিয়া গেলে বিস্ময়ের কিছু নাই—দ্রঃ হেষ্টিংস এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিক্‌স, ভল্যু ঃ ৬।

সেবা, ভগবৎ-চরণে ভক্তি, উপাসনা, পূর্ব্বমীমাংসা অনুযায়ী শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, অসত্য মতবাদের বিরোধিতা প্রভৃতি।

তাঁহার মতে, বিষ্ণু সেবার উপায় তিনটি: প্রথম—অঙ্কন বা সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র ইত্যাদির চিহ্ন ধারণ। দ্বিতীয়—নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর বিভিন্ন নাম অনুসারে পুত্রাদির নাম রাখা। তৃতীয়—কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ ভজন।

জীবনের শেষপাদে আচার্য্য মধ্ব উড়ুপী ও অন্যান্য স্থানে কৃষ্ণ-মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বা মধুর ভজনের পথ অনুসরণ করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, মধ্ব মতবাদ হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্ব সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। আসলে এ ধারণার কোন ভিত্তি নাই।[১]

---

১ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজে বা তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য ও অনুগামীরা কোন সময়েই মধ্বকে আদিগুরু বলিয়া বর্ণনা করেন নাই বা নিজেদের মধ্ব সম্প্রদায়-ভুক্তও বলেন নাই। বরং নানাস্থানে মাধ্ব বা তত্ত্ববাদীদের সমালোচনাই করিয়াছেন। গৌড়ীয় গণোদ্দেশ দীপিকায় উদ্ধৃত মধ্বমঠের একটি গুরু-পরম্পরা এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি হইতেই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। আধুনিক গবেষণায় গৌড়ীয় গণোদ্দেশ দীপিকার শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বলদেব প্রথম জীবনে ছিলেন মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধক রাধাদামোদর দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয় গোষ্ঠীতে যোগ দেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রভাব ও আকর্ষণ বলদেব তখনও ছাড়িতে পারেন নাই। তাছাড়া, জয়পুরে থাকিতে তিনি অপর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রুতি-অনুগ নয় এবং তাঁহাদের নিজস্ব বেদান্ত-ভাষ্যই বা নাই কেন, এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াও তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়। এই সব কারণে বলদেব গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে উৎসাহী হন।

ব্যাসগুহা, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি হিমালয়ের জাগ্রত তীর্থসমূহে কিছুদিন অবস্থানের পর মধ্বাচার্য্য সমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। এ সময়ে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ-নগর তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং প্রচার করেন নিজের ব্যাখ্যাত ভক্তিবাদ।

অতঃপর আচার্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন দাক্ষিণাত্যে। গোদাবরী তীরের তীর্থ ও জনপদে বহু নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী নামে দুই পণ্ডিতের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এই অঞ্চলে। মধ্বের সহিত শাস্ত্র-বিচারে পরাস্ত হইয়া এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সাধন-ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দুই শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শোভন ভট্টের সন্ন্যাস নাম হয় পদ্মনাভতীর্থ। মধ্বের পরে তিনিই হন উড়ুপীর অধ্যক্ষ।

মধ্বের গুরু আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইলেও ভক্তিবাদের উপর তাঁহার আকর্ষণ ছিল সহজাত। প্রতিভাধর প্রিয় শিষ্যের সাহচর্য্য ও আকর্ষণ, তাঁহার ভক্তি-পর শাস্ত্রব্যাখ্যা ও দ্বৈত-বাদী নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন অচ্যুতপ্রকাশকে নবভাবে উদ্দীপিত

সাধ্য-সাধন সম্পর্কে চৈতন্য-মত ও মধ্ব-মতে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। চৈতন্যের ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল, আর মধ্বের ধর্ম্ম মহাভারতের দ্বারা প্রভাবিত। চৈতন্য গোপীপ্রেম, গোপীভজনকে উচ্চতম স্থান দিয়াছেন। মধ্ব বলিয়াছেন ইহার বিপরীত কথা। তাঁহার মতে, মহাভারতই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। আরও বলিয়াছেন, কৃষ্ণভক্তিতে ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ, গোপীরা ভক্তির অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত (দ্রঃ মধ্বাচার্য্য : ভাগবত তাৎপর্য্যম ১১।১২।২২)। তাছাড়া, "মধ্বাচার্য্য ব্রজবধূগণকে স্বর্বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতানুগ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পারকীয় সিদ্ধান্তকে হেয় প্রতিপাদন করিয়াছেন"—(দ্রঃ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ : অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, পৃ ১৯৯)। সুতরাং মহাপ্রভুর সুমহান গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মধ্ব-মতাবলম্বী বলার কোন যৌক্তিকতাই নাই। আসলে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বতন্ত্র পুরুষ—তিনি নিজেই নিজের ধর্ম্মসাম্রাজ্যের সংস্থাপক।

করিয়া তোলে। শেষটায় মধ্বের দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী তিনি গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত পণ্ডিতদের আগমনে মধ্বের বৈষ্ণব-আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠে। শত শত নরনারী উড়ুপীর মঠে আসিয়া গ্রহণ করে তাঁহার পরমাশ্রয়।

মধ্ব-মতের এই প্রসার এবং ভক্তিবাদীদের সংখ্যাধিক্য শৃঙ্গেরী মঠের কর্ত্তৃপক্ষকে চিন্তিত করিয়া তোলে। নূতন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদ, ভজন-পূজনের সহজ পন্থা, জনসাধারণের কাছে অনেক বেশী সহজবোধ্য। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে নবদীক্ষিত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও উদ্যম। ফলে দিনের পর দিন আচার্য্য মধ্বের শিষ্য, ভক্ত ও অনুগামীর দল বাড়িয়া উঠিতেছে।

পদ্মতীর্থ তখন শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ। মঠের সন্ন্যাসীদের নিয়া তিনি এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন। মধ্বাচার্য্যের প্রভাব কি করিয়া খর্ব্ব করা যায়, কিভাবে উড়ুপী মঠকে হীনবল করা যায় ইহাই বড় সমস্যা। বহু পরামর্শের পর স্থির হইল, মধ্বের ভক্তি-আন্দোলনকে একযোগে নানা দিক দিয়া আক্রমণ করিতে হইবে, চরম আঘাত হানিয়া করিতে হইবে বিধ্বস্ত। শৃঙ্গেরীর সন্ন্যাসীদের সবাইকে এই লড়াইয়ে নামিতে হইবে। যে সব রাজরাজড়া ও ধনী ব্যক্তিরা মঠের শিষ্য ও সমর্থক, তাঁহাদের যোগাইতে হইবে অর্থ ও লোকবল। প্রতি জনপদে, বিদ্যাকেন্দ্রে, মঠে, মন্দিরে খণ্ডন করিতে হইবে প্রতিপক্ষের মতবাদ। উড়ুপীর মঠে মধ্বাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রের এক বিরাট গ্রন্থশালা গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থশালাটি ধ্বংস করার গোপন ষড়যন্ত্রও এই সভায় করা হইল।

প্রচণ্ড উৎসাহে শৃঙ্গেরীর সন্ন্যাসীরা লড়াই-এ নামিয়া পড়েন। তাঁহাদের মঠ যেমন প্রাচীন, দলেও তেমনি আছে বহুসংখ্যক লোক। এ অঞ্চলের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অধিকাংশই তাঁহাদের সমর্থক। মধ্ব ও তাঁহার শিষ্যদের লাঞ্ছনা ও পীড়নের সীমা থাকে

না। তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় গ্রন্থশালাটি বিনষ্ট করা হয় সুকৌশলে। রাত্রিযোগে আকস্মিকভাবে একদিন ইহা লুণ্ঠিত হয়। যেসব দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্র-গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া মধ্ব তাঁহার নূতন মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, ভক্ত শিষ্যদের প্রস্তুতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, দুষ্টের চক্রান্তে তাহা কোথায় উধাও হইয়া গেল। আচার্য্য এবং তাঁহার অনুগামীরা এই চরম আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন।

কিন্তু মধ্ব হার মানিবার পাত্র নন। যে ঈশ্বরীয় কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, চরম দুর্দ্দৈবের আঘাত আসিলেও সে কাজে তিনি বিরত হইবেন না। বিষ্ণুমঙ্গলের রাজা জয়সিংহ শৃঙ্গেরী মঠে যাতায়াত করিতেন, আবার এই রাজা আচার্য্য মধ্বের উপরও ছিলেন শ্রদ্ধাবান। ভাবিয়া-চিন্তিয়া মধ্ব সেদিন জয়সিংহের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "মহারাজ, প্রাচীন পুঁথিপত্রের এই অপহরণ শুধু বৈষ্ণবদেরই ক্ষতি নয়, এ ক্ষতি দেশের সকল শাস্ত্রবিদের, সকল নরনারীর। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ গবেষক মাত্রেরই স্বার্থ-হানি হবে এতে। আপনি একটু উদ্যোগী হয়ে শৃঙ্গেরীর মঠাধীশকে বুঝিয়ে বলুন, অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করুন।"

রাজা জয়সিংহ মধ্যস্থতা করিতে রাজী হন। শৃঙ্গেরীতে গিয়া মঠাধ্যক্ষকে নানাভাবে তিনি বুঝান, আপন প্রভাব প্রতিপত্তি প্রয়োগ করেন। তাঁহার এই দৌত্যকার্য্য সফল হয় এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলি তিনি উড়ুপীর গ্রন্থাগারে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।

এ ঘটনার পরও বেশ কিছুদিন উভয় মঠের মতবিরোধ ও বৈরিতা চলিতে থাকে। উত্তরকালে অবশ্য এই মতবিরোধের অবসান ঘটে, মাধ্ব বৈষ্ণব ও শৃঙ্গেরীর অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং উভয়ে উভয়ের মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষায় যত্নবান হন। এ সময়ে উড়ুপী ও শৃঙ্গেরী মঠে তীর্থকামী বৈষ্ণব ও অদ্বৈতবাদীরা যাতায়াত করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে।

যে সব বৈষ্ণব-বিরোধী প্রভাবশালী পণ্ডিত আচার্য্য মধ্বের শরণ

নিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্যতম ত্রিবিক্রম আচার্য্য। ইনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা শৈব। শুধু মধ্বের যুক্তিতর্ক ও বিচার-মল্লতা দেখিয়াই নয়, তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন ও অপূর্ব্ব সাধনানিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়াই ত্রিবিক্রম আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার বৈষ্ণবমত গ্রহণ বহুতর শৈবকে মধ্ব-মতের অনুরাগী করিয়া তোলে। এই নবদীক্ষিত পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণ আচার্য্যই উত্তর-কালে হন মধ্বের জীবন-কাহিনীর রচয়িতা, দীক্ষাদান কালে মধ্ব ত্রিবিক্রম আচার্য্যকে একখানি নয়নমন-লোভন কৃষ্ণমূর্ত্তি উপহার দেন। কোচিন রাজ্যে, দক্ষিণ কানাড়ায় আজিও ভক্ত বৈষ্ণবেরা সাগ্রহে এই অনুপম বিগ্রহটি তীর্থযাত্রীদের দর্শন করায়।

১২৭৫ খৃষ্টাব্দে মধ্বের পিতা দেহরক্ষা করেন। ইহার অল্পকাল মধ্যেই মধ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তাঁহার নূতন নাম হয় বিষ্ণুতীর্থ। আচার্য্য মধ্বের বৈষ্ণব আন্দোলনে সুপণ্ডিত বিষ্ণুতীর্থের অবদান প্রচুর।

জীবনের শেষপাদে মধ্বের ভক্তিসাধনা রূপান্তরিত হয়। নৈষ্ঠিক ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়া পড়ে ভাবময়তা ও রসের দিকে। হৃদয়াসনে এতকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন শেষশায়ী বিষ্ণু, এবার তাহা অধিকার করেন অখিলরসামৃতসিন্ধু—বালগোপালমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ।

ধ্যান-সমাহিত মধ্বের নয়নসমক্ষে প্রভু বালগোপাল সেদিন আবির্ভূত হন। আবদারের সুরে কহেন, "আচার্য্য, এত মঠ-মন্দির তো করলে, কিন্তু আমার জন্য একটা ঠাঁই রাখলে না। তোমার ভক্তি-ভালবাসা কেমনতর গো? আমি শিগ্গীরই আসছি, আমার মূর্ত্তি তুমি পাবে। সাগর থেকে ফেরা নৌকোর ভেতর আমি থাকবো। আমায় তুলে নিয়ে স্থাপন করবে তোমাদের মন্দিরে।"

ঠাকুর অন্তর্হিত হন। মধ্বের হৃদয়ে অনুরণিত হইতে থাকে

তাঁহার মধুনিষ্যন্দী কণ্ঠের ঝঙ্কার। দিব্য আনন্দে আচার্য্য মধ্বের দেহ-মন-প্রাণ আপ্লুত হয়, দৈবী আশ্বাসের প্রেরণায় নব-চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন।

কয়েকদিন পরের কথা। শিষ্য ও ভক্তদের আমন্ত্রণে মধ্ব সেদিন সমুদ্রতীরে মালপী বন্দরে গিয়াছেন। অতি প্রত্যূষে ধ্যানজপ সারিয়া আচার্য্য বন্দরের মুখে, তটভূমিতে একাকী পাদচারণা করিতেছেন। হঠাৎ দূরে নয়নপথে পড়িল একটি সমুদ্রগামী নৌকা। সাগর-মোহনার একপ্রান্তে কিছুদিন যাবৎ জাগিয়া উঠিয়াছে এক বিস্তৃত চড়া, নদীর উপরিভাগ হইতে সহসা ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না। সমুদ্রগামী নৌকার মাঝি এই অদৃশ্য চড়ার কবলে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যেদিকে সে নৌকা চালনা করে চড়ায় ঠেকিয়া যায়, বাহির হইবার কোন সন্ধানই পাইতেছে না।

দূর হইতে আচার্য্য মধ্বকে দেখিয়া মাঝি ডাকিয়া কহিল, "সাধু-বাবা, আমি মহাবিপদে পড়েছি। চড়া থেকে নৌকো বাঁচাতে পারছিনে, দয়া ক'রে গভীর জলে বেরুবার পথ বলে দিন।"

মধ্ব হাঁক দিয়া কহিলেন, "ভয় নেই, মাঝি। আমার এই উত্তরীয় যেদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচ্ছি তা লক্ষ্য করে তুমি নৌকো চালাও। পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।"

বলা বাহুল্য, সিদ্ধপুরুষ মধ্ব তাঁহার অলৌকিক বিভূতির বলে নদীতলের অবস্থা সবই জানিয়া নিয়াছেন। ঠিক কোন্ পথে চলিলে নৌকাটি চড়ার দুষ্টচক্র এড়াইতে পারিবে, গভীর জলে পড়িয়া আবার সচল হইবে মাঝিকে সে নির্দ্দেশ দেওয়া দরকার। তাই তীরে দাঁড়াইয়া বার বার তিনি উত্তরীয় আন্দোলন করিতেছেন আর মাঝি সেই অনুসারে করিতেছে নৌচালনা। অবশেষে দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান ঘটিল, চড়া হইতে মুক্ত হইয়া নৌকাটি বন্দরের একপাশে আসিয়া ভিড়িল।

মাঝির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিভরে মধ্বকে

প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভু, আপনার কৃপায় নৌকাটি আজ বাঁচাতে পারলাম, নইলে ধনে-প্রাণে নিজেও মারা যেতাম। আমার বাড়ী এই দক্ষিণেরই আদমা গ্রামে। দ্বারকায় মালপত্র বিক্রি করতে গিয়েছিলাম, ফেরবার পথে এই বিপত্তি। ভাগ্যিস্ এ সময়ে এখানে আপনার দর্শন পেলাম। প্রভু, আমার একান্ত ইচ্ছে, আপনাকে আমি কিছু অর্থ দিই, আর আপনি তা ঠাকুরের সেবায় লাগান।"

"বাবা, তোমার অর্থের লোভে আমি এই ভোরবেলায় বন্দরের মোহনায় এসে দাঁড়াইনি। তুমি এখানে আসবে, আর নৌকোটি চড়ায় ঠেকবে, এসব আগে থেকেই আমার জানা। যাক্, নৌকোর খোলের ভেতর কি আছে বল ?"

মাঝি ভাবিল, 'সাধুবাবা নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে, নৌকোর ভেতর বহুতর দামী মালপত্র আছে। তা থেকে তিনি কিছু বাছাই করে নিতে চান।' হাসিয়া কহিল, "প্রভু, নৌকোর খোলে দামী বস্তু কিছুই নেই। রয়েছে শুধু একরাশ মাটির ঢেলা। দ্বারকায় সব মালপত্র বিক্রি হয়ে গেল। ফেরবার পথে শূন্য নৌকা কেবলই টাল খাচ্ছে। ভাবলুম, কিছু ভারী জিনিষ বোঝাই করা যাক্। কাছেই গোপী-সরোবর। সেখানকার মাটি—গোপীচন্দন যাকে বলে, খুব পবিত্র। তারই কতকগুলো বড় বড় খণ্ড নৌকোর খোলে পুরে নিলাম। ভাবলাম, নৌকোর তলা ভারী করার কাজ এতে হবে, আবার ঐ গোপীচন্দন এখানকার ভক্ত মানুষদের বিলানোও যাবে। আর তো কোন দামী জিনিষপত্র আমার নেই।"

"ভাই, ঐ বস্তুই যে আমার কাছে মহাদামী, মহাপবিত্র।"—প্রসন্ন সুরে উত্তর দেন আচার্য্য মধ্ব। "তুমি ওর থেকে বেছে সব চাইতে বড় খণ্ডটি আমায় দাও। তোমার মাটির ঢেলায় কোন্ পরম বস্তু লুকোনো আছে, তা তুমি জানো না, ভাই।"

"বেশ তাই হবে, আপনার যেমন অভিরুচি।" সানন্দে একথা

বলিয়া মাঝি একটি বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড নৌকোর তলা হইতে বাহির করিল, গড়াইয়া দিল আচার্য্য-মধ্বের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড। উহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল শিলাময় এক অনিন্দ্যসুন্দর বালগোপাল মূর্ত্তি। গোপালের দক্ষিণহস্তে দধিমন্থনের দণ্ড, আর বামহস্তে মন্থনদণ্ডের সূত্র।

সদ্যপ্রকটিত এই শ্রীমূর্ত্তি নিয়া মধ্ব ও তাঁহার ভক্তশিষ্যেরা সাড়ম্বরে উড়ুপীতে আসিয়া পৌঁছেন। গোপীচন্দনলিপ্ত বালগোপালকে এখানকার বৃহত্তম সরোবরের[১] তীরে নামাইয়া স্নান-অভিষেক করানো হয়, পূজা অর্চ্চনার শেষে স্থাপন করা হয় একটি নব-নির্ম্মিত মঠে।

আটজন প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্যের উপরে মধ্ব ন্যস্ত করেন তাঁহার পরমপ্রিয় বালগোপালের অর্চ্চনা, ভোগরাগ ও সর্ব্ববিধ সেবাকার্যের ভার।[২]

মধ্বের দীর্ঘজীবন ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্যায় ভরা। দার্শনিক মতবাদের বিস্তার, ভক্তিধর্ম্মের আন্দোলন এবং বৈষ্ণবগ্রন্থের রচনা[৩] ও প্রচারের মধ্য দিয়া ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির উপর তিনি দূরবিস্তারী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উত্তর-সাধকেরাও তাঁহার দ্বৈত-

---

১ এই সরোবর আজো স্থানীয় জনসমাজে মধ্ব-সরোবর নামে পরিচিত।

২ পরবর্ত্তীকালে এই আটজন সন্ন্যাসী শিষ্য বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি কৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এই আটটি মঠ আবার দুইটি করিয়া দ্বন্দ্বমঠ নামে পরিচিত হইয়াছে। উড়ুপীস্থিত মূল মধ্ব-মঠকে বলা হয়—উত্তরাদি মঠ। আচার্য্য মধ্বের পরে মূল মঠের অধ্যক্ষ হন তাঁহার মন্ত্রশিষ্য পদ্মনাভতীর্থ।

৩ মধ্বের প্রধান গ্রন্থত্রয়ের নাম—গীতাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়। ইহা ছাড়াও আরো ৩৫টি ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মতবাদ ও বৈষ্ণব আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করার কাজে কম খ্যাতি অর্জ্জন করেন নাই।[১]

আরব্ধ ঈশ্বরীয় কর্ম্মের এক বিরাট অধ্যায় সমাপন করিয়া আচার্য্য একদিন অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেন তাঁহার মর্ত্তলীলায় ছেদটানার অভিপ্রায়। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দের শুক্লানবমী তিথি। এ সময়ে সরিদন্তর নামক স্থানে প্রধান শিষ্যদের কাছে আচার্য্য ঐতরেয় উপনিষদের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রদানে রত রহিয়াছেন। এই সময়ে লীলা অবসানের পরমমুহূর্ত্তটি অগ্রসর হইয়া আসিল। ইষ্টধ্যানে সমাহিত হইয়া আচার্য্য মধ্ব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, প্রবিষ্ট হইলেন ইষ্টধামের নিত্যলীলায়।

শুধু দাক্ষিণাত্যেরই নয়, সারা ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ হইতে ঘটিল এক ইন্দ্রপাত।

---

১ মধ্বমতাবলম্বী দার্শনিক ব্যাসরাজের রচিত 'ন্যায়ামৃত'—অদ্বৈতবাদ বিরোধী এক প্রধান গ্রন্থ। উত্তরকালে ভারতবিশ্রুত মনীষী মধুসূদন সরস্বতীকে এই গ্রন্থের যুক্তিখণ্ডনে প্রচুর আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

সনাতন গোস্বামী

নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্য সে-বার নবদ্বীপে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, জননীর চরণ দর্শন আর কিছুদিনের জন্য পবিত্র গঙ্গাতীরে বাস। সে কাজ সাঙ্গ হইয়াছে। এবার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবনের জন্য। প্রাণগোবিন্দের লীলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে মন হইয়াছে উতল, যমুনায় অবগাহনের লোভও হইয়া উঠিয়াছে দুর্নিবার। প্রভু তাই সাঙ্গোপাঙ্গসহ তাড়াতাড়ি ব্রজের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

কিন্তু একি বিচিত্র কাণ্ড? ঝাড়খণ্ডের পথে না গিয়া তিনি হঠাৎ উত্তরের দিকে বাদশাহ হুসেন শাহের রাজধানী গৌড়ের দিকে চলিলেন কেন? তিনি কি পথ ভুলিলেন? অথবা কি আছে তাঁহার মনে, কে জানে?

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভু গর্গর মাতোয়ারা। সঙ্গীদের অন্তরেও লাগিয়াছে এই প্রেমের ঢেউ। নৃত্য কীর্ত্তনে সারা পথটি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আর এই দেবপ্রতিম সন্ন্যাসীর পিছে পিছে চলিয়াছে ভাবাকুল এক বৃহৎ জনতা। চলিতে চলিতে সেদিন প্রভুর এই দলটি আসিয়া উপস্থিত হয় গৌড়ের উপকণ্ঠে, রামকেলীর অনতিদূরে।

রাত্রে প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় নিতান্ত দীনবেশে সেখানে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন স্থানীয় দুই কৃতী পুরুষ, দুই সহোদর ভ্রাতা। ধর্ম্মনিষ্ঠা আর শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত ভক্তি প্রেমের অপরূপ মিলন ঘটিয়াছে তাঁহাদের জীবনে।

যুক্তকরে, দন্তে তৃণ নিয়া, উভয়ে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়েন। ভক্তেরা পরিচয় করাইয়া দেন, "প্রভু, এঁরা দু'ভাই গৌড়ের বাদশা হুশেন শাহের প্রধান অমাত্য। বড় ভাই হচ্ছেন অমরদেব। রাজকীয় উপাধি—দবীর খাস। আর ছোটভাই সন্তোষদেব, সাকর মল্লিক বলে ইনি সরকারী মহলে পরিচিত। শাস্ত্রবিদ্যা,

ধর্ম্মাচরণ ও দানধ্যানের খ্যাতি যেমন এঁদের আছে তেমনি আছে অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও মান-মর্য্যাদা। কিন্তু সর্ব্বোপরি রয়েছে সত্যকার কৃষ্ণভক্তি।”

প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার দীপ্তি। প্রবীণ ভক্ত অমর দেবকে সস্নেহে টানিয়া তোলেন, আবদ্ধ করেন প্রগাঢ় আলিঙ্গনে। মৃদু মধুর কণ্ঠে কহেন, “তোমার প্রেরিত পত্র আমি যথাসময়ে পেয়েছি, তার উত্তরও দিয়েছি। তোমরা দুভাই যে কৃষ্ণ-কৃপার মহা অধিকারী! তাইতো তোমাদের দর্শনে ছুটে এলাম। ছাখো আমার কৃপাময় কৃষ্ণের কি অপূর্ব্ব লীলা! ব্রজধামে যাবার জন্য বেরিয়েছি, কিন্তু সোজা সেদিকে না গিয়ে অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটে এলাম এই অঞ্চলে। গৌড়ে আসবার আমার কোন প্রয়োজনই নেই। এসে পড়েছি শুধু তোমাদেরই জন্য।”

বৃন্দাবন যাত্রী প্রভুর পথভ্রান্তির মর্ম্ম এবার বুঝা গেল। ভক্তেরা নীরবে দাঁড়াইয়া একে অন্যের মুখ চাহিতে লাগিলেন।

প্রভুর একি অপার অনুগ্রহ, একি অহেতুকী কৃপা! অমরদেব ও সন্তোষদেবের নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রুর ধারা। পরিত্রাতা আজ স্বয়ং অযাচিতভাবে দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত! এযে তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। কান্না আর আর্ত্তিতে উভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়েন।

চরণতলে পতিত হইয়া দৈন্যভরে নিবেদন করেন, “প্রভু, কৃপা করে যদি এলেই, এবার তবে এই অধমদের উদ্ধার সাধন করো। তোমার শ্রীচরণের সেবক করে নাও। বিষয়-বিষে এ জীবন হয়ে উঠেছে দুঃসহ।”

দুই ভাইকে আশিস জানাইয়া শ্রীচৈতন্য কহিলেন, “ভয় নেই তোমাদের। অচিরে কৃষ্ণ তোমাদের কৃপা করবেন, তাঁর নিজ কর্ম্মে করবেন নিয়োজিত। তোমাদের যে আমি দেখছি কৃষ্ণের চিহ্নিত সেবকরূপে। আজ থেকে তোমাদের আমি নূতন নামকরণ করলাম।

অমর আর সন্তোষ—এখন থেকে পরিচিত হবে সনাতন আর রূপ নামে।”

প্রভুর সেদিনকার দর্শন ও স্পর্শন সনাতন ও রূপের জীবনে বিপ্লব ঘটাইয়া দেয়। তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ হইয়া উঠে অমোঘ। উত্তরকালে দুই ভাই প্রসিদ্ধি লাভ করেন প্রভুর অন্যতম পার্ষদরূপে। সনাতন গোস্বামী নির্ম্মাণ করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সুদৃঢ় শাস্ত্রীয় ভিত্তি, স্থাপন করেন ভক্তিময় তপস্যার বলিষ্ঠ আদর্শ। আর তাঁহার অনুজ রূপ গোস্বামীর মাধ্যমে সাধিত হয় রাধাকৃষ্ণ লীলা-রসের পরিপুষ্টি ও বিস্তার—উদ্‌ঘাটিত হয় গোপীভজনের নিগূঢ় পদ্ধতি।

সনাতনের পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে। চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগে কর্ণাটদেশের পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু। ইঁহার বংশধর রূপেশ্বরদেব এক সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শাস্ত্রবিদ্যা ও রাজকার্য্য দুয়েতেই দেখা যাইত এই অভিজাত বংশের সমান পারদর্শিতা। তাছাড়া, দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবীয় সাধনার ধারাও ইঁহাদের জীবনে কিছুটা বহমান ছিল।

এই বংশের কুমারদেবের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন তিন পুত্র—অমর, সন্তোষ ও বল্লভদেব। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর জন্মগ্রহণ করেন ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে; ইনিই উত্তরকালের বহু বিশ্রুত বৈষ্ণবসাধক—সনাতন গোস্বামী। বৃন্দাবনের ধর্ম্মজীবনের নিয়ন্তারূপে, মহাপ্রতিভাধর ভক্তিশাস্ত্রবিদ্-রূপে তাঁহার খ্যাতি সারা ভারতে প্রচারিত হয়। আর গৌড়ীয় সাধকসমাজে তিনি গণ্য হন প্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপে।

সনাতনের পিতার নাম মুকুন্দদেব। গৌড় রাজসরকারের এক উচ্চপদে তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান ছিল গৌড়ের উপকণ্ঠস্থিত রামকেলীতে। ঐ স্থানটি কানাই-নাটশালা

নামেও সে সময়ে পরিচিত ছিল। মুকুন্দদেব নিজে ছিলেন ভক্তিমান সাধক। পূজা-পার্ব্বণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও রামলীলার উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রাসাদভবন সদাই থাকিত মুখরিত।

বালক পৌত্রদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করিতে মুকুন্দদেব ত্রুটি করেন নাই। সনাতন ও রূপের শিক্ষাদানের ভার পড়ে রামভদ্র বাণীবিলাস নামক পণ্ডিতের উপর। প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত হইলে দুই ভ্রাতাকে পাঠানো হয় তখনকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে। সেখানে কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা শাস্ত্রে তাঁহারা পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

প্রথমে শিক্ষাগুরুর পদে বৃত হন প্রখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যা-বাচস্পতির টোলে থাকিয়া সনাতন ও রূপ শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বাদি অধ্যয়ন করেন। দুজনেই অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী। তাই নবদ্বীপে থাকিতেই তাঁহাদিগকে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার অর্জ্জন করিতে দেখা যায়।

কিন্তু সে যুগে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অধিগত করিলেই বৈষয়িক জীবনে উন্নতি সাধন করা যাইত না। বাদশাহের দরবারের ভাষা ছিল ফার্সী। এই ফার্সী ভালভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। পরিবারের কর্ত্তা তাই সনাতন ও রূপের ফার্সী শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করেন। সপ্তগ্রামে তাঁহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানকার মুসলমান শাসনকর্ত্তা ফকর উদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উভয় ভ্রাতা ফার্সী ও আরবী বিশেষজ্ঞ মোল্লাদের কাছে পাঠ গ্রহণ করিতে থাকেন, অচিরে ঐ ভাষা দুইটি ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াও ফেলেন।

ফার্সী ও আরবী সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি কিন্তু সনাতন ও রূপের ব্যক্তিগত কৃষ্টি ও ধর্ম্মাচারণকে কোনদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই।

রাজ-অমাত্যপদ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমান বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও কম করেন নাই, কিন্তু নিজস্ব ধর্ম্মীয় আচার-আচরণ ও ভাবধারাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন সতর্কভাবে।

তাঁহাদের রামকেলীর ভবন বরাবরই ছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শাস্ত্রবিদ ও ধর্ম্মাচার্য্যদের মিলনস্থল। বিশেষ করিয়া শিক্ষক বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সনাতনের যোগ ছিল অত্যন্ত বেশী। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ আচার্য্যকে তিনি গুরুর মতই শ্রদ্ধা করিতেন। পরম সমাদরে প্রায়ই তাঁহাকে রামকেলীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত। তাঁহার সহিত শাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম্মালোচনায় সনাতন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন। উত্তরকালে চৈতন্যচরণে আশ্রয় নিবার পর হইতে সনাতনের শাস্ত্র পাঠের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় ভক্তিশাস্ত্রের দিকে।

বৃন্দাবনবাসের প্রথম যুগে পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক এক বিশিষ্ট ভক্তিসিদ্ধ আচার্য্যের কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব হয় তাঁহার অধিগত।

পিতামহ মুকুন্দদেবের লোকান্তরের পর, তাঁহারই পদে সনাতন রাজসরকারে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। তারপর ধীরে ধীরে নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার বলে পাঠান রাজ্যের অন্যতম প্রধান অমাত্যের পদে উন্নীত হন।

রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শাসন প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যেই সুলতান হুসেন শাহকে সনাতনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। সনাতন ক্রমে বাদশাহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন; তাঁহার অনুজ রূপ এবং অনুপমও তাঁহারই প্রভাবে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন।

তখনকার দিনে রামকেলীর দেবভ্রাতাদের পদমর্য্যাদা, প্রভাব ও বিত্ত-বিভবের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। তাঁহাদের প্রাসাদের চারিদিকে ছড়ানো ছিল বহুসংখ্যক মন্দির, মণ্ডপ ও নাটশালা। খ্যাত-

নামী হিন্দু বিদ্বজ্জন, আচার্য্য ও সাধু-সন্ন্যাসী মাত্রেই রামকেলীতে সনাতনের সভাকক্ষে পদার্পণ করিতেন, গ্রহণ করিতেন তাঁহার সেবা ও পৃষ্ঠপোষকতা। সনাতন ও তাঁহার ভ্রাতাদের বদান্যতায় দেশের দূর দূরান্তস্থিত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বহু ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। এই সব কারণে রামকেলীর খ্যাতি ও সনাতনের প্রভাব প্রতিপত্তি সারা গৌড়দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের দবীর খাস—একান্ত সচিব। তৎকালীন যে কোন শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মত তিনি ফার্সী ও আরবীতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। বিধর্ম্মী সুলতান এবং ওমরাহদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতির অনেক কিছু তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হইত। গৌড় দরবার বা সুলতানের শিবিরে অবস্থান কালে তাঁহার বেশভূষা ও চালচলন দেখিয়া সাধারণ মানুষ তাঁহাকে ধরিয়া নিত মুসলমান ভাবাপন্ন বলিয়া। কিন্তু দিনান্তের কার্য্যশেষে রামকেলীতে গেলেই ফুটিয়া উঠিত তাঁহার আর এক রূপ। বাদশাহী দরবারের বাহ্য আচার-আচরণ, হাব-ভাব তিনি ত্যাগ করিতেন। স্নান তর্পণের পর শুরু হইত দানধ্যান, পূজা-অর্চ্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মীয় আলাপ-আলোচনা।

কিন্তু এত দানধ্যান, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দরবারী পদমর্য্যাদা সত্ত্বেও সনাতনের পরিবারের ভাগ্যে কিন্তু সামাজিক কৌলিন্য জুটে নাই। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে এই পরিবার ছিল পতিত—মুসলমানের ঘনিষ্ঠতা ও স্পর্শদোষের জন্য অবজ্ঞাত। এই জন্যই বঙ্গীয় কায়স্থদের কুলজীতে ইঁহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বিধর্ম্মীয় আচার-আচরণদুষ্ট সনাতন এতদিনে পাইয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের দুর্লভ দর্শন। সারা দেহ ও মনপ্রাণে আসিয়াছে দিব্য আনন্দের জোয়ার। প্রভুর এই দর্শনের পরে নূতন মানুষে তিনি হইয়াছেন রূপান্তরিত।

সনাতনের জীবনের এ পরিবর্ত্তন শুরু হইয়াছে দীর্ঘদিন যাবৎ, অগ্রসর হইয়াছে প্রচ্ছন্ন ধারায়। বিত্ত বিষয় ও দরবারী মর্য্যাদার চাপে যে জীবন চাপা পড়িয়াছিল, আকুল হইয়া এতদিন তাহা কেবলি মাগিতেছিল বন্ধনমুক্তি। এবার সে মুক্তি সমাগত।

বাহ্যজীবনে সনাতন ছিলেন প্রভাবশীল রাজ-অমাত্য, আর অন্তরে দৈন্যময়, ত্যাগব্রতী মহাবৈষ্ণব। অন্তর্জ্জীবনে তাই এতদিন ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছিল অধ্যাত্ম-সাধনার পরমসঞ্চয়, একান্ত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্তি ও প্রেমধর্ম্মের আদর্শ। তাঁহার এই গোপন প্রস্তুতিই সেদিন আকর্ষণ করিয়াছিল চৈতন্যদেবকে। সুদূর রামকেলীতে প্রভু ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের চিহ্নিত পার্ষদ ও লীলা-পরিকর সনাতন ও রূপ এই দুই ভাইকে তিনি অবলীলায় করিয়াছিলেন আত্মসাৎ।

সনাতনের জীবন ছিল বৈষ্ণবীয় সাধনার জন্য উন্মুখ, সদা ভক্তি-ধৃত। তাঁহার পক্ষে ইহা আকস্মিক কিছু নয়। এ মনোবৃত্তি ও সাধনধারা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যেও বর্ত্তমান. ছিল। বংশগত বৈশিষ্ট্যটিই অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সাধননিষ্ঠ সনাতনের জীবনে। আর প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় উত্তরকালে উহা লাভ করিয়াছিল চরম সার্থকতা।

হুসেন শাহের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন সনাতন। রাজ্যের জটিল কর্ম্মের দায়িত্বভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়া বাদশাহ নিশ্চিন্ত থাকিতেন। শুধু শান্তির সময়েই নয়, যুদ্ধাভিযানে বাহির হইলেও হুসেন শাহ তাঁহার এই প্রতিভাধর অমাত্যকে সঙ্গে রাখিতেন। কিন্তু এই রাজানুগ্রহ, এই দায়িত্বভার ও মর্য্যাদা ক্রমে ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। বিষয়-কীট হইয়া দিন যাপন করা আর তাঁহার সহ্য হইতে চায় না। বাদশাহের সেনাধ্যক্ষেরা সে-বার নির্ম্মমভাবে উড়িষ্যায় দেব-দেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করে। ভক্ত সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুরু হয় তীব্র অনুতাপের দহন। দিনের পর দিন ভাবিতে

থাকেন, একি পাষণ্ডীর জীবন তিনি যাপন করিতেছেন? সদাই অনুসন্ধান করিতে থাকেন উদ্ধারের উপায়।

রামকেলী ও তাহার আশেপাশে সনাতন গড়িয়া তুলিয়াছেন এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মীয় পরিবেশ। অজস্র মঠ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, খনন করা হইয়াছে পবিত্র কুণ্ড। প্রায়ই তিনি দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদ ও ভক্ত সাধকদের। গৌড় দরবারের কাজ শেষ হইলেই রামকেলীর ভক্তিময় পরিবেশে আসিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে বসেন, সাধন-ভজনে রত হন।

এমনি পরিবেশে থাকিয়া সনাতনের জীবনে জাগিয়া উঠে ভক্তিপ্রেমের সুপ্ত চেতনা। রামকেলীতে তাঁহার নিজের তৈরী কৃষ্ণ-লীলাস্থলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহরণ করেন দিব্য আনন্দ।

বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে
কদম্ব কানন ধারা শ্যামকুণ্ড তাতে।
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন,
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ। (ভক্তি রত্নাকর)

অতঃপর তীব্র আর্ত্তি জাগে জীবনে, আর এই আর্ত্তির মধ্য দিয়া নামিয়া আসে কৃষ্ণপ্রেমের রসস্রোত। সংসারের বিত্ত-বিভব, যশ মান সব কিছু নিরর্থক হইয়া উঠে। আকুলভাবে চিন্তা করিতে থাকেন—কোন্ পথে, কাহার নির্দ্দেশে মিলিবে বহুবাঞ্ছিত কৃষ্ণ দর্শন? কবে অপ্রাকৃত লীলারসে অবগাহন করিবেন? কবে এ জীবন হইবে কৃতকৃতার্থ?

এমনি সময়ে সনাতনের কাণে পৌঁছিল প্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা। নীলাচলে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। প্রেমভক্তির প্রবল রসতরঙ্গে তিনি ভাসাইয়া নিতেছেন অগণিত ভক্ত সাধককে। এই তরঙ্গের ঢেউ সেদিন সনাতনেরও হৃদয়তটে আসিয়া আঘাত করে। জাগিয়া উঠে পরম উপলব্ধি—এই প্রভুই যে জীবের উদ্ধারকর্ত্তা! আর ইনি যে তাঁহারই জীবনপ্রভু!

আকুল আবেদন জানাইয়া সনাতন শ্রীচৈতন্যকে পত্র দিলেন— "প্রভু, তুমি আবির্ভূত হয়েছো জীবের উদ্ধারের জন্য। একটিবার আমার মত অধমজনের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করো। আমি একে বিষয়-কীট, তদুপরি ম্লেচ্ছাচারী—পতিত। আমার মুক্তির কি কোন উপায় নেই? মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছে, এ ঘৃণ্য সংসারজীবন ত্যাগ করবো। আমায় অনুমতি দাও, তোমার চরণতলে নিজেকে উৎসর্গ করি, সারা জীবন কাটিয়ে দিই তোমার দিব্য মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ ক'রে।"

নীলাচলের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা প্রভুকে এই দৈন্যময় পত্র দিলেন। কহিলেন, "গৌড়ের বাদশাহ, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ হুসেন শাহের ইনি প্রধান অমাত্য। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্ম্মকুশলতার দিক দিয়ে এঁর জুড়ি নেই। এমন মানুষও তোমার নর্ত্তনে কীর্ত্তনে পাগল হয়ে উঠেছে; রাজৈশ্বর্য্য ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হতে চাচ্ছে— এ তো তোমার অলৌকিক কৃপালীলা ছাড়া আর কিছু নয়, প্রভু।"

প্রভুর অধরে মৃদু মধুর হাসি দেখা দেয়। বার্ত্তাবহের হস্তে তখনি তিনি এক পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে আর কোন কথা নাই, আছে শুধু একটি মাত্র শ্লোকের উদ্ধৃতি—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নং॥

অর্থাৎ, পরপুরুষে আসক্তা কোন নারী যেমন গৃহকর্ম্মে থেকেও প্রেমিকের স্মৃতি সদাই ধরে রাখতে পারে, তেমনি বিষয়ে লিপ্ত থেকেও চিত্তকে ডুবিয়ে রাখা যায় তাঁর প্রেম-রসে।

সনাতন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ব্ব দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্বে পারঙ্গম। তাই প্রভু তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়াই স্বামী বিদ্যারণ্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ পঞ্চদশী হইতে ঐ শ্লোকটি লিখিয়া পাঠান।

প্রভুর এই শ্লোকপত্রের ইঙ্গিত পরিষ্কার। সনাতন বুঝিলেন, মিলনলগ্ন এখনো উপস্থিত হয় নাই, তাই প্রভু তাঁহার সানুনয় অনুরোধ

কৌশলে এড়াইয়া গেলেন। হৃদয়ের আগুন চাপিয়া রাখিয়া এখনো কিছুদিন তাঁহাকে সংসারে বাস করিতে হইবে।

প্রভুর কাছ হইতে ঐ পত্র পাইবার পর হইতে সনাতনের ব্যাকুলতা আরো বাড়িয়া যায়। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় করুণ আর্ত্তি ও কান্নায়।

অবশেষে এই সেদিন রামকেলীতে বসিয়া প্রভুর কৃপা মিলিল। সুদূর পুরীধাম হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজে যাচিয়া সনাতনকে তিনি দর্শন দিলেন। সংসার ত্যাগের অনুমতি সেদিন না মিলিলেও তাঁহার প্রেমস্পর্শ ও আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া সনাতনের তাপিত হৃদয় কতকটা শান্ত হইল।

সনাতন ও রূপের নিকট বিদায় নেওয়া হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য এবার বৃন্দাবনের দিকে রওনা হইবেন। তাঁহার নয়নাভিরাম রূপ, নর্ত্তন-কীর্ত্তন ও ভাবাবেশ এই কদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চলে আনিয়া দিয়াছে প্রাণচাঞ্চল্য। অগণিত নরনারী ভীড় করিয়াছে এই পুণ্য-দর্শন দেব-মানবের আশেপাশে। তাহাদের অনেকেই প্রভুর সঙ্গী হইতে ব্যগ্র।

সনাতন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী; ব্যাপার দেখিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপ্‌টা চলিতেছে। এ সময়ে এত লোক সঙ্গে নিয়া চলিলে প্রভুর বিপদ হইতে পারে।

করজোড় তিনি নিবেদন করেন, "প্রভু, বৃন্দাবনেই যদি যাবে, এত লোক কেন সঙ্গে নিচ্ছো? আজকাল রাজা বাদশাদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলছে চারদিকে। এসময়ে জনসঙ্ঘট্ট নিয়ে চলা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়া প্রভু, বৃন্দাবনে তো একান্তে কাঙাল বেশেই যেতে হয়।"

প্রবীণ রাজ-অমাত্য সনাতনের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। আবার ভক্তবৃন্দকে সঙ্গচ্যুত এবং নিরাশ করিতেও প্রভুর মন সায় দেয় না।

অগত্যা বৃন্দাবন-যাত্রা ত্যাগ করিয়া রওনা হইলেন শান্তিপুর অভিমুখে। সনাতন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

প্রভুর রামকেলীতে আগমন ও দর্শনদান যেন সনাতন ও রূপের নবজন্মের উন্মেষ! তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উভয়ের জীবনে আসিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের নূতন জোয়ার। এই জোয়ারের উচ্ছ্বাসে তাঁহারা এবার ভাসিয়া চলিলেন।

অনতিবিলম্বে রামকেলীর প্রাসাদে বিশিষ্ট একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব সাধককে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। সনাতন ও রূপ তাঁহার সাহায্যে ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন। রাজকর্ম্ম এখন তাঁহাদের কাছে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ। যত তাড়াতাড়ি ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

উভয় ভ্রাতার মধ্যে সেদিন গভীর রাত অবধি গোপন পরামর্শ চলে। সিদ্ধান্ত স্থির হয়, রূপ আগে গৃহত্যাগ করিবেন, আর সনাতন বহির্গত হইবেন কিছুদিন পরে।

সনাতনের উপর বাদশাহের বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি অকস্মাৎ এখনি পদত্যাগ করিলে সারা দেশে চাঞ্চল্য পড়িয়া যাইবে, রাজকার্য্যে দেখা দিবে নানা বিশৃঙ্খলা। কাজেই তাঁহার নিষ্ক্রমণ সঙ্গত নয়। রাজকীয় দায়িত্বের বোঝা কিছুটা হাল্কা করিয়া তবেই তিনি সুযোগমত একদিন সরিয়া পড়িবেন।

সনাতন ও রূপের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সজ্জনদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইঁহাদের এবং আত্মীয়স্বজনদের ভরণ-পোষণের মোটামুটি ব্যবস্থার জন্য রূপ তখনই তৎপর হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে একাজ সম্পন্ন হইয়া গেল এবং পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপ চিরতরে করিলেন গৃহত্যাগ।

যাওয়ার আগে তিনি বিশ্বস্ত এক মুদির কাছে দশ হাজার টাকা

গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। কথা রহিল, জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সনাতন এই অর্থ তাঁহার কাজে লাগাইবেন।

রূপের নিষ্ক্রমণের পর সনাতন আরো নিঃসঙ্গ হইয়া হইয়া পড়েন। বিষয়বিতৃষ্ণা চরমে উঠে। ক্রমে দরবারে যাতায়াতও বন্ধ হইয়া যায়। বাদশাহকে খবর পাঠান—তিনি অত্যন্ত পীড়িত, এখন হইতে স্বাভাবিকভাবে রাজসেবা সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না।

হুসেন শাহ বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন। রূপ ইতিমধ্যে কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া কোথায় উধাও হইয়াছেন। দবীর খাসও তেমনি কোন মতলব আঁটে নাই তো? রাজ্যের চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহের মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে, ঠিক এসময়ে তাঁহার মত একজন বিশ্বস্ত ও কুশলী অমাত্য কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে মহাবিপদের কথা।

রাজবৈদ্য প্রেরিত হইল সনাতনকে পরীক্ষা করার জন্য। বৈদ্য ফিরিয়া আসিলেন, মুচকি হাসিয়া জানাইলেন, "দবীর খাস শারীরিক বেশ সুস্থই আছেন, তাঁর জন্য জাহাঁপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।"

হুসেন শাহ তো চটিয়া আগুন। পরদিনই তিনি অতর্কিতে সনাতনের রামকেলী-প্রাসাদে স্বয়ং উপস্থিত হন। দেখেন, দবীর খাসের দেহে রোগের চিহ্নমাত্র নাই, সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত্র-বিদ্‌দের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে তিনি ধর্ম্মালোচনায় রত রহিয়াছেন।

বাদশাহ তাঁহাকে কার্য্যে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। অবশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু সনাতন তাঁহার সঙ্কল্পে অটল। গৌড়েশ্বরের বদলে পরমেশ্বরের আসন

স্থাপিত হইয়াছে তাঁহার জীবনে, কোন চাওয়া-পাওয়ার প্রয়োজনই যে আজ আর তাঁহার নাই।

দৃঢ়স্বরে স্পষ্ট ভাষায় তিনি হুসেন শাহকে কহিলেন, "জাহাঁপনা, সত্য কথা বলতে কি, দরবারের কাজে আমি যোগদান করবো না বলেই স্থির করেছি। এখন থেকে আমি কেবলমাত্র শ্রীভগবানের দাস, আর কারুর নই। আমার এ সঙ্কল্প অপরিবর্ত্তনীয়। আমায় আপনি মার্জ্জনা করুন।"

ক্রুদ্ধ হইয়া বাদশাহ তখনি সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে দেখা দিল এক জরুরী পরিস্থিতি। হুসেন শাহের সেনাপতি ইতিপূর্ব্বে উড়িষ্যার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার তিনি নিজেই সসৈন্যে রাজা প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে চাহেন। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এসময়ে সনাতনের মত তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ অমাত্যের সাহায্য যে তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য!

কারাগৃহ হইতে আনাইয়া বার বার সনাতনকে বুঝাইতে লাগিলেন, "দবীর খাস, এখনো তুমি তোমার পাগলামী ছাড়ো। আবার নিজের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এসে যোগ দাও। আমার অনুরোধ শোন, আমার সঙ্গে তুমি উড়িষ্যা অভিযানে চল।"

সনাতন চরম কথা শুনাইয়া দিলেন,—"আপনার অভিযানের দৃশ্য আমি মানসপটে চমৎকার দেখতে পাচ্ছি, জাহাঁপনা। আপনার সেনাবাহিনী সারা পথের দেবমন্দির ধ্বংস করবে, পবিত্র বিগ্রহ করবে কলুষিত। না—কোন মতে আমি আপনার এ পাপকার্য্যের সঙ্গী হতে পারবো না।"

অমাত্যকে তখনি আবার কারাগারে প্রেরণ করিয়া হুসেন শাহ প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সনাতনের এখন একমাত্র লক্ষ্য—কি করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করিবেন, মিলিত হইবেন প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে।

হঠাৎ সেদিন রূপের প্রেরিত এক পত্র গোপন পথে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তাহাতে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে—স্থানীয় মুদির কাছে যে টাকা গচ্ছিত আছে, তাহা হইতে, সনাতন যেন এই পত্র দেখাইয়া, সাত হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং উহা দ্বারা ক্রয় করেন নিজের মুক্তি।

প্রভুর সহিত মিলনের জন্য সনাতন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। তাই উপায়ান্তর অভাবে কারামুক্তির জন্য সেদিন রূপের প্রস্তাবিত পথই তাঁহাকে বাছিয়া নিতে হইল। রক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

শ্রীচৈতন্য এসময়ে বৃন্দাবনের পথে বারাণসীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। সনাতন আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া পশ্চিম ভারতের দিকে ধাবিত হইলেন। সঙ্গে চলিল বহু দিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান।

মুক্তির অমোঘ আহ্বান আসিয়া গিয়াছে সনাতনের জীবনে। এই মুক্তির জন্য চরমতম মূল্য দিতে তিনি আজ প্রস্তুত। ধন মান রাজসম্পদ সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করিয়া, নিষ্কিঞ্চন মুমুক্ষু সাধক ত্রস্তপদে ছুটিয়া চলিলেন।

বাদশাহের রক্ষীরা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারে, এ আশঙ্কা যথেষ্টই রহিয়াছে। তাই পথ চলিতে লাগিলেন দীন দরিদ্র দরবেশের ছদ্মবেশে।

পথ চলিতে চলিতে সেদিন এক ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার অধিকারে তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন। কোন পরিচয় নাই, কিন্তু সাক্ষাৎ মাত্রেই ভুঁইয়া তাঁহাদের মহাসমাদর শুরু করিয়া দিল, যেন সে কত দিনের বান্ধব।

এই আতিশয্য দেখিয়া সনাতন কিন্তু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই

শ্রেণীর ভুঁইয়াদের কুকীর্ত্তির কথা আগেই কিছু কিছু তাঁহার শোনা ছিল। ইহারা বিদেশী পর্য্যটকদের আশ্রয় দেয়, প্রচুর আদর-যত্ন করে, তারপর রাত্রিযোগে সুযোগমত যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া করে হত্যা। সনাতনের নিজের জন্য চিন্তা নাই। তিনি তো কপর্দ্দকহীন। কিন্তু ঈশান? সে তো অর্থাদি লুকাইয়া রাখে নাই?

চাপে পড়িয়া ঈশান স্বীকার করিল—সাতটি মোহর সে সংগোপনে নিজের কাছে রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে সনাতন বা তাহার নিজের কাজে এগুলি ব্যবহার করা হইবে, ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

সনাতন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কঠোর ভাষায় ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, বৈরাগ্যসাধন নিয়ে, আমি পথে বেরিয়েছি। আর তুমি আমার সেই সাধনার পথে সৃষ্টি করেছো এমনিতর বিঘ্ন! ছি—ছি!"

তখনি ভুঁইয়ার সমীপে গিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গীর কাছে সাতটি সঞ্চিত মোহর রয়েছে। এগুলো আপনি গ্রহণ করুন, আর আমাদের নিরাপদে পার করে দিন সামনের ঐ দুর্গম পাহাড়।"

সনাতনের সততায় ও সত্যভাষণে অর্থগৃধ্নু ভুঁইয়া খুব খুশী। তখনি সে নিজে সঙ্গে করিয়া অতিথিদ্বয়কে সেখানকার বিপজ্জনক অঞ্চল পার করিয়া দিল।

ভুঁইয়া প্রস্থান করিলে ঈশান কথা প্রসঙ্গে কহিল, "হুজুর, একটা কথা আপনার কাছে গোপন করে আমি আরো অপরাধী হয়েছি। আমার কাছে আসলে আটটি মোহর ছিল। ভুঁইয়াকে সাত মোহর দিয়ে দেবার পর আর একটি মোহর অবশিষ্ট রয়েছে। মিথ্যা বলার জন্য আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি।"

সনাতনের আনন মুহূর্ত্তে কঠোর হইয়া উঠে। দৃঢ়স্বরে কহেন, "ঈশান, আমার অনুসরণ করা তোমার ঠিক হবে না। এখনো অর্থের ওপর তোমার প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। অর্থের উপর নির্ভর করেই তুমি চলতে চাও। আর আমি নিয়েছি বৈরাগ্য সাধনের

কঠিন পথ; একান্তভাবে নির্ভর করতে চাই ভগবানের উপর। নিষ্কিঞ্চন হয়ে জীবন যাপন না করলে আমি আমার ব্রত থেকে চ্যুত হবো। তুমি এখনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও।"

মনিবকে প্রণাম করিয়া ঈশান সাশ্রুনয়নে রামকেলীতে প্রত্যাবর্তন করিল।

দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে সনাতন সেদিন শোনপুরে আসিয়া উপস্থিত। সেখানে তখন হরিহরছত্রের মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। হঠাৎ মেলাক্ষেত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে। সনাতনেরই কৃপায় শ্রীকান্ত রাজসরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ছত্রের মেলায় তিনি আসিয়াছেন বাদশাহের জন্য কয়েক লাখ টাকার ঘোড়া কিনিতে।

বহু অনুনয়-বিনয়েও শ্রীকান্ত সনাতনকে তাঁহার বৈরাগ্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শেষটায় ধরিয়া বসিলেন, "বেশ, যদি ঘর ছেড়ে যেতেই হয়, ভিখারীর বেশে যেতে দেবো না। অনুমতি দিন, আমি আপনাকে কিছু নূতন পরিচ্ছেদ কিনে দিই।"

সনাতন দৃঢ়স্বরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা শ্রীকান্ত ধরিয়া বসিলেন, "এখন তো প্রচণ্ড শীত পড়েছে পশ্চিমে একখণ্ড ভোটকম্বল আপনাকে নিতেই হবে, নতুবা পথে যে কষ্টের অবধি থাকবে না।"

ভগিনীপতির নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সনাতনকে ঐ কম্বলটি গ্রহণ করিতে হইল। সেটি কাঁধে ফেলিয়া আবার তিনি শুরু করিলেন পদযাত্রা। কয়েকদিন অবিরাম পথ চলার পর উপনীত হইলেন বারাণসীধামে।

বারাণসীতে পৌঁছিয়াই যে সুসংবাদটি সনাতন শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্য কিছুদিন

যাবৎ এখানেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নর্ত্তন-কীর্ত্তনে কাশীর ভক্তসমাজে এক প্রচণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

চন্দ্রশেখর মিশ্রের গৃহে প্রভু তখন অবস্থান করিতেছেন। দীনবেশে যুক্তকরে সনাতন মিশ্রের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া প্রভু ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। হঠাৎ চন্দ্রশেখর মিশ্রকে কহিলেন, "মিশ্র, আজ বড় শুভদিন। বাইরে গিয়ে ছাখো, তোমার দ্বারে সমাগত হয়েছেন এক মহাবৈষ্ণব। এখনি পরম সমাদরে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

ভক্তেরা ত্রস্তেব্যস্তে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু কই, কোন বৈষ্ণব মূর্ত্তি তো সেখানে নাই? দুয়ারে দণ্ডায়মান ছিন্নবাস পরিহিত এক দরবেশ। কণ্ঠিমালা, তিলক বা বৈরাগীর উত্তরীয় কোন কিছুই তাঁহার নাই। প্রভু অপর কাহারো কথা বলেন নাই তো!

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর চন্দ্রশেখর মিশ্র দরবেশ-বেশী সনাতনকে বাড়ীর ভিতরে নিয়া গেলেন।

প্রভুর দর্শন পাওয়া মাত্র সনাতনের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। প্রাণপ্রিয় ভক্তের আগমনে প্রভুরও আনন্দের আর অবধি নাই। ভাবাবেগে সারা দেহ কম্পিত হইতেছে, নয়নে বহিতেছে পুলকাশ্রু। ভূলুণ্ঠিত সনাতনকে সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া তখনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন।

দৈন্যভরে সনাতন সরিয়া দাঁড়ান। কাতর স্বরে কহেন, "প্রভু, আমি অতি নীচ, হীনাচারী, তোমার দেবদুর্লভ অঙ্গ দিয়ে আমায় এভাবে আর স্পর্শ ক'রো না।"

চিহ্নিত লীলা-পার্ষদ এতদিন পরে আজ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এ আনন্দ রাখার তাঁহার যে আর ঠাঁই নাই। প্রেমাবেগে বার বার সনাতনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।

অতঃপর প্রেমার্দ্রকণ্ঠে সকলের কাছে সনাতনের নিগূঢ় পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য সাধনের প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে।

মধ্যাহ্ন সমাগত। প্রভু কহিলেন, "সনাতন, বেলা অনেক হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্য ধারায় স্নান তর্পণ সমাপন করে এসো। তারপর ভিক্ষা গ্রহণ করো।"

মিশ্রগৃহ হইতে একখণ্ড পুরাতন বস্ত্র সনাতন চাহিয়া নিলেন। উহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া তৈরী করিলেন নিজের কৌপীন ও বহির্ব্বাস।

স্নানের ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিতেই এক মারাঠী ব্রাহ্মণ সনাতনকে তাঁহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাইলেন।

কিন্তু সনাতন তাহাতে সম্মত নন। কৃচ্ছ্রব্রত ও কাঙালের জীবনকেই যে তিনি পরম পথের প্রস্তুতি হিসাবে আজ প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। সারা জীবন কাটিয়াছে বাদশাহী দরবারের ভোগ-বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যের মাঝখানে। তাইতো বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতম অঙ্কুরটিকে নিঃশেষে দগ্ধ না করা অবধি তাঁহার স্বস্তি নাই। চরম বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া পৌঁছিবেন কৃষ্ণ অনুরাগের মহাসমুদ্রে, ইহাই যে তাঁহার অভীপ্সা।

যুক্তকরে সনাতন নিবেদন করিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হয়ে গৃহে গৃহে মাধুকরী করেই যেন আমি দিনাতিপাত করতে পারি।"

ভোট-কম্বলটি স্কন্ধে নিয়া, ভিক্ষার ঝুলি হস্তে সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবার বাহির হইবেন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিতে।

প্রভু তো মহা উল্লসিত, বার বার গদ্‌গদ কণ্ঠে সবাইকে কহিতে লাগিলেন, "ছাখো ছাখো, সনাতনের কি অপূর্ব্ব বৈরাগ্য সাধন।"

প্রভু আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘন ঘন চাহিতেছেন সনাতনের স্কন্ধস্থিত ভোট-কম্বলটির দিকে।

তাঁহার এই দৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে সনাতনের দেরী হইল না।

মুহূর্ত্তে নিজ সিদ্ধান্ত তিনি স্থির করিয়া ফেলেন, ছুটিয়া যান গঙ্গতীরে। দীন দরিদ্র এক বৃদ্ধ নিকটস্থ ঘাটে বসিয়া তাহার জীর্ণ কাঁথাটি রৌদ্রে শুষ্ক করিতেছে। সনাতন তাহারই শরণ নিলেন। মিনতি করিয়া কহিলেন, "ভাই, তুমি দয়া করে আমার একটা উপকার করো। আমার এই নূতন কম্বলটির বদলে তোমার ঐ ছেঁড়া কাঁথাখানি আমায় দাও। এজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবো তোমার কাছে।"

সংশয় ও সন্দেহে বৃদ্ধের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। নূতন ভোট-কম্বলের বদলে এই অব্যবহার্য্য কাঁথা? এ আবার কি অদ্ভুত প্রস্তাব? এই বৈরাগীর মনে কোন অভিসন্ধি নাই তো? না কি এ তাহার পরিহাস!

বহুক্ষণ নানাভাবে বুঝাইয়া সনাতন লোকটিকে রাজী করান। তারপর মহাপ্রসন্ন মনে জীর্ণ কাঁথা গায়ে জড়াইয়া ফিরিয়া আসেন প্রভুর সমীপে।

প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে অপার আনন্দের দীপ্তি। বিস্ময়ের ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "একি সনাতন! তোমার সেই ভোট-কম্বলটি কোথায় হারিয়ে এলে?"

কম্বল বর্জ্জনের কাহিনী শুনিয়া প্রভু আনন্দে ডগমগ। এই তো চাই। তাঁহার সনাতন যে লোকগুরু হওয়ার জন্য আবির্ভূত! যে ভক্তি সাম্রাজ্যের পত্তন প্রভু করিতেছেন তিনি যে তাহার অন্যতম নিয়ামক রূপে আগে হইতেই চিহ্নিত হইয়া আছেন। তাই তো লোকশিক্ষার জন্য সনাতনের জীবনে প্রকটিত হওয়া প্রয়োজন ত্যাগ বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।—

প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার।
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে বিষয় রোগ।

হুসেন শাহের প্রধান অমাত্যের এই সর্ব্বত্যাগী মহাবৈরাগীর

রূপটি শ্রীচৈতন্য সেদিন ইচ্ছা করিয়াই সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকটিত করিলেন। বৈষ্ণব সাধকসমাজের সম্মুখে রাখিয়া গেলেন কৃচ্ছ্র বরণ ও দৈন্যময়তার এক কালজয়ী আলেখ্য।

বারাণসীতে প্রভুর কাছে সনাতন এ সময়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রভু তাঁহার এই চিহ্নিত পার্ষদকে অনুপ্রাণিত করেন নিজ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবীয় সাধনায়। সাধ্য-সাধনার তত্ত্ব নিরূপণে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। সনাতন প্রকৃত জিজ্ঞাসু, মহাপ্রতিভাধর, সর্ব্বোপরি প্রভুর চরণে সমর্পিত-প্রাণ। পরমোৎসাহে একের পর এক তিনি প্রশ্ন করিয়া চলেন, আর প্রভু প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে উত্তর দিতে থাকেন। কিছুদিন আগে গোদাবরী-তীরে প্রভু ও রামানন্দের সংলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের নির্য্যাস—ব্রজরসতত্ত্ব। আর আজ বারাণসীর গঙ্গাতীরে প্রভু ও সনাতনের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া উদ্ঘাটিত হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার ক্রম ও নিগূঢ় তত্ত্ব। প্রভুর ব্যাখ্যাত এই তত্ত্বের সংবাহকরূপেই সনাতন উত্তরকালে ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

একে একে প্রভু বিবৃত করিলেন কৃষ্ণ-অবতার ও বৃন্দাবন-লীলার মর্ম্মকথা। প্রকাশ করিলেন যুগলভজনের অপূর্ব্ব পদ্ধতি। প্রথমে শ্রীমুখের বাণী শুনাইয়াই প্রভু সনাতনকে কৃতার্থ করিলেন। তারপর পরম কৃপাভরে তাঁহার মধ্যে করিলেন শক্তি-সঞ্চার। সনাতনের শিরে পদ্মহস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "সনাতন, আজ দেববাঞ্ছিত যে সব তত্ত্ব তুমি শ্রবণ করলে, আশীর্ব্বাদ করি, তা তোমার ভেতর স্ফুরিত হয়ে উঠুক।"

ইতিপূর্ব্বে রূপকেও প্রভু এমনি কৃপা করিয়াছেন। শক্তি সঞ্চার করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন বৃন্দাবনধামে। এবার সনাতনকে সেখানে প্রেরণ করিলেন বিরাট দায়িত্বের ভার দিয়া। নির্দ্দেশ দিলেন—

তুমিও করিহ ভক্তিরসের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করহ প্রচার॥

আরো কহিলেন, "সনাতন, এর পর থেকে আমার কান্থাকরঙ্গ-ধারী কাঙাল বৈষ্ণবেরা দলে দলে ব্রজমণ্ডলে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তুমি তাদের ওপর দৃষ্টি রেখো, রক্ষণাবেক্ষণ ক'রো।"

প্রভুর এই আদেশ সনাতন নিষ্ঠাভরে পালন করিয়াছিলেন। প্রভুর ব্যাখ্যাত তত্ত্বের ধারক ও বাহকরূপে উত্তরকালে ব্রজমণ্ডলেই তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যে সেখানকার বৈষ্ণবসমাজের মুখপাত্ররূপে চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই প্রবীণ ভক্ত সুবুদ্ধি রায়, লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ পণ্ডিতের সহিত সনাতন সাক্ষাৎ করিলেন। দৈন্যভরে তাঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ করার পর আশ্রয় নিলেন যমুনা-পুলিনের আদিত্যটিলায়।

স্থানটি ঘন অরণ্যময়। এখানকার নির্জ্জন সুগম্ভীর পরিবেশ ধ্যানভজনের বড় অনুকূল। নির্ব্বিণ্ণ সাধক সনাতনের এ জায়গাটি বড় ভাল লাগিল। এখানে বসিয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি সাধনভজন শুরু করিয়া দিলেন।

সনাতনের এই সময়কার ত্যাগ-বৈরাগ্যময়, ভজননিষ্ঠ জীবনের চিত্র 'ভক্ত পদাবলী' হইতে পাওয়া যায়—

কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস।

কখনও বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস।

মাঝে মাঝে ভজনতন্ময় সাধকের স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরিয়া আসে, ঝুলি কাঁধে পদব্রজে মথুরায় চলিয়া যান। যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা সেখানে মিলে, তাহাতেই হয় উদরপূর্ত্তি।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভুর নির্দ্দেশ মত সনাতন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে ব্রতী হন। আগে হইতেই লোকনাথ গোস্বামী এ কাজ কিছুটা শুরু করিয়াছেন। সনাতন তাঁহার সহিত নিজের প্রচেষ্টা যুক্ত করিলেন। যে সব প্রাচীন গ্রন্থে ব্রজমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে সেগুলি ঢুঁড়িয়া লুপ্ত তীর্থের সন্ধান বাহির করা এখন হইতে হয় তাঁহার এক বড় কাজ। এই উদ্দেশ্য নিয়া দিনের পর দিন তিনি অরণ্যে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ান। শাস্ত্র, মহাজন বাক্য ও লোকগাথার ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণের এক একটি লীলাতীর্থ উদ্ধার করেন, আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্থানীয় জনগণকে নিয়া মত্ত হন কীর্ত্তনানন্দে।

বৎসরখানেক বৃন্দাবনে অতিবাহিত করার পর প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য সনাতনের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাছাড়া, প্রভু তাঁহাকে একবার নীলাচলে ঘুরিয়া আসিতেও বলিয়াছিলেন। তাই হঠাৎ একদিন ঝুলি কাঁধে নিয়া উড়িষ্যার পথে ধাবিত হইলেন।

ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া সনাতন দিন রাত পথ চলিতেছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দেহে তাঁহার বিষাক্ত কণ্ডু রোগের আক্রমণ ঘটিয়াছে। নির্ব্বিণ্ণ সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিতে থাকেন, এই দুষ্ট রোগের দুর্ভোগ যে তাঁহার প্রাপ্য। দবীর খাস জীবনে ম্লেচ্ছ সুলতানের অধীনে থাকিয়া যে সব অন্যায়-অনাচার করিয়াছেন, এ যে তাহারই অনিবার্য্য পরিণতি। সঙ্গে সঙ্গে নিজ সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন, ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত এই দেহভার আর শুধু শুধু বহন করিয়া বেড়াইবেন না। পুরীধামে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথ ও প্রভু

শ্রীচৈতন্যের চন্দ্রবদন দর্শন করিবেন, তারপর রথচক্রতলে করিবেন প্রাণ বিসর্জ্জন।

ধামে পৌঁছিয়াই সনাতন উপস্থিত হইলেন হরিদাসের ভজন কুটিরে। হরিদাস নিজেকে মনে করেন যবন, পতিত, দীনাতিদীন। তাই শ্রীজগন্নাথের সেবক ও চৈতন্য-প্রভুর ভক্তদের স্পর্শ এড়াইয়া নগরের এক প্রান্তে নিজের পর্ণকুটির রচনা করিয়াছেন। সনাতনের মনেও এমনি দৈন্যভাব; নিজেকে মনে করেন আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র। তাই হরিদাসের কুটিরই যে তাঁহার আশ্রয়স্থল। জপসিদ্ধ হরিদাস আর ত্যাগনিষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ সাধক সনাতন, এই দুয়ের মিলনে বিজন টোটা মধ্যস্থ কুটির সরগরম হইয়া উঠে।

প্রভুর নিত্যকার এক কাজ ছিল পরম ভক্ত হরিদাসকে দর্শন দান। জগন্নাথের উপল ভোগের পর তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সহ এই কুটিরে উপস্থিত হইতেন, দীর্ঘ সময় কাটাইয়া গৃহে ফিরিতেন।

সেদিন প্রভু টোটায় পদার্পণ করা মাত্র সনাতন দৈন্যভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বাহু প্রসারিয়া প্রভু যতই আলিঙ্গন করিতে যান, সনাতন ততই পিছু হটেন। কাতর স্বরে বলেন, "প্রভু কৃপা করো, আমার মিনতি রাখ। এমন ক'রে তোমার দেবদুর্লভ দেহ দিয়ে আমায় স্পর্শ ক'রো না! আমি অতি হীন, ভ্রষ্টাচারী। তদুপরি সারা অঙ্গে রয়েছে কণ্ডুর ঘৃণ্য ক্লেদ। দোহাই তোমার, এই ক্লেদ তোমার গায়ে মেখে আমায় আর পাপের ভাগী ক'রো না।"

কিন্তু প্রভুকে রোধ করিবে এমন সাধ্য কার? আনন্দের আবেশে বার বার প্রিয় পার্ষদকে বুকে জড়াইয়া ধরেন, কণ্ডুরস তাঁহার সারা শরীরে লিপ্ত হয়। আর সনাতন কেবলি জ্বলিতে থাকেন অনুতাপের তীব্র দহনে।

সনাতনের আত্মগ্লানি কেবলি বাড়িতে থাকে। ভাবেন—কৃষ্ণ তাঁহাকে একি বিপদে ফেলিলেন! রোজই প্রভু তাঁহাকে এমনি ভাবে প্রেমালিঙ্গন দিবেন, আর তাঁহার দেহ হইবে অপবিত্র। এযে নিতান্ত অসহ্য। বরং এ পাপ-দেহ তাড়াতাড়ি বিসর্জ্জন দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সেদিন ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্য হরিদাসের ভজনকুটির আলো করিয়া বসিয়াছেন, ভাবাবেশে ও দিব্য আনন্দে তিনি উদ্দীপিত। শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণকথার অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

হঠাৎ প্রভু সনাতনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "সনাতন, একটা কথা মনে রেখো, দেহত্যাগ করলেই কিন্তু কৃষ্ণ মিলে না; কৃষ্ণ মিলে কৃষ্ণভজনে। ওসব অশুভ সঙ্কল্প ছেড়ে দাও, ডুব দাও লীলা-ময়ের লীলারসের মহাপাথারে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, অচিরে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, পাবে পরমপ্রভুর দর্শন।"

প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম্ম সনাতন বুঝিলেন। অন্তর্য্যামীর কাছে সনাতনের আত্মহত্যার গোপন ইচ্ছাটি অজানা থাকে নাই।

প্রেমাবেগে সনাতন তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভু, আমি পতিত, তায় মহাপাতকী। তবে এ দেহ জিইয়ে রেখে কি লাভ, বলো? শ্রীজগন্নাথের রথচক্রতলে আমি নিজেকে নিক্ষেপ করবো, আমায় তুমি অনুমতি দাও।"

উত্তরে কৃপাময় প্রভু যে কথা কহিলেন, তাহার মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত সনাতনের মূল্যায়ন প্রকট হইয়া উঠে:

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে।
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন। (চৈঃ চঃ)

চিহ্নিত পার্ষদ সনাতনকে দিয়া কি ঐশী কর্ম্ম প্রভু করাইবেন তাহার আভাষ ইতিমধ্যেই কিছুটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তন, লীলাতীর্থ উদ্ধার, বৈরাগ্যময় আদর্শের প্রচার—এগুলি তাঁহার সঙ্কল্পে রহিয়াছে। একাজে সনাতন তাঁহার অন্যতম প্রধান সহায়। নিজে প্রভু মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছেন, তাই এস্থান ত্যাগ করার ইচ্ছা তাঁহার নাই। এদিকে প্রাণপ্রিয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাধাম বৃন্দাবনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে সতত নিবদ্ধ। সেখানকার নব উজ্জীবিত ভক্তিধর্ম্ম আন্দোলনের পুরোভাগে প্রিয় পরিকর সনাতনকেই যে তিনি স্থাপন করিতে চান। সনাতনের মাধ্যমেই যে তাঁহার নিজ প্রয়োজন অনেকাংশে সিদ্ধ করিবেন।

ভর্ৎসনার পর সনাতন শির নত করিয়া রহিলেন। সত্যিই তো, প্রভুর চরণে যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার উপর যে তাঁহার সত্যকার কোন অধিকার নাই। তবে সে জীবন এখন নিজ ইচ্ছায় কি করিয়া বিসর্জ্জন দিবেন?

প্রভুর বাণী শুনিয়া হরিদাসের আনন্দ আর ধরে না। প্রেমভরে সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "সনাতন, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। স্বয়ং প্রভু তোমার দেহকে নিজ ধন বলে দাবী করছেন। শুধু তাই নয়, নিজ দেহ দিয়ে যে কাজ সম্ভব নয়, তা করাতে মনস্থ করছেন তোমায় দিয়ে। ভাই, তুমি সত্যিই ধন্য। আমরা নিতান্ত অধম, তাই প্রভুর কোন কাজে লাগতে পারলুম না।"

"এ কি অদ্ভুত কথা তুমি বলছো, শ্রীপাদ?"—সনাতন যুক্তকরে উত্তর দেন। "প্রভুর এই মণ্ডলীতে তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে? প্রভুর আবির্ভাব নামধর্ম্ম প্রচারের জন্য। এ কাজে তুমিই যে সবার অগ্রগণ্য! প্রভুর ভক্তদের সবাই সাধনভজন করছে নিজ নিজ কল্যাণের জন্যে। কিন্তু তুমি হচ্ছো ব্যতিক্রম। নিজের উদ্ধারের জন্য ব্যগ্র না হয়ে, অবিরাম উচ্চ কণ্ঠে জপ ও কীর্ত্তন করে

তুমি জীবের উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়েছো বেশী। তোমার প্রেমের তুলনা কোথায়, শ্রীপাদ ?"

সনাতন ও হরিদাসের এমনিতর প্রণয়-দ্বন্দ্বে ভজনকুটির মুখর হইয়া উঠিতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত দেশ হইতে নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেদিন তিনি সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করার পর সনাতন কহিলেন, "পণ্ডিত, আপনি প্রভুর একান্ত আপনার জন। আপনি আমায় সদুপদেশ দিন। প্রভু রোজ আমায় আলিঙ্গন করেন, আর তাঁর কনককান্তি দেহে লিপ্ত হয় আমার বীভৎস কণ্ডু-রোগের রস। এ এক মহা অপরাধে আমি অপরাধী হয়ে পড়েছি। প্রভুকে নিরস্ত করা অসম্ভব। তাই ভেবেছিলাম, আত্মহত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করবো, তাও হলো না। অন্তর্য্যামী প্রভু আগে থেকে সব বুঝতে পেরে তাতে বাদ সাধলেন। এখন আমি কি করি, বলুন তো !"

জগদানন্দ স্বভাবতঃই প্রভু-অন্ত প্রাণ। প্রভুর শরীরে বিষাক্ত রোগের স্পর্শ নিত্য লাগিতেছে শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "সনাতন, তুমি এক কাজ করো। বৃন্দাবনধাম থেকে তুমি ছুটে এসেছো প্রভুর দর্শনের জন্য, সেই আসল কাজটি তো ভাই সাঙ্গ হয়েছে। তবে আর এখানে থেকে রোজ বিপদ ডেকে আনছো কেন ? সামনেই রথযাত্রা উৎসব—তারপরেই তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলে যাও। তোমাকে আর রূপ গোস্বামীকে প্রভু বৃন্দাবনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন কত দুরূহ কাজের ভার। তোমার কি ভাই বৃন্দাবন ছেড়ে অন্যত্র বাস করা সাজে ? বৃন্দাবন যে তোমার স্বস্থান। কাল-বিলম্ব না করে সেই স্বস্থানেই তো তোমার চলে যাওয়া উচিত।"

পণ্ডিতের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সনাতন তাহাতে সায় দিলেন।

পরদিন হরিদাস ও সনাতনকে প্রভু দর্শন দিতে আসিয়াছেন। অভ্যাসমত সেদিনও তিনি সনাতনকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তীব্র অনুশোচনার দহন শুরু হইল সনাতনের মনে। করজোড়ে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, রোজ রোজ এই পাপীর দেহ তুমি স্পর্শ করো, বিষাক্ত কণ্ডুর ছোঁয়া তোমার পবিত্র দেহে লাগে। আর আমি জ্বলে পুড়ে মরি। প্রভু, এবার আমি স্থির করেছি, নীলাচলে আর থাকবো না, রথযাত্রার পরেই বৃন্দাবনে চলে যাবো। তাছাড়া, এইতো কাল পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনিও আমায় উপদেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবার জন্য।"

প্রভু রোষে গর্জ্জিয়া উঠেন। হুঙ্কার দিয়া কহেন, "কি বল্‌লে তুমি সনাতন! সেদিনকার জগা, সে আসে তোমায় উপদেশ দিতে! এত বড় তার স্পর্দ্ধা। সে কি জানে না—বুদ্ধিতে, শাস্ত্রজ্ঞানে, ভজন-সাধনে তুমি তার গুরু হবার যোগ্য? আমাকেও তুমি শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব শেখানোর শক্তি ধরো। তাছাড়া, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রবীণ সুহৃদ। বালকবুদ্ধি জগা তোমায় উপদেশ দিতে আসে, এ ধৃষ্টতা তার কি করে হলো?"

প্রভুর ক্রোধোদ্দীপ্ত মূর্ত্তির দিকে সনাতন নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা।

ক্ষণপরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আজ আমার পরম সৌভাগ্য—তোমার এই প্রেমমনোহর রূপটি আমার সামনে এমনি করে উদ্‌ঘাটিত হলো। আরো বুঝলাম, ভক্তপ্রবর জগদানন্দের মত ভাগ্যবান খুব কমই রয়েছেন। তাঁকে তুমি যে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলে, তা করলে আত্মজন জ্ঞানে। তোমার সহজ আত্মীয়তার সে অধিকারী। একি সহজ কথা, প্রভু? আসলে দেখছি, প্রকৃত অন্তরঙ্গ জগদানন্দের জন্য তুমি রেখেছ একাত্মকতার মধু। আর দূর ব্যবধান থেকে আমাদের পান করাচ্ছো গৌরবস্তুতির নিম্ব নিশিন্দা রস।"

সনাতনের এই কথায় প্রভু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তারপর প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "সনাতন, আসল কথাটি শোন। তোমার চাইতে জগদানন্দ আমার প্রিয় নয়। আর জেনে রেখো, কারুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি কখনো সহ্য করতে পারিনে। তোমায় উপদেশ দিতে এসে জগদানন্দ তোমার মত ব্যক্তির মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করেছে। এই জন্যই আমি তাকে ভৎর্সনা করেছি। আর বহিরঙ্গ জ্ঞানে আমি তোমার প্রশংসা করেছি, তা মনে ক'রো না। তোমার নিজস্ব গুণই প্রশংসা উৎসারিত করে।"

ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া প্রভু আরো কহিলেন, "তোমরা জানো, আমি সর্ব্বত্যাগী সর্ব্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী—চন্দন ও পঙ্কে আমার সমজ্ঞান রাখাই তো উচিত। তবে সনাতনের কণ্ডুরস আমার গায়ে লাগায় তোমরা এত চঞ্চল হচ্ছো কেন, বল তো?"

প্রবীণ ভক্ত হরিদাস এবার নিবেদন করিলেন, "প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তোমার লীলার মর্ম্ম আমরা কি বুঝবো? বৈষ্ণবাপরাধ করে বাসুদেব ঠাকুর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তুমি তার প্রতি কৃপা করতে কার্পণ্য করো নি। তোমার প্রসাদে তার দুরারোগ্য কুষ্ঠ হয়েছিল নিরাময়। অথচ আজ দেখতে পাচ্ছি, তোমাতে সমর্পিতপ্রাণ পরমভাগবত সনাতনের বিষাক্ত কণ্ডু কিছুতেই দূর হচ্ছে না। এর রহস্য শুধু তুমিই জানো, প্রভু।"

মুচকি হাসিয়া প্রভু উত্তর দিলেন, "হরিদাস, সনাতন আমায় সমর্পণ করেছে তার দেহ মন প্রাণ। আর আমি আমার সব সমর্পণ করে বসে আছি আমার প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের কাছে। সনাতনকে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।"

ভক্তেরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই সনাতনের দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল অপূর্ব্ব লাবণ্যশ্রী।

ক্রমে রথযাত্রা আসিয়া যায়। গৌড়ীয়া ভক্তগণ এ সময়ে সদলবলে নীলাচলে সমবেত হন, প্রাণপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের আনন্দরঙ্গ উচ্ছল হইয়া উঠে। এই সব প্রেমিক, প্রভুগতপ্রাণ ভক্তদের সাথে একে একে সনাতন পরিচিত হন, নিজেকে গণ্য করেন মহাভাগ্যবান।

এ সময়কার আর এক বড় আকর্ষণ—শ্রীজগন্নাথের রথের অগ্রভাগে ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের নর্ত্তন। এবার এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সনাতন আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান।

চাতুর্ম্মাস্য শেষ হইলে গৌড়ীয়া ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলেন। প্রভু কিন্তু সনাতনকে ছাড়িবেন না। তাই দোলযাত্রা অবধি সনাতনকে নীলাচলে অবস্থান করিতে হইল।

বারাণসীতে থাকা কালে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনার যে শিক্ষা প্রভু সনাতনকে দিয়াছিলেন, এবার সমাপ্ত হয় তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়। তাছাড়া, বৃন্দাবনে প্রভু এক নূতন ভক্তিসাম্রাজ্য গঠন করিতে চান এবং তাহার ভিত্তি নির্ম্মাণ ও সংগঠনের ভার দিয়াছেন প্রিয় পার্ষদ সনাতনেরই উপর। বিশেষ করিয়া এই দুইটি কারণে মাসের পর মাস সনাতনকে প্রভু ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখেন, দান করেন বহুতর গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশ।

দোলযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার সাশ্রু-নয়নে প্রভুর চরণে বিদায় নিয়া সনাতন নীলাচল ত্যাগ করিলেন।

বৃন্দাবনের আদিত্য টিলার পর্ণকুটিরে বসিয়া আবার শুরু হইল তাঁহার ভজন কীর্ত্তন ও প্রভুর নির্দ্দেশিত কর্ম্মসাধন।

স্থানটি ইষ্ট-ধ্যানের পক্ষে বড় অনুকূল। উপরে দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশ। নীচে কল্লোলিনী যমুনা বহিয়া চলিয়াছে অপরূপ লীলাভঙ্গিমায়। দূরে বনানী বেষ্টিত পাহাড়ের শ্রেণীতে জড়ানো নীল সবুজের মাধুরিমা। সমগ্র পরিবেশে যেন ওতপ্রোত হইয়া আছেন প্রাণপ্রিয় ইষ্টবিগ্রহ—শ্যামসুন্দর। পরমানন্দে দিনের

পর দিন এই নির্জ্জন রমণীয় অরণ্যাবাসে সনাতনের তপস্যা অগ্রসর হইয়া চলে।

বৃন্দাবনের আশেপাশে তখন জনমানবের বসতি খুব কম ছিল, তাই ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে হইলে সাধুদের যাইতে হইত মথুরা অঞ্চলে। সনাতনকেও মাঝে মাঝে তাহাই করিতে হইত। হঠাৎ একদিন এই ভিক্ষার মধ্য দিয়া উন্মোচিত হইল তাঁহার সাধনজীবনের এক নূতন বাতায়ন। ইষ্টদেব প্রকটিত করিলেন তাঁহার এক নূতনতর সেবালীলা।

মাধুকরী করিতে গিয়া সনাতন সেদিন মথুরার দামোদর চৌবের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। অঙ্গনে পা দিতেই চোখে পড়িল নয়নাভিরাম বিগ্রহ, নাম শ্রীশ্রীমদনগোপাল। দর্শন মাত্রেই সনাতন কি জানি কেন এক অপূর্ব্ব প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া গেলেন। এই শ্রীমূর্ত্তি যেন তাঁহার কত আপনার, কত পরিচিত। কত জন্মের সাধনার ধন আজ যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ভাবাবিষ্ট সাধকের অন্তরে জাগিয়া উঠে প্রবল আর্ত্তি, আর জাগে এই শ্রীবিগ্রহ সেবার জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অতি কষ্টে তাঁহাকে আত্মসম্বরণ করিতে হয়। নিজে তিনি কান্থাকরঙ্গধারী কাঙ্গাল বৈষ্ণব, শ্রীমূর্ত্তির সেবার সামর্থ্য তাঁহার কই? তাছাড়া, চৌবে পরিবার তো প্রাণ গেলেও এই ইষ্ট-বিগ্রহ ত্যাগ করিবে না। ভিক্ষা গ্রহণের শেষে, লোভাতুর নয়নে বার বার ঐ শ্রীমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

আদিত্য টিলার বিজন আবাসে সনাতন ফিরিয়া আসেন, দৈনন্দিন ধ্যানভজনে হন নিবিষ্ট। কিন্তু একি বিপদে আজ তিনি পড়িলেন? যখনি নয়ন মুদিয়া ভজন-আসনে উপবেশন করেন, কোথা হইতে সেই মদনগোপাল মূর্ত্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠে, প্রাণ মন কাড়িয়া নিয়া আবার কোথায় মিলাইয়া যায়। সনাতনের মনে আর স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। মাঝে মাঝেই কাজে বা অকাজে

মথুরায় ছুটিয়া যান, চৌবেজীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া থাকেন ঐ নয়নমনবিমোহন ঠাকুরের দিকে।

ক্রমে চৌবে পরিবারের সঙ্গে সনাতনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। চৌবেজীর বিধবা পত্নীর সেবার ভাবটি বড় সহজ সুন্দর। এই শ্রীবিগ্রহ তাঁহার আদরের বালগোপাল—নিজের বালক জ্ঞানেই দিনরাত তিনি ইঁহার সেবা পরিচর্য্যা করেন। চৌবে গৃহিণীর পুত্রের নাম সদন। এই সদন যেমন তাঁহার এক পুত্র, মদনগোপালজীও তেমনি আর একটি। প্রাণপ্রিয় দুই পুত্রের লালনপালন তিনি সম্পন্ন করেন এক ভাবে, একই সহজ সরল মাতৃভাবের মধ্য দিয়া।

নিষ্ঠাবান ভক্ত সনাতনের মন কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে থাকে। ইষ্ট-বিগ্রহের সেবা পরিচর্য্যা চলিবে গৃহেরই একটি বালকের সমপর্য্যায়ে? প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠা থাকিবে না, ইষ্টের সেবা ও পূজার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে না, এ কেমন কথা?

সেদিন চৌবের গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, তুমি পরম স্নেহে মদনগোপালজীর সেবা যত্ন করে যাচ্ছো, তা ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয়, এতে একটু ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে। তুমি মাতৃভাবে, যশোদাভাবে, প্রভুজীকে লালন করছো। কিন্তু মা-যশোদার বাৎসল্য রস তো সাধারণ জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার মনে হয়, তুমি প্রভুজীর সেবা সম্পন্ন করো সত্যকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে। যে প্রণালীতে ভক্ত বৈষ্ণবেরা ভগবানকে সেবা পূজা করে, সেই প্রণালী তুমি অনুসরণ করো।"

মহিলা সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "তাই তো, বাবাজী। তুমি যে আমায় নূতন করে ভাবিয়ে তুললে। বেশ, তাই হবে, তোমার উপদেশ মত এবার থেকে ঠাকুরের জন্য বিধিমত সেবা-অর্চ্চনার ব্যবস্থাই করবো।"

ইতিমধ্যে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মদনগোপালজীর দর্শনের জন্য সনাতন সেদিন মথুরায় গিয়াছেন, অঙ্গনে পদার্পণ

করামাত্রই চৌবে পত্নী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "নাঃ বাবাজী, তোমার কথামত কাজ আর করা গেল না। মদনগোপালজী বড় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেদিন আমায় স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন,—'ওগো, তুমি আমার মা হয়ে ছিলে, সেই তো ছিল ভালো। এখন ঠাকুর জ্ঞানে আমায় দূরে সরিয়ে রাখছো, পূজো অর্চ্চনার ভীড় লাগিয়েছো। এ আমার ভালো লাগছে না, বাপু। তোমার দুই ছেলে, সদন আর মদনের ভেতর তফাৎ রাখা কি ভালো?"

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো। সহজাত প্রেম ও প্রাণের স্বাভাবিক টান—ইহাই যে ঠাকুরের সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার! চৌবে গৃহিণীর স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে এই মূলতত্ত্বটিই যে মদনগোপাল আজ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। প্রভুজীর এই কৃপা নির্দ্দেশের কথা স্মরণ করিয়া বার বার সনাতনের নয়ন দুটি অশ্রু সজল হইয়া উঠিতে থাকে।

মদনগোপালজীর আকর্ষণ কিন্তু সনাতনের জীবনে দিন দিনই হইয়া উঠে দুর্নিবার। দৈন্যময় সাধকের অন্তরের অন্তস্তল হইতে নিয়ত উদ্গত হয় কাতর প্রার্থনা—"হে প্রভু, হে দয়াল, তোমার বিরহ যে আর আমি সহ্য করতে পারছিনে। তুমি এসো—এসো, এই দীনহীন কাঙ্গালের কোলে এসো। এই দুর্ভাগার জীবনে যে তীব্র দহন শুরু হয়েছে, তোমায় না পেলে তার নিবৃত্তি আর হবে না।"

অচিরে এই প্রার্থনা ও আর্ত্তির ফল ফলিয়া যায়। দামোদর পত্নী সেদিন ম্লানমুখে সনাতনের কাছে আসিয়া দাঁড়ান। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহেন, "বাবাজী, আজ থেকে তুমিই নাও আমার মদনগোপালের সেবার ভার। গোপাল এখন বড় হয়েছে, মায়ের আঁচলের তলে আর বসে থাকতে চাইবে কেন? তোমার ঝুপড়িতে যাবে বলে বায়না ধরেছে, কাল রাতে স্বপ্নে এ কথা বার বার আমায় জানালে। তাছাড়া, আমাদের সাংসারিক অবস্থাও ক্রমে অসচ্ছল হয়ে পড়ছে।

ঠাকুরকে পাছে কষ্ট দিতে হয়, এই দুশ্চিন্তায়ই আমি মরছি। বাবাজী আজই এ বিগ্রহ তুমি নিয়ে যাও।”

সনাতনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এভাবে পূর্ণ হইল। পরম আনন্দে শ্রীবিগ্রহ কোলে করিয়া তখনি ছুটিয়া চলিলেন বৃন্দাবনের ভজনকুটির অভিমুখে। সেখানে সযতনে স্থাপন করিলেন তাঁহার প্রাণপ্রিয় এই কৃষ্ণমূর্ত্তি।

চৌবেজীর ঘর হইতে যে মদনগোপাল বিগ্রহ সনাতন লাভ করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ ঐতিহ্য রহিয়াছে। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্রনাভ এক সময়ে সারা ব্রজমণ্ডলে অনুসন্ধান চালাইয়া যে আটটি প্রাচীন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, মদনগোপাল শ্রীমূর্ত্তি তাঁহাদেরই অন্যতম।

প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ তো হস্তগত হইল। কিন্তু এখন ইঁহার সেবা পরিচর্য্যার কি উপায়? সনাতন মহাসমস্যায় পড়িলেন। ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে ভজনকুটিরের নিকটে এক ঝুপড়ি বাঁধিলেন, পরম যত্নে ঠাকুরকে সেখানে করিলেন সংস্থাপিত। সেবার জন্য নূতন উৎসাহে শুরু হইল মাধুকরী। ভিক্ষাস্বরূপ সামান্য যাহা কিছু আটা মিলিত তাহাই পিণ্ডাকৃতি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া নিতেন। তারপর প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে দীন ভক্ত রোজ ইহা নিবেদন করিতেন প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের সম্মুখে। অগ্নিদগ্ধ এই আটার পিণ্ডই ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতিলাভ করে সনাতন গোসাঁইর আঙাকড়ি-ভোগ নামে। উত্তরকালে বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা মদনগোপালজীর সেবায় প্রচুর অর্থদান করিতে আগাইয়া আসেন। তখনকার সে বিপুল আয়োজন, ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের দিনেও কাঙ্গাল সনাতনের দগ্ধ আটাপিণ্ড ছিল শ্রীবিগ্রহের নিত্যকার ভোগের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

আঙাকড়ি ছাড়া আর একটি বস্তুও সনাতনকে নিবেদন করিতে

দেখা যাইত। টিলার সানুদেশে ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল নানা ধরণের বুনো শাক ; রোজ তিনি এগুলি তুলিয়া আনিতেন। সৈন্ধব প্রায়ই জুটিত না, দীনহীন বৈষ্ণব অধিকাংশ দিনই অলবণে রান্না-করা ঐ শাক দ্বারা ভোগ চড়াইতেন।

এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহ একদিন বড় গোল বাধাইয়া বসেন। স্বপ্নে সনাতনকে দর্শন দিয়া কহেন, "ওগো, তোমার দেওয়া এই ভোগ আর গলাধঃকরণ করা যাচ্ছে না। তোমার আঙাকড়ি আর সৈন্ধব-মসলাহীন রান্না খেয়ে আর কতকাল চালাবো, বল ?"

সনাতনের নয়ন ছুটি অশ্রু ছলছল হইয়া উঠে। কাতরস্বরে নিবেদন করেন, "প্রভু, তুমি তো জানো, আমি তোমার এক নিষ্কিঞ্চন অধম সেবক। তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিরাজ, তোমার উপযুক্ত রাজভোগ আমি কি ক'রে যোগাবো ? দগ্ধ আটা আর এই শাক-সেদ্ধ খেতে রুচি না হয়, তুমি নিজেই নিজের সেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে নাও।"

বড় জটিল, বড় ছুর্জ্ঞেয় প্রভুর লীলাখেলা। চৌবে গৃহিণীর এত দিনের বাৎসল্য ও সমাদর ছাড়িয়া স্থান নিয়াছেন এই সহায় সম্পদ-হীন কাঙ্গাল সাধুর ঘরে। আবার এখানে আসিয়া বায়না ধরিয়াছেন রুচিকর আহার্য্যের জন্য। কিন্তু ডোর-কৌপীন মাত্র সম্বল সনাতন এ ব্যাপারে কি করিতে পারেন ? তিনি যে একেবারে নিরুপায়।

দিনের পর দিন সনাতন চিন্তা করেন স্বপ্নে প্রভু মদনগোপালজীর দর্শনদানের কথা। অন্তর তাঁহার তীব্র ব্যথায় মুহ্যমান হয়, কপোল বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

নিরন্তর আকুতি ও অশ্রুর অর্ঘ্য এবার অন্তর্য্যামীর অন্তর স্পর্শ করে। ভক্তাধীন ভগবান অল্প কয়েক দিনের ভিতরই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামদাস কাপুর সেদিন রাত্রে নৌকা

করিয়া বৃন্দাবনের পাশ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে একরাশ মূল্যবান মালপত্র, দূর শহরে গিয়া এগুলি বিক্রী করিবেন। হঠাৎ আদিত্য টিলার নীচে সূর্য্যঘাটের কাছে আসিয়া নৌকাটি এক বৃহৎ চড়ায় আটকাইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে কাৎ হইয়া পড়ে। মাঝি-মাল্লারা বহুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর হার মানিতে বাধ্য হয়, মালভর্ত্তি ভারী নৌকা কোনমতেই নড়ানো সম্ভব হয় না।

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রি। বৃন্দাবনের অরণ্যে ও টিলায় টিলায় ঘন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নিকটে কোথাও জনবসতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। রামদাস কাপুর প্রমাদ গণিলেন। কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ করিতে পারিলে নৌকাটি চড়া হইতে টানিয়া বাহির করা যাইত। কিন্তু সে আশা দুরাশা। এই নিশুতি রাত্রে, জনমানবহীন যমুনার তীরে কে আর তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিবে?

ক্রমে রামদাসের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া চলে। নৌকা এরূপ কাৎ হইয়া থাকিলে অবশ্যই ডুবিবে এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব বিলীন হইবে জলগর্ভে। তাছাড়া, না ডুবিলেও বিপদের আশঙ্কা কিছু কম নয়। তীরস্থিত এই বিজন অরণ্যে দস্যুদের আনাগোনা আছে। কখন তাহারা হা-রে-রে করিয়া নৌকায় চড়াও হয়, মালপত্র, টাকাকড়ি লুটপাট করিয়া নেয়, কে জানে?

নিরুপায় হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন। হঠাৎ চোখে পড়িল, অদূরস্থিত টিলায় এক মৃদু দীপশিখা। সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো জ্বলিয়া উঠে রামদাসের অন্তরে। একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাক না কেন? হয়তো টিলার উপরে কোন বসতি রহিয়াছে। ওখানকার কাহাকেও দিয়া কি আশপাশ হইতে লোকজন সংগ্রহ করা যায় না?

সাঁতরাইয়া তখনি তীরে উঠিলেন, আলো লক্ষ্য করিয়া ত্রস্তপদে আরোহণ করিলেন টিলার শীর্ষদেশে।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নপথে পতিত হইল এক পর্ণকুটির। ভিতরে প্রদীপের ক্ষীণ আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর এক পাশে স্থাপিত রহিয়াছেন নয়নাভিরাম কৃষ্ণবিগ্রহ। সম্মুখে এক দেবপ্রতিম বৈষ্ণব সাধক ভজনরত। কি জানি কেন এই সাধককে দর্শন করা মাত্র রামদাসের অন্তরে জাগিয়া উঠিল এক সুদৃঢ় বিশ্বাস। ভক্তিভরে সন্তর্পণে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সনাতন আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন। রামদাস করজোড়ে নিবেদন করিলেন তাঁহার বিপদের কাহিনী। কাতর কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি আজ বড় বিপন্ন, যমুনাগর্ভে আমার সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসেছি। ভাগ্যক্রমে এই বিজন স্থানে আপনার মত মহাপুরুষের দর্শন পেলাম। আমার অন্তরাত্মা থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে, আপনার কৃপা ছাড়া আমার উদ্ধারের কোন আশা নেই। অকপটে চরণতলে আশ্রয় নিলাম, আপনি আমায় বাঁচান।"

আর্ত্তের কাতরোক্তিতে সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল। স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, তুমি এত অধীর হ'য়ো না, শান্ত হও, আমার মদনগোপালজী তোমায় কৃপা করবেন। এ বিপদ থেকে তুমি মুক্ত হবে। যাও নির্ভয়ে নেমে গিয়ে যমুনা তীরে অপেক্ষা করো।"

আশীর্ব্বাদ ও অভয় লাভে রামদাসের হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। টিলা হইতে অবতরণের আগে কহিলেন, "মহারাজ, আমি সঙ্কল্প করলাম, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আমার এবারকার বাণিজ্যের সবটা মুনাফা আপনার এই দেববিগ্রহের সেবায় আমি নিয়োজিত করবো।"

সনাতনের শুভেচ্ছায় সেই রাত্রেই রামদাস কাপুরকে বিপদমুক্ত হইতে দেখা যায়। কোথা হইতে অলৌকিকভাবে যমুনাবক্ষে প্রবাহিত হয় নূতন স্রোতধারা। চড়ায় আবদ্ধ পণ্যবাহী বিপন্ন তরী আবার নিজপথে ভাসিয়া চলে।

বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া রামদাস কাপুর তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন। সনাতনের নিকট হইতে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। তাছাড়া, সেবারকার বাণিজ্যের সবটা লভ্যাংশ মদনগোপালজীর সেবায় তিনি উৎসর্গ করেন। সেই বিপুল অর্থে নির্ম্মিত হয় শ্রীবিগ্রহের জন্য সুরম্য মন্দির, জগমোহন ও নাটশালা। প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ঠাকুরের সেবা ও ভোগ বিতরণের স্থায়ী ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়।

সনাতনের সেবিত এই মদনগোপাল কিন্তু ক্রমে জনসাধারণের কাছে মদনমোহন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন। উত্তরকালে নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া এই লীলাময় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।

ইষ্টদেবের মন্দির নির্ম্মাণ ও সেবাকার্য্যের চমৎকার বন্দোবস্ত এভাবে আপনা হইতেই হইয়া যায়। সনাতনের সকল দুশ্চিন্তা দূর হয়, প্রাণমন ভরিয়া উঠে অপার তৃপ্তিতে।

প্রেমপূরিত হৃদয়ে, গলদশ্রুনয়নে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ করিয়া কহিতে থাকেন, "ঠাকুর, আগে ছিলে চৌবে ভবনে, তারপর এলে কাঙ্গাল ভক্ত সনাতনের ঝুপড়িতে। এবার তুমি এসে দাঁড়িয়েছো ব্রজমণ্ডলের তীর্থকামী ভক্তসমাজের নয়নসমক্ষে তীর্থরাজরূপে। জীবের কল্যাণের জন্য কৃপাভরে যে সেবালীলা এখানে তুমি প্রকট করেছো, তা অব্যাহত থাকুক, এই মোর একান্ত প্রার্থনা। এবার এখান থেকে আমার ছুটি দাও, প্রভু।"

নবনির্ম্মিত সুরম্য ঐ ইষ্ট মন্দিরে সনাতন কিন্তু একদিনও বাস করেন নাই। পূর্ব্ববৎ বৃক্ষতল আর পর্ণকুটিরই হয় সর্ব্বত্যাগী কৃচ্ছ্রব্রতী সাধকের একমাত্র আশ্রয়।

এখন হইতে কখনো গোবর্দ্ধনের পাদমূলে, কখনো রাধাকুণ্ডের তীরে, কখনো বা গোকুলের অরণ্য অঞ্চলে ঝুপড়ি বাঁধিয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি সাধন-ভজন করিতে থাকেন।

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের যে নির্দ্দেশ প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে সনাতন পাইয়াছেন ক্ষণেকের তরেও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। এ সময়ে যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, তাহার চারিদিকে তীর্থ ও তীর্থবিগ্রহের আবিষ্কার চেষ্টা ছিল তাঁহার সাধনার অন্যতম অঙ্গ। প্রভুর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সনাতন ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি তীর্থকে পুনরুজ্জীবিত করেন, তারপর সেগুলিকে তুলিয়া ধরেন জন-চৈতন্যের সমক্ষে। এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নন্দগ্রামে নন্দ যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি ভক্ত সমাজের ধন্যবাদভাজন হন।

লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ পণ্ডিত আগে হইতেই শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ব্রজমণ্ডলে সাধন-ভজন করিতেছেন। অতঃপর একে একে আসিয়া উপস্থিত হন রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি। প্রত্যেকেই ভক্তিসাধনার এক একটি দিক্‌পাল। ইঁহাদের অত্যুগ্র সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শাস্ত্র-জ্ঞানের প্রভায় সারা উত্তর ভারতের অধ্যাত্মজীবন উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। আর এই সাধকগোষ্ঠীর মধ্যমণিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন অশেষ শাস্ত্রবিদ্ ধীর-গম্ভীর আত্মকাম মহাপুরুষ সনাতন গোস্বামী।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশ ছিল, ভক্তিশাস্ত্র উদ্ধার করিতে হইবে এবং প্রবল উদ্যমে প্রচার করিতে হইবে নব নব বৈষ্ণবীয় দর্শন, স্মৃতি ও সাধন-ভজনের গ্রন্থ। এই নির্দ্দেশ সনাতন একদিনের তরেও বিস্মৃত হন নাই। ভক্ত ও অনুগত বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ইঁহাদের সাহায্যে দিনের পর দিন তিনি সংগ্রহ করেন অজস্র প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ। শুধু তাহাই নয়, নবতর রচনার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। নিজে কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ যেমন রচনা করেন তেমনি তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ও নেতৃত্বে লিখিত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, স্মৃতি, ও ভজন-পূজনের গ্রন্থ ও নানা ধরণের টীকা ভাষ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শাস্ত্রভিত্তি নির্ম্মাণে ও গৌরবময় ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে যে অবদান সনাতন গোস্বামী রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল। এই মহান কর্ম্মকে তিনি গণ্য করিয়াছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট ব্রতরূপে। বলা বাহুল্য এ ব্রত সাফল্যের সহিত তিনি উদ্‌যাপন করিয়া যান।

ত্যাগ তিতিক্ষা, বৈরাগ্যময় সাধনা ও কৃষ্ণপ্রেমের পরম অনুভূতির সহিত সনাতন গোস্বামীর জীবনে মিলিত হইয়াছিল অসাধারণ প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা। বহুতর নিজস্ব রচনা, সঙ্কলন ও সম্পাদনার মধ্যে তাঁহার এই জীবন বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

পণ্ডিতের শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধকের প্রত্যক্ষীভূত সূক্ষ্মলোকের অনুভূতি—এই দুইটি পৃথক বস্তু। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এই দুটির সমাবেশ ঘটে, তাহা হইয়া উঠে এক দুর্লভ সম্পদ। সনাতনের রচনা ও সম্পাদনায় এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাদির মধ্যে রহিয়াছে: লীলাস্তব, বৈষ্ণবীয় স্মৃতি হরিভক্তিবিলাসের 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা, বৃহৎ ভাগবতামৃত, ভাগবতামৃতের টীকা ও বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

ইষ্ট-বিগ্রহের ভজন-পূজনের সময় আপ্তকাম সাধক সনাতনের শ্রীমুখ হইতে অজস্রধারে নির্গত হইত লীলামাহাত্ম্যের স্তব ও দৈন্যময় প্রার্থনা। ইহারই সঙ্কলন হইতেছে 'লীলাস্তব'।

গোস্বামী গোপাল ভট্টকৃত 'হরিভক্তিবিলাস' এক মহামূল্যবান বৈষ্ণব-স্মৃতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃত্য ও আচারসমূহ ইহাতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গোপাল ভট্টের নামে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইলেও ইহার সঙ্কলনে সনাতনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রভাব ছিল দূরপ্রসারী। সনাতন নিজে এই বিরাট স্মৃতিগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই টীকার উদ্দেশ্য প্রামাণ্য শাস্ত্র বাক্যের উদ্ধৃতি ও যথোচিত যুক্তিতর্ক প্রয়োগের দ্বারা জটিল সমস্যা-

সমূহের সমাধান করা। 'হরিভক্তি বিলাস'এর গ্রন্থকাররূপে বয়ঃকনিষ্ঠ গোপাল ভট্টকে আগাইয়া দিয়া দিক্‌পাল শাস্ত্রবিদ্ সনাতন যে ভাবে বিরাট বনস্পতির মত ছায়া বিস্তার করিয়াছেন, নানা সিদ্ধান্তময়, বিতর্কবহুল ঐ স্মৃতিগ্রন্থের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত প্রবীণ সাধক ও মনীষীরই উপযুক্ত।

বৃহৎ-ভাগবতামৃত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সনাতন ভক্তিশাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়াছেন। একদিকে বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মকথা যেমন ইহাতে উদ্‌ঘটিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি বিস্তারিত হইয়াছে বিভিন্ন অবতারের তত্ত্ব ও প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের সাধনপ্রণালী। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে এই গ্রন্থ অমৃতের খনি বিশেষ। এ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশ সহজতর করার উদ্দেশ্যে সনাতন একটি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন, তাহা 'দিগ্‌দর্শিনী' নামে পরিচিত।

সনাতনের শাস্ত্রসাধনার চরম অবদান— বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী নামক ভাগবতের টীকা। বেদান্তের নিগূঢ় পরমতত্ত্ব ও ভগবৎ ভক্তির অমৃতময় ব্যাখ্যার মহামিলন ঘটিয়াছে মহামুনি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতে। বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক ও টীকা-ভাষ্যকারেরা প্রধানতঃ প্রেমভক্তি-শাস্ত্রের এই অমৃতনির্ঝর হইতেই পরম পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন, যাঁর যাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও সাধনার ধারা উন্মুক্ত করিয়া নিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের পক্ষ হইতে প্রবীণ সাধক সনাতন এই মহান আকরগ্রন্থের দশম স্কন্দ বা কৃষ্ণ জন্মখণ্ডের এক বিস্তীর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন। পাণ্ডিত্য ও রসমাধুর্য্যের দিক দিয়া সনাতনের বৈষ্ণবতোষণী ভক্তিশাস্ত্রের জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশিষ্ট গবেষকদের মতে, সনাতনের 'বৈষ্ণবতোষণী' যে ভাবে ভাগবতের দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যায় আলোকপাত করিয়াছে, অনেক প্রাচীন টীকায়ও তাহা পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণবতোষণী টীকা রচনা করার কালে সনাতন ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ, প্রায় চলৎশক্তিহীন। এসময়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ও অনুগত গোস্বামীদ্বয়

রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস সর্ব্বদা তাঁহার সেবক ও সহকারীরূপে সঙ্গে থাকিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করেন। বৈষ্ণবতোষণীই সনাতন গোস্বামীর শেষ রচনা, যে বৎসর এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত হয়, সেই বৎসরই তাঁহার জীবনদীপ হয় নির্ব্বাপিত।

সনাতনের দেহান্তের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, শিষ্যপ্রতিম শ্রীজীব গোস্বামী, সুবিস্তৃত বৈষ্ণবতোষণীর এক সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার নাম দেওয়া হয় 'লঘুতোষণী'।

অনুজ রূপ গোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর'র উপরও সনাতন গোস্বামীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। গোপাল ভট্টের হরিভক্তিবিলাস-এর মত রূপের এই গ্রন্থখানির পশ্চাতেও রহিয়াছে সনাতনের অধ্যাত্ম-প্রেরণা, ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য ও পরমতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। ভক্তিসাধনার নিগূঢ় প্রণালী ও ভাবরসের মাধুর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছুই ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে, অনেকাংশে তাহা সনাতনেরই প্রতিভা ও সাধনানুভূতির স্বাক্ষর বহন করে।

সমকালীন ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় সাধক ও শাস্ত্রবিদ্দের মধ্যে সনাতন ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তাছাড়া কৃচ্ছ্রব্রত, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার দিক দিয়াও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তাই দেখা যায়, এই মহাপুরুষের সুদীর্ঘ জীবনকালে সারা ব্রজমণ্ডল তাঁহার ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও সিদ্ধির কাছে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে যিনিই যে গ্রন্থ এ সময়ে লিখিতেন, যে সিদ্ধান্ত ও মতবাদ স্থাপন করিতেন, সনাতনের সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া তাহা ভক্ত সমাজে গৃহীত হইতে পারিত না।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অপ্রকট হন ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। এই দুঃসংবাদ শোনার পর হইতেই সনাতনের বহিরঙ্গ জীবনে ছেদ পড়িতে দেখা যায়। কর্ম্মজীবন হইতে নিজেকে প্রায় গুটাইয়া নিয়া ইষ্ট বিগ্রহের

নিরন্তর ধ্যান ও ভজনে তিনি তন্ময় হইয়া যান। তারপর ধীরে ধীরে মহাসাধক প্রবিষ্ট হন ভক্তি-সাধনার গভীরতম স্তরে।

সনাতনের ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও প্রেমভক্তি সাধনার ঐশ্বর্য্যের কথা ইতিমধ্যে শুধু ব্রজমণ্ডলেই নয়, সারা উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দূর দূরান্ত হইতে ভক্ত সাধকেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ভীড় জমায়। কুঞ্জকুটির আলো-করা এই দেবমানবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া সকলে হয় কৃতকৃতার্থ।

সনাতনের এ সময়কার সাধনৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। সে-বার বারাণসী হইতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হন্তদন্ত হইয়া সনাতনের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। বর্দ্ধমান জেলার মানকড়ে তাঁহার বাড়ী, নাম জীবন ঠাকুর। সৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া লোকে তাঁহাকে জানে ; চির জীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন দারিদ্র্যের সহিত নিরন্তর যুঝিয়া। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আর যেন দমে কুলাইতেছে না। সেদিন আর্ত্তভাবে বিশ্বনাথের চরণে বার বার প্রার্থনা জানাইলেন, "বাবা, দারিদ্র্যের এ জ্বালা আর যে সহ্য হচ্ছে না, এবার কৃপা করে আমায় রক্ষা করো, অর্থ প্রাপ্তির কোন সন্ধান বলে দাও।"

নিশাযোগে প্রত্যাদেশ মিলিল—"ওরে, তুই শিগ্‌গীর ব্রজমণ্ডলে চলে যা। সেখানে গিয়ে সনাতন গোস্বামীর শরণ নে। মহার্ঘ রত্ন পড়ে রয়েছে তার সন্ধানে। তার করুণা হলে তোর সর্ব্ব দারিদ্র্য-দুঃখ চিরতরে দূর হবে।"

কালবিলম্ব না করিয়া জীবন ঠাকুর ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। সনাতন গোস্বামীর পদতলে পড়িয়া সবিস্তারে নিবেদন করেন স্বপ্নাদেশের কথা।

এ কাহিনী শুনিয়া গোস্বামী প্রভু তো মহা বিস্মিত। নিজে তিনি কাঙ্গাল বৈষ্ণব, রিক্ত সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণের এই দারিদ্র্য তিনি কি করিয়া ঘুচাইবেন? আজকাল ভজন-পূজন সারিবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা অতিবাহিত হয় ইষ্টদেবের ধ্যান জপে।

বাহিরের কাহারো সঙ্গেই বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। এ ব্রাহ্মণের সাহায্যের জন্য কাহাকে ধরিবেন, কাহার কাছে উপস্থিত হইবেন, ভাবিয়া পান না।

সহসা স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে পুরাতন একটি ঘটনার কথা। তাই তো। দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই মানুষটির সাহায্য তো তিনি করিতে পারেন। সে অনেক দিন আগের কথা। যমুনার তট ধরিয়া সনাতন আপন মনে ভজন করিতে করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ পায়ে ঠেকিল এক দুর্লভ রত্ন। মৃত্তিকা হইতে তখনি তাড়াতাড়ি উহা তুলিয়া নিলেন। পরক্ষণেই মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। সর্ব্বত্যাগী কৃচ্ছ্রব্রতী সন্ন্যাসী তিনি, এ রত্ন দিয়া তাঁহার কোন্ কাজ ? বরং যত শীঘ্র এটিকে যমুনায় বিসর্জ্জন দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। আবার ভাবিলেন, শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা তা কে জানে ? হয়তো এই রত্ন দিয়া কোন দুঃখী বা বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচিতে পারে। জলে ফেলিয়া না দিয়া তটের বস্তু তটে রাখিয়া দেওয়াই সমীচীন। সামনেই একটি চিহ্নিত স্থানে রত্নটি প্রোথিত করিয়া সনাতন আপন কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতকাল সেই রত্নের কথা তাঁহার স্মরণে ছিল না। এবার মহা উৎফুল্ল হইয়া ভাবিলেন, ভালই হইল, এই অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণই তবে উহা গ্রহণ করুক।

যেস্থানে উহা প্রোথিত আছে তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন, প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, ঐ রত্ন তুমি এখনি তুলে নিয়ে যাও, দারিদ্র্যক্লেশ তোমার দূর হোক।" কথা কয়টি বলার পরই গোস্বামী আবার মগ্ন হইলেন ইষ্টধ্যানে।

জীবন ঠাকুর সোৎসাহে তখনি নদী তীরে ছুটিয়া আসেন। নির্দ্দেশিত গোপন স্থান হইতে উদ্ধার করেন সেই দুর্লভ সম্পদ।

হস্তস্থিত রত্নখণ্ড সূর্য্যকরে ঝলসিয়া উঠে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে হন হতবাক্। একি অদ্ভুত দৈবী লীলা প্রকটিত তাঁহার জীবনে ?

সাত রাজার ধন মাণিক আজ যে তাঁহার মত চির কাঙ্গালের মুঠোর মধ্যে। এই মহার্ঘ বস্তু বিক্রয় করা মাত্র মিলিবে অগণিত অর্থ, ঐশ্বর্য্যের তাঁহার সীমা থাকিবে না।

সনাতনের কৃপাতেই জীবন ঠাকুর আজ এই বিপুল সম্পদের অধিকারী। তাই তাঁহার কথা মনে হইতেই কৃতজ্ঞতায় নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া আসে।

হঠাৎ জীবন ঠাকুরের চেতনার দ্বারে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সমগ্র সত্তায় জাগে আলোড়ন। সবিস্ময়ে ভাবিতে বসেন, ধন-সম্পদের লোভে পুণ্যধাম বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অবধি তিনি পদব্রজে ছুটিয়া আসিয়াছেন, আর সনাতনের কৃপার ফলে করায়ত্ত হইয়াছে রাজভোগ্য রত্ন। অথচ সেই সনাতন গোস্বামীর বিন্দুমাত্র হুঁস নাই এই মহার্ঘ বস্তুটির দিকে। এতকাল এটির কথা বিস্মৃতই ছিলেন, যদিই বা আর্ত্তের কাতর ক্রন্দনে সে কথা মনে পড়িয়াছে, তাহার সন্ধানটি বলিয়া দিয়াই আবার ডুবিয়া গেলেন ধ্যান ভজনে। কোন্ অমৃত ভুঞ্জনের ফলে গোস্বামী এমন বিভোর হইয়া আছেন? কোন্ পরম ধনের অধিকারী তিনি যাহা এমন রাজবাঞ্ছিত রত্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করায়? অতুল বিত্তবৈভব, রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া আসিয়া সনাতন ভজনানন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন, রূপান্তরিত হইয়াছেন দেবমানবরূপে। আর জীবন ঠাকুর শিবকৃপায় সেই দেবমানবেরই সান্নিধ্য ও কৃপাপ্রসাদ পাইয়া তুচ্ছ রত্নের মোহে হইয়াছেন আচ্ছন্ন, ঘৃণ্য বিষয়কীটের জীবন আঁকড়াইয়া ধরিতে চলিয়াছেন আরো দৃঢ়হস্তে।

পরম ধন লাভের তীব্র আকুতি জাগিয়া উঠে ব্রাহ্মণের অন্তরে। এক অভূতপূর্ব্ব দিব্য চেতনায় হন উদ্বুদ্ধ। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই মহার্ঘ রত্ন লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করেন যমুনায়। তারপর ত্রস্ত পদে সনাতনের কুঞ্জে ফিরিয়া যান। দণ্ডবৎ করিয়া গলদাশ্রুলোচনে নিবেদন করেন, "প্রভু, আমি অতি জীবাধম। নিজের তুচ্ছ ঘর সংসারের মায়ায়

আবদ্ধ হয়ে আছি। দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট হয়ে সদাই উদগ্র হয়ে আছি অর্থলাভের জন্য। আজ আপনার সান্নিধ্যে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। যে ধনে ধনী হয়ে মণিকেও আপনি মণি বলে গণ্য করছেন না, কৃপা করে তারই কিছুটা আমায় দিন। অর্থের বদলে দিন পরমার্থ। আজ থেকে আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ করলাম।"

সনাতনের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর শুরু হয় জীবন ঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনের অভিযাত্রা। নূতন মানুষে তিনি রূপান্তরিত হন। উত্তরকালে তাঁহার বংশ খ্যাত হইয়া উঠে কাঠমাগুরার গোস্বামী পরিবার নামে।

জীবনের শেষ পর্য্যায়ে সনাতন নন্দীশ্বরের মানসগঙ্গা নামক পুণ্য সরোবরের তীরে আসিয়া সঙ্গোপনে অবস্থান করিতে থাকেন। উত্তরকালে এ স্থানটি বৈঠান বলিয়া খ্যাত হয়। নিকটেই চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই স্থানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মহাসাধক ব্রতী হন তাঁহার চরম অধ্যাত্ম-সাধনায়। স্নানাহারের দিকে কোন হুঁস নাই, একেবারে অজগর বৃত্তি। অন্তরে সদা চলিয়াছে কৃষ্ণভজন আর কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান।

সনাতন এ সময়ে অতিবৃদ্ধ, বয়স নব্বই বৎসরের কাছাকাছি। কথিত আছে এই বয়সে প্রাণপ্রিয় ভক্তের এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া ইষ্টদেব নিজেই ব্যগ্রভাবে বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হন। গোপ বালকের ছদ্মবেশে ভার গ্রহণ করেন তাঁহার দৈনন্দিন আহার্য্যের। 'ভক্তিরত্নাকর' এই রসমধুর লীলার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে, হর্ষ হৈয়া।
গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়।
দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি, গোস্বামীরে কয়।

আছহ নির্জনে, তোমা কেহ নাহি জানে।
দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে।
এই দুগ্ধ পান কর, আমার কথায়।
লইয়া যাইব ভাণ্ড, রাখিও এথায়।
কুটিরে রহিলে, মো সভার সুখ হবে।
ঐছে রহ, নহিলে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে।

(৫ম তরঙ্গ, পৃঃ ২৫০-২৫১)

ক্রমে ভক্ত ভগবানের এই প্রেমলীলার কথা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া পড়ে। সনাতনের ভক্ত ও গুণগ্রাহীরা ব্যাকুল হইয়া বৈঠানে ছুটিয়া আসেন। ইঁহাদের অনুরোধ উপরোধে সনাতন কৃচ্ছ্র সাধন হ্রাস করিতে বাধ্য হন। সবাই মিলিয়া ঐ বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য এক কুটির বাঁধিয়া দেন। এ কুটির ত্যাগ করিয়া সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আর ফিরিয়া যান নাই, শেষের দিন কয়টি এখানেই অতিবাহিত করেন। রূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোস্বামীরা, সারা ভারতের দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ও সার্থকনামা সাধুরা, প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হইতেন বৈঠানের এই নিভৃত পর্ণ কুটিরে। আপ্তকাম সাধক সনাতনকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া হইতেন উপকৃত।

গিরি গোবর্দ্ধনের পরিক্রমা ছিল সনাতনের জীবনের এক প্রধান ব্রত। এই পুণ্যগিরি বৈঠান হইতে বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম জরাজীর্ণ অশক্ত দেহ নিয়াও সনাতন পরিক্রমা সম্পন্ন করিতেন। পরের দিকে আর দৈহিক সাধ্যে তেমন কুলাইয়া উঠিত না। তখন তাঁহার সারা মনপ্রাণ পড়িয়া থাকিত ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূত ঐ গিরির প্রদক্ষিণ পথের দিকে। অনুশোচনা ও বেদনায় পরম ভাগবতের অন্তর হইয়া উঠিত ভারাক্রান্ত।

ভক্ত হৃদয়ের আর্ত্তি আবার সেদিন টানিয়া আনে ইষ্টদেবকে। নয়নাভিরাম মূর্ত্তিতে গিরিধারীজী আবির্ভূত হন সনাতনের সমক্ষে।

প্রসন্ন মধুর হাস্যে কহেন, "সনাতন, তোমার অন্তরে খেদ জেগেছে, আমার গোবর্দ্ধন গিরির পরিক্রমা আর তুমি করতে পারছো না। সেই জন্যেই তো আমি ছুটে এলাম। এই ছাখো, আমার হাতে রয়েছে গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ড। আর এতে অঙ্কিত রয়েছে আমার চরণচিহ্ন। এই চরণ-পাহাড়ী ভক্তিভরে তোমার কুটিরে স্থাপন করবে, ভজন শেষে রোজ করবে এটিকে প্রদক্ষিণ। তাতেই হবে তোমার গোবর্দ্ধন পরিক্রমণের ব্রত উদ্‌যাপন। এতে এই জীর্ণ-দেহে তোমার শ্রম লাঘব যেমন হবে, তেমনি আমারও বাড়বে আনন্দ।"[১]

এখন হইতে এই চরণ-পাহাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই সনাতনের ভজন ও তপস্যার ধারা বহিয়া চলে। অতঃপর ধীরে ধীরে সমাগত হয় ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথি। সনাতন গোস্বামীর জীবনদ্বারে সেদিন ধ্বনিত হয় তাঁহার প্রাণাধিক নওলকিশোরের পরম আহ্বান। চরণ-পাহাড়ীর পুণ্যময় বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যোতির্ম্ময় মূর্তিতে ইষ্টদেব তাঁহার পরম ভক্তকে দর্শন দেন। মায়িক জগতের যবনিকা ভেদ করিয়া সনাতন গোস্বামী প্রবিষ্ট হন শাশ্বত লীলাধামে।

এই মহাপ্রয়াণের ফলে উত্তর ভারতের বৈষ্ণবীয় সাধনার, সারস্বত সাধনার, এক তুঙ্গ শিখর যেন সেদিন ধ্বসিয়া পড়ে। সারা ব্রজমণ্ডলে নামিয়া আসে করুণ শোকের ছায়া। আর গৌড়ীয়

---

১ অলৌকিক ভাবে লব্ধ সনাতনের এই চরণ-পাহাড়ী একটি বটপত্রাকৃতি শিলাখণ্ড। গৌড়ীয় ভক্তেরা মনে করেন, ইহা পুণ্যগিরি গোবর্দ্ধনের প্রতীক এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সনাতন মরলোক ত্যাগ করার পর শ্রীজীব গোস্বামী ঐ চরণ-পাহাড়ী নিজের ইষ্টবিগ্রহ রাধাদামোদরজীর মন্দিরে স্থাপন করেন ও পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা করেন। আজ অবধি এই পবিত্র শিলা সেখানেই রহিয়াছে।

বৈষ্ণবসমাজ তাহার দূর বিস্তারী আলোক স্তম্ভটি হারাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে।

সহস্র সহস্র শোকার্ত্ত ব্রজবাসীর সম্মুখে, প্রভু মদনমোহনজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে সনাতন গোস্বামীর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য আজিও নিবেদিত হয় সেই পবিত্র ভূমিতে।

সমর্থ রামদাস

ছোট ছেলে নারায়ণকে নিয়া রাণুবাঈ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া সমাপ্ত প্রায়; সে তাহার দাদা গঙ্গাধরের সঙ্গে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিবে, ঘর-সংসার করিবে, ইহাই রাণুবাঈ চান। কিন্তু নারায়ণ এ কথায় কান পাতে না। সাধু-সন্তের খোঁজ পাইলেই তাঁহাদের পিছনে করে ঘোরাঘুরি, মাঝে মাঝে মঠে-মন্দিরে গিয়াও চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। আর গঙ্গাধরের কাছে বলিয়া বেড়ায়, ঘরে তাহার মন মোটেই টিকে না, সন্ন্যাস নিয়া হইবে সে দেশত্যাগী।

জননী সেদিন নারায়ণকে নিকটে ডাকিলেন। যা হোক একটা বুঝাপড়া আজ তাহার সঙ্গে করিতেই হইবে। আর দেরী করা সঙ্গত নয়। কোমল স্বরে কহিলেন, "বাবা নারায়ণ, এখন তুই বড় হয়েছিস, লেখাপড়াও কিছুটা শিখেছিস। তোর দাদা গঙ্গাধর তো সংসারের জন্য খেটে খেটে সারা হল, তোর কি উচিত নয় তাকে সাহায্য করা, তার সংসারের ভার লাঘব করা? আরও একটা জরুরী কথা। আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। বড় বউ পার্ব্বতীর উপর অন্যায় রকম সংসারের চাপ পড়েছে। তাকে সাহায্য করবার জন্য বাড়িতে একটি বউ আনা দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি, আসছে মাসেই তোর বিয়ে দেবো। ভাল ঘরের সুলক্ষণা একটি পাত্রীও আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি।"

"মা, তোমার দুটো ইচ্ছের কোনটিই যে আমি পূরণ করতে পারছিনে। আমি বলি কি, আমার আশা বরং তুমি ছেড়েই দাও।" অবলীলায় উত্তর দেয় নারায়ণ।

"এসব কি তুই বাজে বক্‌ছিস? এ শুধু তোর দায়িত্ব এড়ানোর একটা ছুতো।"

"না, মা, সত্যি কথাই বলছি। গৃহস্থী আমায় দিয়ে কখনো হবে না। জানিনে কেন এক অজানা রাজ্যের হাতছানি কেবলই আমায় ডাকছে। আর দ্যাখো মা, প্রায়ই আমি স্বপ্নে প্রভু রামজীকে দেখি, ভক্তবীর মারুতীকেও দেখি। শুধু তাই নয়, কি এক অদ্ভুত শূন্যতায় আমার হৃদয় ছটফট করে। আর ভেতর থেকে কে যেন বার বার অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে—ওরে সাবধান, সাবধান—সংসারের জালে যেন জড়িয়ে পড়িসনে—সদ্‌গুরুর কাছে ছুটে যা, মন্ত্র নে তাঁর কাছ থেকে, আর এই মন্ত্রের ভেলায় চড়ে পোঁছে যা প্রভু রামচন্দ্রজীর চরণে।"

পুত্রকে হারানোর আশঙ্কায় জননীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। নিজেকে সামলাইয়া নিয়া রাণুবাঈ বলেন, "বেশ তো বাবা, মন্ত্র নিতে হয়, রামজীর ধ্যান-জপ করতে হয়—তা বাড়ীতে বসেই তো ওসব করা যায়। এজন্য সংসার ছাড়া কেন, বলতো?"

"না, মা। সন্ন্যাসীর মুক্ত জীবনই আমি নেবো। গ্রামে যখন সাধু-সন্ন্যাসীর জমায়েত আসে, আমি তাঁদের দেখে দেখে মুগ্ধ হই। কোন পিছুটান নেই, সঞ্চয় নেই। নেই কোন বন্ধন বা জটিলতা। একমনে ইষ্টধ্যান করার পরম সুযোগ রয়েছে তাঁদের। এই জীবনই আমার বড় ভাল লাগে।"

"বাবা নারায়ণ, শুধু নিজের ভালো লাগার পিছনেই চলতে নেই, বাপ মায়ের ভালো লাগার দিকেও যে চাইতে হয়। ভেবে দ্যাখ্, প্রভু রামজী তাঁর বাপ-মায়ের কি বাধ্যই না ছিলেন। তাঁদের তৃপ্তির জন্য কি-ই না করতে পারতেন তিনি। তুইও তোর অভাগিনী মায়ের দিকে একটু ফিরে তাকাস্, বাবা। সাত বছর আগে তোদের বাবা স্বর্গে গেছেন, দুটি নাবালক পুত্র আমার হাতে সঁপে দিয়ে। তোর তখন মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স! কত দুঃখে কষ্টে

তোদের দু'ভাইকে আমি মানুষ করেছি। তোর বাবার কথা মনে ক'রে, এই দুঃখিনী মায়ের মুখ চেয়ে, তুই ঘর-সংসারে থাক্, আমাদের দুঃখের ভার লাঘব কর্, বাবা। আর জেনে রাখিস্, তুই যদি আমাদের দুঃখ না বুঝিস্, কথার অবাধ্য হোস্, তবে আমিও আমার পথ দেখবো। হবো আত্মঘাতিনী।"—সাশ্রুনয়নে কাতর কণ্ঠে একথা বলিতে বলিতে জননী নারায়ণের হাত দুটি ধরিয়া ফেলিলেন।

মায়ের অশ্রু, পিতার মৃত্যুর করুণ স্মৃতি, নারায়ণের সঙ্কল্প টলাইয়া দেয়। মন তাহার কোমল হইয়া আসে। ছলছল নয়নে উত্তর দেয়, "মা, তুমি এমন করে কাঁদাকাটি ক'রো না। বেশ তো, তোমার ইচ্ছা অনুসারেই আমি কাজ করবো।"

"তা হলে, তোর বিয়ের সম্বন্ধ আমি পাকাপাকি করে ফেলি, কি বলিস্? আসন্ গাঁও-এ এক সৎ গৃহস্থ রয়েছেন, নাম তাঁর ভন্‌জিপন্থ চোরাল্‌পুরকর্। তাঁর একটি মেয়ে আছে, যেমনি সুন্দরী সুলক্ষণা, তেমনি স্বভাবটিও সুন্দর। প্রস্তাব নিয়ে তারা ঘোরাফেরা করছে। আমরা সম্মতি দিলেই হয়।" জননী রাণুবাঈ এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিনই কন্যাপক্ষের সহিত কথা পাকা করার জন্য লোক পাঠান। দিনক্ষণও ধার্য্য করা হয়।

বিবাহের রাত। বরযাত্রীরা সাড়ম্বরে কনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। বরকর্ত্তা গঙ্গাধর মহা উৎসাহে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। আত্মীয়-কুটুম্বদের হাসি গান আনন্দ-কলরবে কান পাতা দায়। বাদ্যভাণ্ড, মশালের আলো আর আতসবাজীতে আকাশ বাতাস সরগরম।

অল্পকাল মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হইয়া যায়। সুসজ্জিতা কনেকে নিয়া আসা হয় বিবাহ-সভায়। বরকনের মাঝখানে আড়াল রচনা

করিয়া আছে শুধু একটি পর্দ্দা, এখনি উহা উত্তোলন করা হইবে, চার চোখের হইবে শুভ মিলন।

এমন সময় জ্বলন্ত মশালধারীদের সতর্ক করিতে গিয়া কে যেন গম্ভীর আওয়াজে বলিয়া উঠে—সাবধান! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হঠাৎ শিহরিয়া উঠে বরবেশী নারায়ণ। চিন্তার ঝলক্ খেলিয়া যায় তাহার অন্তরে। সাবধান? সে কি! এ কথাটি যে তাহার পূর্বেকার শোনা; অন্তর্লোক হইতে উদ্গত এই বাণী আরো কয়েকবার যে তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে। আজো এই বাণী তাহারই উদ্দেশে উচ্চারিত। ভ্রান্তিবশে সংসারের জালে আজ সে জড়াইতে যাইতেছে। আর তো কোন দিনই এই জাল ছিন্ন করিয়া সে বাহির হইতে পারিবে না। নাঃ, এই মুহূর্ত্তেই ইহার একটা প্রতিবিধান সে করিবে। বিবাহের শৃঙ্খল এড়াইয়া এখনই এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে করিবে পলায়ন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিতে দেরী হয় না। তৎক্ষণাৎ বরের টোপর ও উত্তরীয় নারায়ণ ভূতলে নিক্ষেপ করে, 'জয় রামজী' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দেয়, বিবাহের অঙ্গন হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে। তারপর বাড়ীর পিছনের রাস্তা দিয়া ধাবিত হয় নিকটস্থ বনের দিকে।

বিবাহ-সভায় উপস্থিত লোকজন এ কাণ্ড দেখিয়া হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। ক্ষণপরেই তাহাদের চমক ভাঙ্গিল—'ধর্-ধর্' শব্দে সবাই করিল পলাতক বরের পশ্চাদ্ধাবন।

চারিদিকে অন্ধকার, রাস্তাঘাট কিছুই দেখা যায় না, ইতিমধ্যে সবার অলক্ষ্যে নারায়ণ কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। অবশেষে উৎসাহী অনুসরণকারীরা নিবৃত্ত হয়, হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। আলো হাসি গান ভরা বিবাহ-বাড়ীতে নামিয়া আসে নৈরাশ্যের অন্ধকার। ভগ্নদূতের মত গঙ্গাধর গৃহে ফিরিয়া আসেন, জননীর কাছে বর্ণনা করেন এই দুর্দ্দৈবের কথা। মর্ম্মভেদী কান্নায় জননী ভাঙ্গিয়া পড়েন। পুত্র নারায়ণ প্রায়ই যে তাঁহার কাছে প্রকাশ

করিত গৃহত্যাগের সঙ্কল্প। জননী বুঝিলেন, বিবাহ-বাসর হইতে পলায়ন করিয়া সেই সঙ্কল্পই আজ সে সিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। সংসারে সে আর কোনদিন ফিরিয়া আসিবে না।

এদিকে বিবাহ-বাসর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নারায়ণ ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে। গ্রামের চেনা রাস্তা তাহার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়, অনুসরণকারীরা যে কোন সময়ে ধরিয়া ফেলিতে পারে, তাই অন্ধকার বনপথ দিয়াই সে অগ্রসর হইতেছে। দুই পা ক্ষত-বিক্ষত, গাছের গুঁড়ির আঘাতে মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। উন্মাদের মত কেবলই সে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর মনে হইল, এবার সে অনেকটা নিরাপদ। শরীর তাহার বড় শ্রান্ত, ক্ষত ও আঘাতের বেদনায় কাতর। এবার কিছুটা বিশ্রাম না নিলে আর চলে না। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে, দুর্গম বনের মধ্যে আশ্রয় কোথায়?

সম্মুখে দণ্ডায়মান এক বিশাল বটবৃক্ষ। নারায়ণ স্থির করিল, এই বৃক্ষশাখে উঠিয়া রাত কাটাইয়া দিবে। শয়নের অসুবিধা হইলেও এ ব্যবস্থায় অন্তত হিংস্রজন্তুর আক্রমণের ভয় নাই। বৃক্ষের প্রশস্ত শাখায় অবসন্ন দেহটি এলানোর সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রায় সে অভিভূত হইয়া পড়ে।

পরদিন আবার শুরু হয় পথ চলা। বনের প্রান্তদেশে গিয়া এক ব্রাহ্মণের কুটিরে নারায়ণ আশ্রয় পায়। সেখানে স্নানাহার সম্পন্ন করার পর শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠে।

ভাগ্যক্রমে একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ। এই দলটি যাইতেছে পঞ্চবটি দর্শনে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যময় লীলাভূমি এই স্থান। নারায়ণের মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে;

তীর্থচারীদের দলে তখনই সে ভিড়িয়া পড়ে। তারপর এগারো দিনের পদযাত্রা শেষে উপনীত হয় পঞ্চবটিতে।

এই পরম পবিত্রতীর্থে অবস্থানের সময়ই নারায়ণের জীবনে হয় নব অরুণোদয়, গুরুকৃপা ও অনন্য সাধনার বলে সে পরিণত হয় প্রভু-রামচন্দ্রের কৃপাধন্য এক মহান সাধকে। তাঁহার নব নামকরণ হয়—রামদাস। শাস্ত্রবিদ্, যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ, সমর্থ রামদাস শুধু এক সিদ্ধ রামাইৎ সাধুই নন, মহারাষ্ট্রের উজ্জীবনে ও দক্ষিণ ভারতে রামভক্তির প্রচারণে তাঁহার অবদান অসামান্য। ছত্রপতি শিবাজীর নব মহারাষ্ট্র নির্ম্মাণের, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের, প্রেরণা ও পরিকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল এই মহাত্মার সিদ্ধজীবন হইতে। বৈরাগীর উত্তরীয়কে রাষ্ট্রের পতাকারূপে চিহ্নিত করিয়া দিয়া রামদাস ভারতের জনজীবনের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন ত্যাগ-বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মশক্তির কালজয়ী মাহাত্ম্য।

হায়দ্রাবাদ নগরীর পনের মাইল দূরে জাম্ব্ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ স্থানটি রুক্ষ ও পিঙ্গল নয়, চারদিক রহিয়াছে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র দিয়া ঘেরা। এই গ্রামে বাস করিতেন সূর্য্যজী পন্থ নামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পত্নী রাণুবাঈ-ও পরিচিতা ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণা মহিলারূপে।

পন্থজীর বয়স যৌবনের কোঠা পার হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ কোন সন্তানাদি হয় নাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনে বড় অশান্তি। তাই ভগবৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহারা ব্রতী হন, দেবদ্বিজের সেবায় করেন আত্মনিয়োগ। অতঃপর কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ইহাদের দুইটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথমটির নাম গঙ্গাধর, দ্বিতীয়টি নারায়ণ। এই নারায়ণই হন ভারতবিশ্রুত মহাসাধক—সমর্থ রামদাস।

দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাণুবাঈর অন্তর্জ্জীবনে নানা ভাবান্তর দেখা যায়। রামদাসের অন্যতম জীবনীকার গিরিধর লিখিয়াছেন, এই সময়ে প্রায়ই রাণুবাঈয়ের দেহে দেখা দিত দিব্য ভাবের আবেশ। লোকের সঙ্গ এড়াইয়া তিনি নির্জ্জনে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একদিন রাণুবাঈ স্বামীকে কহিলেন, "ছাখো, আজকাল প্রায়ই আমি বড় অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখে থাকি। আর সেই সব স্বপ্নদৃশ্যে আবির্ভূত হন প্রভু রামচন্দ্র, মা-জানকী, লক্ষণ প্রভৃতি। কখনো বা সামনে দাঁড়িয়ে অপূর্ব্ব কণ্ঠে স্তবগান করছেন রামদাস মারুতী। একই ধরণের এই দৃশ্য কেন বার বার দেখ্‌ছি, বলতো ?"

"ভালোই তো। এতে বোঝা যাচ্ছে, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হয়েছে আমাদের ওপর। তোমার কোলে হয়তো আসছে রামজীরই কোন চিহ্নিত সেবক। যাক্, এসব কথা যেন কারুর কাছে প্রকাশ ক'রো না, আর খুব সাবধানে থেকো।"

অল্পকাল মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় সূর্য্যজী পন্থের বহু প্রত্যাশিত এই দ্বিতীয় তনয়—রামদাস। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের এই শুভ জন্মদিনটি, ১৫৩০ শকাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীর এই পবিত্র তিথিটি, মহারাষ্ট্রের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে সংযোজন করিয়াছে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

পিতা সূর্য্যজী পন্থ ছিলেন আচারনিষ্ঠ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ। রামদাসের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তিনি তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করান। তারপর পুত্রকে প্রেরণ করেন গুরুগৃহে। বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভা বালকের। অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠশালার বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

স্বল্পবিত্ত হইলেও রামদাসের পরিবারে এতদিন সুখ শান্তির অভাব ছিল না। কিন্তু এবার একদিন তাহাদের উপর পতিত হয় দৈবের নিষ্করুণ আঘাত। মারাত্মক রোগে ভুগিয়া সূর্য্যজী পন্থ হঠাৎ

পরলোকে গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র রামদাসের বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর।

এই দারুণ বিপদে রাণুবাঈ একেবারে ধৈর্য্যহারা হন নাই। কিছুদিনের জন্য শক্ত হাতে সংসারের দায়িত্ব ভার তিনি গ্রহণ করেন এবং বড় ছেলে গঙ্গাধর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রোজগার শুরু করিলে তাঁহাকে বিবাহ করান। ইহার কয়েক বৎসর পরে জননী রামদাসকে গৃহস্থীতে প্রবেশ করাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন। কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্যরূপ। পুত্রের সেদিনকার পলায়ন সংবাদ জননীর হৃদয়ে গিয়া বিদ্ধ হয় শেলের মত, দুঃসহ শোকের ভারে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

বিবাহ-সভা হইতে নাটকীয় অন্তর্ধানের পর প্রায় একপক্ষকাল কাটিয়া গিয়াছে। পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া রামদাস এবার উপনীত হইয়াছেন গোদাবরী তীরে, নাসিকের নিকটে, পঞ্চবটির মহাতীর্থে।

এখানে পৌঁছানোর পর দীর্ঘ পথের শ্রম যেন মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। স্বর্গীয় আনন্দের শিহরণ তখন রামদাসের সারা দেহে-মনে। পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন রামচন্দ্রজীর মন্দিরে। শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাওয়া মাত্র নিমজ্জিত হইলেন দিব্য আনন্দের সাগরে।

পঞ্চবটির আশেপাশে রামচন্দ্রজীর স্মৃতিপূত বহু স্থান রহিয়াছে। কয়েকমাস রামদাস মনের আনন্দে এই সব লীলাস্থল দেখিয়া বেড়ান। পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের জমায়েত এখানে লাগিয়াই আছে। তরুণ রামদাস সোৎসাহে ইঁহাদের সঙ্গ করেন, সাধ্যমত রত হন সাধুদের সেবায়। কোন কোন মহাত্মার কাছে ভজনের উপদেশ তিনি প্রাপ্ত হন, নিষ্ঠাভরে তাহাই অনুসরণ করিয়া চলেন।

যত দিন যায় রামদাসের মনের ব্যাকুলতা বাড়িতে থাকে।

ভাবিতে থাকেন—পরমার্থের জন্য, রামচন্দ্রজীর জন্য ঘর-সংসার ছাড়িয়াছেন, জননীর স্নেহ-মমতার বন্ধন কাটাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই পরমবস্তু মিলিবার উপায় কই ?

বালক বয়স হইতেই সাধু-সন্তদের কাছে শুনিয়া আসিয়াছেন, ইষ্টলাভের জন্য চাই সদ্‌গুরু, চাই অমোঘ দীক্ষামন্ত্র, চাই কঠোরতম সাধনা। কিন্তু তাঁহার জীবনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্‌গুরুর আবির্ভাব। তাহা তো এ যাবৎ সম্ভব হইল না। এ সঙ্কটে কি করিবেন, কাহার কাছে যাইবেন ভাবিয়া কোন কূল-কিনারা পান না।

কিন্তু নিজের যাহা সাধ্য তাহা তো রামদাস করিতে পারেন। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গোদাবরীর পবিত্র সলিলে স্নান করেন, তারপর অনন্যনিষ্ঠায় শুরু হয় ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের নামজপ ও কীর্ত্তন। জপে নিবিষ্ট হইয়া কোন কোন দিন একেবারে বেহুঁস হইয়া পড়েন, সেদিন আর মাধুকরীতে যাওয়া হয় না। উপবাসেই দিনরাত কাটিয়া যায়।

এই ব্যাকুলতা, কৃচ্ছ্র ও নামসাধনের ফল অচিরে ফলিল। সদ্‌গুরুর আবির্ভাব ঘটিল তাঁহার জীবনে।

পঞ্চবটির নির্জ্জন অরণ্যের একপ্রান্তে, বৃক্ষমূলে বসিয়া তরুণ সাধক সেদিন সারা রাত নিবিষ্ট মনে জপ করিয়া চলিয়াছেন। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার তরল হইয়া আসে। বনানীর শিরে দেখা দেয় উষার অরুণ রাগ, প্রভাত পাখীর কাকলী ছড়াইয়া পড়ে আকাশে বাতাসে। দেব-দেউলের কাঁসর ঘণ্টা আর সাধু-সন্তজনের ভজনের দূরাগত ঝঙ্কার অন্তরলোকে উৎসারিত করে দিব্য আনন্দের ধারা। এমনি সময়ে বৃক্ষমূলে আসিয়া দাঁড়ান এক বৈরাগী মহাপুরুষ। গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ধ্বনিত হয়, "বৎস, চোখ মেলে চাও। তোমার আর্ত্তি আর ভজন-নিষ্ঠায় রামজী প্রসন্ন হয়েছেন, সেই আনন্দ সংবাদ দিতেই আজ এখানে আমার আগমন।"

চোখ মেলিতেই রামদাস দেখেন—সমুন্নত দেহ, জটাজুট সমন্বিত এক মহাত্মা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। গলে বিলম্বিত একছড়া তুলসীর মালা। কোমরে একফালি কৌপীন ছাড়া আর কোন আচ্ছাদন নাই। বয়সে প্রাচীন হইলেও দেহের গৌরকান্তি এখনো অপরিম্লান। আয়ত নয়ন দুইটি দিব্য আনন্দের দ্যুতিতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

দর্শন মাত্রেই রামদাসের সর্ব্বসত্তায় উঠে প্রবল আলোড়ন। অন্তরাত্মা হইতে উত্থিত হয় আশ্বাস বাণী—'ওরে ভয় নেই, রামজীর কৃপাপ্রসাদ পেতে আর দেরী নেই, এই যে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন তোর সদ্‌গুরু, ইষ্টদেবের চরণে ইনিই যে তোকে দেবেন পেঁ ৗছে।'

মোহাবিষ্টের মত এগিয়ে যান তরুণ সাধক রামদাস। মহাত্মার চরণে লুটিয়ে পড়েন, সাশ্রুনয়নে আবেদন জানান, "কৃপা ক'রে যদি এসেছেনই, দিন আপনার পরমাশ্রয়, জীবন আমার কৃতার্থ হয়ে উঠুক।"

"হ্যাঁ, বৎস, তোমায় আমি মন্ত্র দেবো, সন্ন্যাস দেবো। আর দেরী ক'রো না। তাড়াতাড়ি গোদাবরীর পবিত্র নীরে তুমি স্নান সমাপন ক'রে এসো।"

দীক্ষা ও সন্ন্যাস সমাপ্ত হইয়া গেল।[১] গুরু তাঁর শিষ্যের নাম দিলেন রামদাস। কহিলেন, "বৎস, এখন থেকে শুধু নামেই রামদাস

---

১ এই গুরুর নামধাম আজো অজ্ঞাত। রামদাসের চিঠিপত্র, রচনা ও সংলাপ অজস্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, সর্ব্বত্রই তিনি গুরুর পরিচয় গোপন রাখিয়াছেন। হয়তো গুরুর নির্দ্দেশেই তাঁহাকে এই গোপনীয়তা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুকরণ, গুরুদত্ত মন্ত্র ও গুরুশক্তিকে রামদাস অপরিহার্য্য মনে করিতেন।

গবেষকেরা মনে করেন, রামদাসের গুরু ছিলেন একজন বিশিষ্ট রামাইৎ সাধু, তিনি রামানুজী বা রামানন্দী সাধক ছিলেন না। সাধ্য সাধন সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মত ও আদর্শ ছিল। অবতার রামচন্দ্রের তত্ত্ব এবং অদ্বৈত বেদান্ত, এই দুইয়ের সমন্বয় বাণী তিনি প্রচার করিতেন।

নও, কর্ম্মেও সতত করবে শ্রীরামচন্দ্রজীর দাসত্ব। নিজের আদর্শরূপে রাখবে মহাবীর হনুমানজীকে, মারুতী মহারাজকে। মহাশক্তিধর ছিলেন মারুতী, আর নিজের সর্ব্বশক্তি তিনি নিয়োজিত করেছিলেন অবতার পুরুষ রামজীর ধর্ম্মসংস্থাপনের মহান কর্ম্মে। কত দুষ্কৃতের বিনাশ করেছিলেন এই রামভক্ত, আর কত সাধুদের করেছিলেন রক্ষণ। বহিরঙ্গ জীবনে মারুতীজীর এই কর্ম্মসাধনা তুমি অনুসরণ করে চলবে। এই ভক্তবীরের অন্তর্লোকের সাধনতত্ত্বও তোমার অনুধাবন করা দরকার।"

"কৃপা করে, এ তত্ত্বটি বিশদ করে বলুন, মহারাজ।"

"মহাযোগী মারুতীর অন্তর্লোকে রামজী দীপ্যমান ছিলেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে। শ্রীরামচন্দ্রের এই অবতাররূপ আর সচ্চিদানন্দরূপ দুই-ই বিভাসিত ছিল রামভক্ত মহাসমর্থ মারুতীজীর সাধনজীবনে। এ কথাটি সব সময়ে স্মরণ রেখো, বৎস।"

গুরু মহারাজ সেদিন বিদায় গ্রহণ করিবেন। চরণতলে পতিত হইয়া রামদাস ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সস্নেহে গুরু কহিলেন, "বৎস, অধীর হ'য়ো না, ধৈর্য্য ধরো। পরমার্থ লাভ করতে হলে চারটি কৃপা চাই। এ চারটি হলো—গুরু কৃপা, আত্ম কৃপা, শাস্ত্র কৃপা ও ইষ্ট কৃপা। গুরু কৃপার দ্বার তোমার সাধনজীবনের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছে। এবার তোমার চাই আত্ম কৃপা, অর্থাৎ নিজের অনুষ্ঠিত কঠোর তপস্যা, যার ভেতর দিয়ে সর্ব্ব অহমিকা ও দেহবোধ যাবে লুপ্ত হয়ে।"

একটু থামিয়া আবার কহিলেন, "আর চাই শাস্ত্র কৃপা। শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ ভেতর থেকে উদ্ভাসিত হবে তোমার অন্তর সত্তায়। তারপর ইষ্ট কৃপার অবতরণ হতে দেরী হবে না, বৎস। তোমায় প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি—অচিরে তুমি সিদ্ধকাম হও। আমার

অদর্শনে খেদ ক'রো না। প্রয়োজনমত আবার এই পুণ্যধামেই তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে।"

গুরু পরদিনই পঞ্চবটি ত্যাগ করেন; সাধক রামদাসও শুরু করেন তাঁহার মরণ-পণ তপস্যা। দৈন্য ও কৃচ্ছ্রসাধন হয় তাঁহার এই তপস্যার বড় অবলম্বন। ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই, আকাশবৃত্তি নিয়া দিনাতিপাত করেন, ঈশ্বরের বিধানে যেদিন যেটুকু আহার্য্য উপস্থিত হয় তাহা দিয়াই করেন ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি।

মাথা গুঁজিবার একটি ঝুপড়ি বা পর্ণকুটিরও তাঁহার নাই। একমাত্র আশ্রয় বৃক্ষতল। গুরুর মত একফালি কৌপীন সম্বল করিয়া সেখানেই দিনরাত থাকেন, মাথার উপর দিয়া ঋতুর পর ঋতু গড়াইয়া যায়। শীত-গ্রীষ্ম সম্বন্ধে যেমন রামদাসের হুঁস নাই, তেমনি নাই বর্ষার ঝড় জলের নির্য্যাতনে বিন্দুমাত্র অসুবিধার বোধ। নবীন সন্ন্যাসীর এই ত্যাগ তিতিক্ষা, একনিষ্ঠা ও দুশ্চর সাধনা দেখিয়া পঞ্চবটির ভজনশীল প্রবীণ সাধকেরাও বার বার সাধুবাদ করিতে থাকেন।

অবশেষে রামদাসের সাধনা সফল হইয়া উঠে, ইষ্টদেব প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার নয়ন সমক্ষে। দিব্য আনন্দের রসতরঙ্গে সর্ব্বসত্তা তাঁহার প্লাবিত হয়, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া দেহখানি ভূমিতলে লুটাইয়া পড়ে।

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, গুরু মহারাজ তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট। চোখে মুখে তাঁহার আনন্দের আভা। স্নিগ্ধকণ্ঠে রামদাসকে তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি ভাগ্যবান, ইষ্টদর্শন তোমার হয়েছে, তপস্যার এক প্রধান ধাপ তুমি অতিক্রম করেছো।"

তাড়াতাড়ি ভূমিশয্যা ছাড়িয়া সাধক রামদাস উঠিয়া বসিলেন।

আনন্দাশ্রুধারায় স্নাত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন গুরু মহারাজের চরণতলে।

পরের দিন গুরুজী ভক্ত রামদাসকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার ইষ্টদর্শনের প্রাক্কালেই আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। তোমার সাফল্য দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি।"

"প্রভু, এসবই আপনার কৃপা। আপনার প্রদত্ত মন্ত্র সাধনই হচ্ছে আমার বড় সম্বল।" নিবেদন করেন রামদাস।

"না বৎস, তোমার সাধনার ঐকান্তিকতা আর কৃচ্ছ্র, তোমার দৈন্য আর আত্মাভিমানের বিলুপ্তি আমায় আনন্দ দিয়েছে। সাধনা ও আত্মশুদ্ধির বলে আত্ম-কৃপা তুমি পেয়েছো, শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বসমূহ স্ফুরিত হয়েছে তোমার সাধনসত্তায়। এবার সেই অনুভূত তত্ত্বকে শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নাও। আরো একটা কারণ আছে যে জন্য তোমায় শাস্ত্র পারঙ্গম হতে হবে।"

"বুঝিয়ে বলুন, মহারাজ।"

"রামদাস, তুমি রামজীর দাস সর্ব্বতোভাবে, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুইদিক দিয়ে। আশীর্ব্বাদ করি, অচিরে তোমার অন্তর্লোকে স্ফুরিত হোক প্রভু রামচন্দ্রের অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ। আর বাইরে তুমি অবতার শ্রীরামের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে তৎপর হও।"

"রামরাজ্য তো ত্রেতাযুগের প্রভু। এ যুগে তো তাঁর আসবার কথা নয়।" প্রশ্ন করেন রামদাস।

"বৎস, শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, পর-ব্রহ্ম। প্রতি যুগেই রয়েছে তাঁর অধিকার, রয়েছে তাঁর রাজ্যস্থাপনের কর্ম্মসূচী। নামে কি আসে যায়, রামদাস। রামরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য, এ যুগেও প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।"

"এ বৃহৎ ঐশী কর্ম্মে আমার মত ক্ষুদ্র মানুষকীটের কি করবার আছে, প্রভু?"

"ভুল করলে, রামদাস। তিনি মহাযোগী হনুমানজীকে যেমন নিয়োজিত করেছিলেন, তেমনি কি কাঠবেড়ালীর সাহায্যও নেন নি? তিনি আসছেন—তোমার আমার কাজ হচ্ছে, যে পথ দিয়ে তাঁর রথ আসবে সে পথকে কণ্টকমুক্ত করা।"

"এক্ষেত্রে আমার কি করার আছে?"

"শোন রামদাস, বিধর্ম্মীর অত্যাচারে জাতি পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। ধর্ম্মবুদ্ধি আজ বিলুপ্ত, নোংরা জঞ্জালে ভরা সর্ব্বস্থান। পরম প্রভুর আসন পাত্‌বার মত ঠাঁই কোথাও নেই। এ সঙ্কটে তুমি তোমার কাজ শুরু করো। মহারাষ্ট্র হোক তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। ধর্ম্মবোধ ও অধ্যাত্মশক্তিকে ভিত্তি করে জাগিয়ে তোল এ দেশটাকে।"

"প্রভু, ভাবছি, আমার মত কাঙাল অসহায় ব্যক্তি, কি করে এ কাজে এগোবে।" দৈন্যের সুরে বলেন রামদাস।

"বৎস, ভেবো না। আমি তোমায় বর দিচ্ছি, অচিরে ঋদ্ধি-সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। দেশের শক্তিধর রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই দেবে তোমার এ মহান কর্ম্মে সহায়তা।"

"নির্দ্দেশ দিন, প্রভু, কিভাবে এ কাজে আমি অগ্রসর হবো।"

"এ ঐশী কর্ম্মের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনেক, রামদাস। তাই এজন্য প্রস্তুতি দরকার। এই প্রস্তুতি ঐশী কর্ম্মেরই অঙ্গ ব্যতীত আর কিছু নয়। এখানে পঞ্চবটির ভীড়ে এ কাজ হয়ে উঠবে না। গোদাবরীর অপর তীরে তাকের্‌লীতে তুমি চলে যাও। সেখানে নির্জ্জনে বাস করো দশ বৎসর কাল। সমাপ্ত করো তোমার অবশিষ্ট সাধনা ও শাস্ত্র অনুশীলন। জনগণের ভেতর তোমায় কাজ করতে হবে, সেখানে শুধু ভক্ত ও প্রেমিক সাধক হলেই চলবে না, আচার্য্য হয়েই তোমায় বসতে হবে। এজন্য চাই অসামান্য শাস্ত্র ব্যুৎপত্তি। রামজীর কৃপায় ভক্তিশাস্ত্র ও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ দুইয়েতেই থাকবে তোমার অনায়াস অধিকার। যাও, বৎস, রামজীর উপর সকল ফলের আশা ছেড়ে দিয়ে, অনাসক্ত যোগীরূপে তুমি এখন থেকে বিরাজ করো।"

বার বার রামদাসকে উৎসাহিত করিয়া, অন্তরের গভীর আশীর্ব্বাদ জানাইয়া, গুরু মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তাকের্লীতে রামদাস একাদিক্রমে অবস্থান করেন প্রায় বারো বৎসর। এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া একদিকে অগ্রসর হন গুরু প্রদর্শিত নিগূঢ় যোগ সাধনার মার্গে—অপর দিকে আয়ত্তে আনিতে থাকেন জটিলতর শাস্ত্রতত্ত্ব।

পঞ্চবটির দুই মাইল দূরেই তাকের্লী। তন্বী স্রোতস্বিনী নন্দিনী এই স্থানটি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, অদূরে গিয়া পতিত হইয়াছে পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে। পিছনে রহিয়াছে একটি অনুচ্চ নির্জ্জন পাহাড়। এখানকার নৈসর্গিক সুষমা আর শান্ত পবিত্র আবহাওয়া হইতে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সহজে লাভ করা যায়। তাকের্লী পাহাড়ের এক প্রান্তে একটি পর্ণকুটিরে রামদাস অতিবাহিত করেন তাঁহার সাধনজীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায়।

অল্পকাল মধ্যে এই শাস্ত্রবিদ্ ভজনশীল সাধকের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নবাগত ভক্ত ও গুণমুগ্ধদের সহায়তায় বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রামদাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই সব গ্রন্থের অনুশীলন ও বিচার বিশ্লেষণের পর তিনি ব্রতী হন তাঁহার নিজস্ব ভক্তিবাদের ভিত্তি গঠনে।

বারো বৎসরের শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভক্তি সাধনা রামদাসের জীবনে আনিয়া দেয় বিপুল আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি। এবার গুরু নির্দ্দেশিত ঐশী কর্ম্মের উদ্‌যাপনের কথাও বার বার মনে পড়িতে থাকে। এই সময়ে একদিন ধ্যান সমাহিত থাকাকালে রামদাস আবার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন। দিব্য করুণাধারায় হৃদয়কুম্ভ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

ইহার অব্যবহিত পরেই আবার ঘটে গুরু মহারাজের আবির্ভাব।

স্নেহপূর্ণ স্বরে প্রিয় শিষ্যকে তিনি কহেন, "রামদাস, তোমার প্রস্তুতি-পর্ব্ব সমাপ্ত প্রায়। আর যেটুকু বাকী আছে তাও এবার শেষ করে ফেল। ঐশী কাজ শুরু করার আগে সারা দেশটাকে একবার ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নাও। পদব্রজে বেরিয়ে পড়ো, প্রধান তীর্থগুলো দর্শন করে এসো। এই সঙ্গে হৃদয়ে তোমার গ্রথিত হোক সারা ভারতের মর্ম্মন্তুদ বাস্তব চিত্র।"

অতঃপর একদল সন্ন্যাসী সঙ্গীর সহিত রামদাস পরিব্রাজনে বাহির হন। উত্তরে হিমালয়-তীর্থ কেদারবদরী হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণে রামেশ্বর ও সিংহল এবং পশ্চিমে দ্বারকা বৃন্দাবন হইতে শুরু করিয়া বারাণসী গয়া জগন্নাথধাম প্রভৃতি দর্শন করিয়া আবার পঞ্চবটিতে তিনি ফিরিয়া আসেন।

এবার শুরু হয় তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আচার্য্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রামাইৎ বৈষ্ণবধর্ম্মের এক নব সম্প্রদায় তিনি গড়িয়া তোলেন। রামদাসী সম্প্রদায় নামে তাহা খ্যাত হইয়া উঠে।

রামদাস ও তাঁহার ধর্ম্মান্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে হইলে তখনকার মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌পট জানিয়া নেওয়া দরকার। ইতিপূর্ব্বে প্রায় তিনশত বৎসর কাল দাক্ষিণাত্য মুসলমান অধিকারে ছিল। চৌদ্দ শতক হইতে সতের শতক কাল অবধি দেখা যায় আমেদনগর ও বিজাপুর এই দুইটি রাজ্য উত্তরাগত মুঘল শক্তির প্রতিরোধে ব্যস্ত। রামদাসের সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে মুঘল শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেদনগর; সম্রাট ঔরংজেব ইতিমধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ নগরটি দখল করিয়া নিয়াছিলেন।

মুসলমান রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অত্যাচার মারাঠার জন-জীবনে আনয়ন করে ঘোরতর অশান্তি ও উপদ্রব। হিন্দুদের

দেব-দেউলের উপর বিধর্মীদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না, সুযোগ পাইলেই দেববিগ্রহ তাহারা কলুষিত করিত, মঠ ও মন্দির করিত বিনষ্ট। ফলে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেয় হীনমন্য ও অসহায়ের মনোভাব। সামরিক সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিতে থাকে, ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়িয়া থাকে অনাবাদী অবস্থায়। আর দরিদ্র চাষীরা পতিত হয় ঘোর সঙ্কটে। সরকারী ও বেসরকারী স্তরে উৎকোচ ও অন্যান্য দুর্নীতি চলিতে থাকে অবাধে। সমাজ-জীবন তাই ধীরে ধীরে হইয়া উঠে পঙ্গু ও নৈরাশ্যবাদী।

সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে, মহারাষ্ট্রেও তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। মারাঠার দূর দুর্গম স্থানগুলিতে মুঘলশক্তি তেমন দৃঢ় হইয়া বসিতে পারে নাই, এই সব স্থানে হিন্দু জাগৃতির চিহ্ন দেখা যাইতে থাকে। এই নব জাগৃতির মুখপাত্র শিবাজী ভোঁসলে। অসাধারণ নেতৃত্ব শক্তি, সংগঠন প্রতিভা ও রণচাতুর্য্য ছিল এই নেতার। এই সঙ্গে ছিল ধর্ম্ম-ভিত্তিক হিন্দুরাজ্য গঠনের মহান পরিকল্পনা।[১] সিদ্ধপুরুষ রামদাসের অধ্যাত্ম-প্রেরণা শিবাজীকে যোগাইয়াছিল নূতনতর সঞ্জীবনী-শক্তি ও উদ্দীপনা।

স্বামী রামদাসের সমকালীন মহারাষ্ট্রে পন্ধারপুরের বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব বড় কম ছিল না। এই বৈষ্ণবেরা ছিলেন কৃষ্ণবিগ্রহ বিঠ ঠলজীর ভক্ত। অভঙ্ পদ কীর্ত্তন ও নাম প্রচারের মধ্য দিয়া মারাঠার জনজীবনকে অনেকাংশে ইঁহারা আত্মস্থ করেন, নূতনতর আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।[২]

---

১ রাণাডে: রাইজ অব্ দ্য মারাঠা পাওয়ার—পৃষ্ঠা ২৭-৩৪

২ অনেকের ধারণা, মারাঠী বৈষ্ণব ও সাধক কবিরা মারাঠার জাতীয় অভ্যুদয়ে কোন সাহায্য করেন নাই। তাঁহাদের দৈন্য ও ত্যাগ তিতিক্ষা বরং দেশবাসীকে হীনমন্য ও হীনবল করিয়াছে। কিন্তু রাণাডে তাঁহার 'রাইজ অব দ্য মারাঠা পাওয়ার' গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন—এ ধারণা ভিত্তিহীন, ঐ সব বৈষ্ণব কবিরাই বরং মারাঠী জাগৃতির ভিত্তি গড়িয়া তোলে। স্যর যতুনাথ, কিনকেড, রেভারেণ্ড এডওয়ার্ডস্ প্রভৃতি এক্ষেত্রে রাণাডের মতবাদের সমর্থক।

পন্ধারপুরের বৈষ্ণবদের প্রধান ছিলেন জ্ঞানেশ্বর। ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ তাঁহার অভ্যুদয় কাল। এই মহাপুরুষের লিখিত জ্ঞানেশ্বরী গীতায় যোগ ও ভক্তিবাদের সমন্বয় দেখা যায়। নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির উপর সাধক জ্ঞানেশ্বরের প্রভাব প্রচুর। জ্ঞানেশ্বরের পরে চতুর্দ্দশ শতকে আবির্ভূত হন নামদেব। তাঁহার ভক্তিবাদের ধারা মারাঠা হইতে শুরু করিয়া পাঞ্জাব অবধি বিস্তারিত হয়।

রামদাস এবং তুকারাম প্রায় সমসাময়িক। ঐতিহাসিক তথ্যাদি হইতে দেখা যায়, কর্ম্মক্ষেত্র ও বৈষ্ণবীয়তায় পার্থক্য থাকিলেও এই দুই মহাত্মা পরোক্ষভাবে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন। মারাঠার উজ্জীবনকে করিয়াছিলেন ত্বরান্বিত।

বারো বৎসর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারত পরিব্রাজনের পরে স্বামী রামদাস ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া আসেন। দেশের যে চিত্র এই পরিব্রাজনের মধ্য দিয়া তাঁহার নয়ন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয় তাহা মর্ম্মান্তিক। এই ধর্ম্মধৃত মহান দেশে ধর্ম্মবোধ সেদিন স্তিমিত। বিধর্ম্মীর প্রতাপের সম্মুখে দেশবাসী হারাইয়া বসিয়াছে তাহার আত্মবোধ, তাহার জাতীয় গৌরব। দেব-দেবীর মূর্ত্তি নানা স্থানে হইতেছে কলুষিত। সমাজ হইতে নীতিবোধ প্রায় লোপ পাইয়াছে। দারিদ্র্যের নির্য্যাতনও মানুষের মনুষ্যত্বকে কম অবনমিত করে নাই। এই পরিস্থিতিতে সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ তাঁহার মানসপটে জাগিয়া উঠিল। নিজ দেশ, লাঞ্ছিত পদদলিত মহারাষ্ট্রকে তিনি নির্ব্বাচিত করিলেন তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্ররূপে। নূতনতর উজ্জীবন ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য হইলেন কৃতসঙ্কল্প।

নানা স্থান পরিভ্রমণের পর সাতারা অঞ্চলকে রামদাস বাছিয়া নিলেন তাঁহার কাজের প্রধান ক্ষেত্ররূপে। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার কাছে—শস্য-শ্যামল নদী-উপত্যকার এক নয়নলোভন স্থান এই সাতারা। প্রাকৃতিক শোভায় ভরপুর। নদী, পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা এই অঞ্চলটিতে আসিয়া ভক্ত রামদাসের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া

উঠিল। পাহাড়ের বুকে বসানো, নিভৃতি ও শান্তির নীড়, ছাফল গ্রাম। পাদদেশ দিয়া ক্ষীণকায়া এক তটিনী কুলকুলুরবে বহিয়া চলিয়াছে। এই গ্রামটির একপ্রান্তে কিছুকালের জন্য স্থাপিত হইল স্বামী রামদাসের সাধন-আশ্রম।

আশ্রম তো করা গেল, কিন্তু আশ্রমের বিগ্রহ কই? ইষ্টদেবের বিগ্রহ স্থাপন না করা অবধি রামদাসের মনে শান্তি নাই।

অল্পকাল মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সেদিন গভীর রাতে ধ্যানাসনে বসিয়া স্বামী রামদাস এক অপূর্ব্ব নির্দ্দেশ পাইলেন। ইষ্টদেব রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস রামদাস, তোমার আশ্রম-মন্দিরে প্রবেশের জন্য যে আমি বহুকাল ধরে উৎসুক হয়ে আছি। তোমার স্নানের ঘাটের একপাশে নদীগর্ভে প্রোথিত রয়েছে আমার বিগ্রহ। কাল প্রত্যুষে এটিকে নদী থেকে উদ্ধার করো, স্থাপন করো তোমার আশ্রমে।"

শ্রীরামজীর এই প্রস্তরবিগ্রহ পরদিনই নদী হইতে উঠাইয়া আনা হইল। রামদাস পরম আনন্দে ইঁহার সেবা-পূজা শুরু করিলেন। কিছুদিন পর জাঁকজমক সহকারে মারুতীজীর একটি মূর্ত্তিও এখানে স্থাপন করা হয়।

ছাফলের আশ্রমে রামদাস একাদিক্রমে বেশী দিন বাস করেন নাই। ইহার পর শিবথর নামক একটি অতি-নিভৃত স্থানে তিনি উপনীত হন। লোকালয় বর্জ্জিত এই নির্জ্জন অঞ্চলে প্রায় দশ বৎসর কাল তিনি অবস্থান করেন। বিশিষ্ট জীবনীকার ও শিষ্যদের মতে, এই স্থানটিতেই সমাপ্ত হয় রামদাসের অধিকাংশ জনপ্রিয় ধর্ম্মসঙ্গীত ও তত্ত্বগ্রন্থের রচনা।

অতঃপর রামদাস আর নিভৃতি বা অবকাশ খুঁজিয়া বেড়ান নাই। বিপুল উদ্যম, কর্ম্মশক্তি ও সৃজনী প্রতিভা নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন ধর্ম্ম সংগঠনের কাজে, মারাঠার জনজীবনে তোলেন অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন।

রামদাসের ব্যক্তিত্ব, আচার আচরণ ও ধর্ম্মপ্রচার ছিল বড়ই আকর্ষণীয়। ভক্ত-শিষ্যগণসহ কৌপীনধারী এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর ভজন কীর্ত্তনে তাঁহার ধর্ম্মসভা জমজমাট হইয়া উঠিত। রামদাস একাধারে যেমন ছিলেন ভাবুক ভক্ত, কবি ও কীর্ত্তন গায়ক, তেমনি বেদ-বেদান্ত, পুরাণশাস্ত্র ও যোগ মার্গে ছিল তাঁর অনায়াস অধিকার। বিশেষ করিয়া তাঁহার ভজন, কীর্ত্তন ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের আশ্বাস বাণী শত-শত ভক্ত নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিত নব প্রেরণায়।

গ্রামের উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকলেই পরম উৎসাহে ভীড় করে রামদাসের ধর্ম্মসভায়। তাঁহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে ঘিরিয়া নানা স্থানে গড়িয়া উঠিতে থাকে সুসম্বদ্ধ ভক্তগোষ্ঠী। ভাবাবেগের বন্যা উৎসারিত করিয়া, ভক্তদের হাসাইয়া কাঁদাইয়াই কিন্তু রামদাসের কর্ত্তব্য শেষ হইত না। অসামান্য গঠন-প্রতিভা বলে অল্পকাল মধ্যে ভক্তদের নিয়া তিনি স্থাপন করিতেন এক একটি মঠ বা সাধন কেন্দ্র। ইষ্টদেব রামচন্দ্র আর মহাযোগী মারুতীজীর মূর্ত্তির পূজা হইত সেখানে সাড়ম্বরে। এইভাবে এই মঠগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বহিয়া চলে নব ভক্তিধর্ম্মের স্রোতধারা।

গুরুজী রামদাসকে বর দিয়াছিলেন, ঋদ্ধি-সিদ্ধি দুই-ই তাঁহার করায়ত্ত হইবে। এবার সে বর ফলিয়া উঠিতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রামদাসী রামাইৎ সম্প্রদায়কে মহারাষ্ট্রের নানা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। মঠ-মন্দিরও নির্ম্মিত হয় অজস্র সংখ্যায়। সহস্র সহস্র মারাঠীর দৃষ্টিতে রামদাস গণ্য হন রামজীর শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে, মহাবীর মারুতীজীর অবতার রূপে।

রামদাসের জীবনসাধনায় ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই তিনটির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। অবতার পুরুষ রামচন্দ্রের উপাসনা ও অর্চ্চনার কথা তিনি সারা জীবন ভরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আজো ষোড়শোপচারে এই ইষ্টদেবের পূজা তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রচলিত।

আবার প্রভু রামজীকেই তিনি স্থাপন করিয়াছেন পরম ব্রহ্মরূপে। সে স্থলে দেখা যায়, অদ্বৈতবাদের তত্ত্বও তিনি নিষ্ঠাভরে বিশ্লেষণ করিতেছেন। রামরাজ্য অথবা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনার যে মহান ব্রত তিনি গ্রহণ করেন তাহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে ঐশী কর্ম্ম উদ্‌যাপনের আন্তরিক প্রয়াস। তাঁহার রচিত ভক্তিসঙ্গীত ও ধর্ম্মগ্রন্থগুলিও সেদিনকার জনজীবনে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রের পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়া ও ভক্তি-সাধনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, নামদেব, প্রভৃতি মহাত্মাগণ ছিলেন এই ভক্তিধারার উৎস। মহারাষ্ট্রের প্রতি জনপদে ইঁহাদের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তাই রামদাসও এই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার ভক্তির আন্দোলন ছিল পন্ধারপুর হইতে অনেকটা পৃথক। বিঠ্ ঠলজী বা কৃষ্ণবিগ্রহ তাঁহার ইষ্ট নয়, তাঁহার ইষ্ট হইতেছেন রামচন্দ্র। অবতাররূপী এই রামজীর পূজা ও তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই নিরন্তর তিনি করিয়া গিয়াছেন, আর রামজীর মধ্য দিয়াই সাধন জীবনের শেষে পৌঁছিতে চাহিয়াছেন সত্যম-শিবম-অদ্বৈতম-এ, —অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞানে।

রামদাসের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের উপর তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। মনে হয়, তাঁহার রামাইৎগুরু ভক্তিবাদী হইয়াও অদ্বৈতবেদান্তে পারঙ্গম ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব শিষ্য রামদাসের উপর পতিত হয়। তখনকার দিনে শৃঙ্গেরী মঠের বহু সাধক অদ্বৈতবেদান্তী হইয়াও রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। এমনও হইতে পারে, ইঁহাদের কাহারো সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার পর রামদাসের মধ্যে রামভক্তি ও অদ্বৈতবাদের এই সমন্বয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাকের্‌লী ও ছাফলের নির্জ্জন আবাসে থাকার কালে রামদাস দীর্ঘকাল গভীরভাবে বেদান্ত, জ্ঞানেশ্বরী-গীতা ও যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ অধ্যয়ন করেন। স্বভাবতই এই সব গ্রন্থের

জ্ঞানমার্গীয় তত্ত্ব তাঁহার অধ্যাত্মজীবনে দৃঢ়রূপে প্রবিষ্ট হয় এবং উত্তর জীবনে তাঁহার ভক্তিবাদ অদ্বৈতবোধের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

অধ্যাত্ম-জীবনের উপাদান রামদাস যেখান হইতেই আহরণ করুন, নিজ মতবাদ ও তত্ত্বাদর্শকে তিনি যে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতে সক্ষম হন, প্রধানতঃ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই যে এই রামভক্তিবাদের পরমতত্ত্ব বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই!

দার্শনিক ব্যাখ্যা অথবা তত্ত্ববাদ সম্পর্কে রামদাস যাহাই বলুন ব্যবহারিক জীবনে, জনসাধারণের আচার্য্য ও উপদেষ্টারূপে তিনি রামভক্তি ও রাম উপাসনার উপরই বেশী জোর দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের মঠ মন্দিরে ভক্তি সাধনা, পূজা অর্চ্চনা ও নাম-কীর্ত্তনের প্রাধান্যই বেশী চোখে পড়ে। তাঁহার অজস্র ভক্তিগাথায় রহিয়াছে ইষ্টের কৃপাভিক্ষা, শরণাগতি ও অনুশোচনার আকুতি। করুণাষ্টকের একটি পদে সাধক কবি রামদাস প্রভুর চরণে সখেদে নিবেদন করিতেছেন ঃ

হে রাম, নিতি নিতিই যে হৃদয় আমার
যাচ্ছে জ্বলে অনুতাপের দহনে।
ঘোর চঞ্চল আমার এই মন,
আমি পারছিনে তাকে বশে রাখতে।
হে প্রভু, হে করুণাময়,
ছিঁড়ে ফেলো আমার এই মায়ার বন্ধন,—
যা সৃজন করে মরীচিকার মোহ।
এসো, এসো, আমার হৃদয় কুটিরে,
তোমা-হারা জীবনে এসেছে অবসাদের শূন্যতা,
তোমার আরাধনা বিনা কেটেছে মোর দিন,
বন্ধুজন আর বিত্তবিভবের মাঝে
নিজেকে হারিয়েছি ঈর্ষা আর স্বার্থান্ধতায়।

হে রঘুপতি, হে করুণাময়,
দাও আমায় তোমার মনের উদারতা,
যেন অক্লেশে বিলিয়ে দিতে পারি আমার সর্ব্বস্ব—
একান্ত বিশ্বাসে নিতে পারি তোমার চরণে ঠাঁই।
ইন্দ্রিয়ের সেবায় কি করে পাবো পরমানন্দ ?
হে রঘুনাথ, তোমা বিনা
আমি যে হয়েছি রিক্ত, হতভাগ্য।
হে প্রভু তাই আশিস্ মাগি চরণে—
জীবন যেন মোর হয় ব্রহ্মময়।[১]

অপর একটি সংবেদনময় প্রার্থনায় রামদাস তাঁহার শরণাগতি জানাইতেছেন ঃ

হে প্রভু, কোটি কোটি জনম ধরে
হৃদয় আমার যাচ্ছে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে
তাইতো হে কৃপালু রাম চাইছি তোমায়,
বন্যার বিপুল প্লাবনে ছড়িয়ে পড়ো আমার বুকে।
ছয়টা শত্রু ভেতর থেকে করছে প্রতিরোধ—
ভেঙ্গে চুরে দাও, ভাসিয়ে দাও তাদের।
হে রাম, তুমি বিনা কেই বা আছে আমার ?
কেই বা জানে আমার মর্ম্মভেদী দুর্দ্দশার কথা ?
হে রাঘব, শ্রান্ত ক্লান্ত আমি সাধন সমরে
এসো, এসো প্রভু করো আমায় পরিত্রাণ।

আবার প্রাপ্তির পরমানন্দে উচ্ছল হইয়া দাস রামদাসকে আর একটি অভঙ্ পদে বলিতে শুনি ঃ

হে দয়াল রঘুনাথ, হে আমার প্রভু,
কত পাপই যে করেছি এ জীবনে—
তার কোনটিই বা পায়নি তোমার ক্ষমা ?

১ উইলবার এস ডেমিং ঃ রামদাস অ্যাণ্ড রামদাসীজ, পৃঃ ৩২ ; ৯০-৯৫,

গুণরাশি তোমার খচিত রয়েছে
অসীম আকাশে সংখ্যাতীত নক্ষত্রের মত—
তার কোনটি রাখা যায় স্মৃতিপটে ?
কি করেই বা শুধ্‌বো তোমার অপার ঋণ ?
দীনের শরণ তুমি প্রভু, তুমি পরমাগতি—
আর এই পরিচয়ই যে তোমার আসল পরিচয়।
সুখ দিয়েছো তুমি, পরম সুখও চাই তোমার কাছে,
এই কাঙালের যা কিছু আছে চাওয়া আর পাওয়া
সবই যে তোমার জানা।
অন্তর যে আমার দিয়েছো দানে ভরে
হে প্রভু, হে রঘুনাথ, বলতো এ অভাগা—
কি দিয়ে শুধবে তোমার ঋণভার ?

রামদাসের প্রধান গ্রন্থ 'দাসবোধ' তাঁহার অনুগামীদের কাছে গীতার মত নিত্য পাঠ্য। এই গ্রন্থে ও অন্যান্য রচনায়[১] রামদাস ভক্তিমার্গের সাধককে শ্রবণ, স্মরণ, অর্চ্চনা প্রভৃতি নয় প্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। গুরুসেবা নামজপ ও নামকীর্ত্তনের উপর রামদাসকে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে দেখা যায়। তাঁহার মতে ভক্তি মুক্তির মূলে রহিয়াছে সদ্‌গুরুর কৃপা। সদ্‌গুরুই আপন শক্তিবলে শিষ্যের অধিকারকে পরিশুদ্ধ করেন, প্রস্তুত করেন

---

১ সমর্থ রামদাস স্বামীর প্রধান রচনাগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইতেছে :

(১) দাসবোধ—৭৭৫২ কবিতা সম্বলিত এই গ্রন্থটিকে রামদাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মান করিয়া বলে 'গ্রন্থরাজ'। (২) শ্রীশ্লোক মনাচে—মনকে বশে রাখার উপদেশ এই পদগুলিতে নিহিত। সাধুরা ভিক্ষা করার সময় এগুলি গাহিয়া থাকেন। (৩) করুণাষ্টকে—অনুশোচনা ও প্রার্থনায় ভরা এই সমস্ত শ্লোক সান্ধ্য ভজনের সময় গীত হয়। (৪) রামদাসের রামায়ণ (সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড)। (৫) শতক পঞ্চক ও ভূপালী নামক প্রার্থনামূলক অভঙ্‌পদ।

তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য। তিনি বলেন, গুরু সেবার মধ্য দিয়া শিষ্যের অহমিকা যেমন ক্ষীণ হইয়া আসে তেমনি নামিয়া আসে গুরুকৃপার অমিয়ধারা।

নামজপ ও কীর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা শ্রীশ্লোক মনাচে-তে তিনি বলিয়াছেন ঃ

হে মন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে এই নামকে করো না ত্যাগ,
শ্রদ্ধাভরে নিরন্তর করো এর অনুধ্যান।
যা কিছু দেখছো এই প্রপঞ্চে,
সবই রয়েছে বিধৃত, প্রভুর নামের বলে।
কোন কিছুরই হয়না তুলনা এর সাথে।

আপন ইষ্টনাম, রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্ত সাধক রামদাস প্রেমভরে কহিতেছেন ঃ

ভজন ও জপের নাম তো রয়েছে অনেক,
কিন্তু ভাই রামনামের তুল্য কোন্ নাম ?
হীন আর দুর্ভাগা যারা
কি করে জানবে তারা এই পরম বস্তুর মহিমা ?
বাসুকীর হলাহল পান করে
পার্ব্বতীনাথ শঙ্কর জপেছিলেন এই মহানাম,
হয়েছিলেন তিনি মৃত্যুঞ্জয়—
তবে ছার মনুষ্য কেন করবেনা জপ
আমার প্রভুর এই অমৃতময় নাম ?

ভক্তি-মার্গীয় সাধনার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বহুতর মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন রামদাস স্বামী। এইসব মঠকে তিনি পরিণত করেন তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের এক একটি সুদৃঢ় ঘাটিরূপে। ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিলেও রামদাস অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় কখনো দেন নাই। রামচরিত্রের সংযম, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতাকে সতত তিনি

ভক্তদের নয়ন সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেন। মঠ ও মন্দিরের মোহান্ত বা পরিচালকদের করিতেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ। একবার তাঁহার এক মঠের মোহান্ত নীতিবিগর্হিত কোন কাজ করেন। রামদাস এজন্য তাঁহার শাস্তিবিধান করেন—বেত্রাঘাত। অপর একজন মঠাধীশ উপযুক্ত প্রস্তুতির আগেই তাঁহার এক অনুগত ভক্তকে মন্ত্র প্রদান করেন। দীক্ষার আগে কেন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই, এই দোষে রামদাস মঠাধীশকে কঠোরভাবে প্রহার করেন। কয়েকটি বিশিষ্ট কীর্ত্তনিয়া শিষ্যকে একবার তিনি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সঙ্গ করিতে দেখিতে পান। কীর্ত্তনসভা হইতে ইহাদের তিনি তিন বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রামদাসের মঠ-মন্দিরের এই নীতিগত আদর্শবাদ ও নিয়মশৃঙ্খলা মারাঠার পুনর্গঠনে ও আত্মিক শক্তির উজ্জীবনে কম সাহায্য করে নাই।

আচার্য্য জীবনের শুরু হইতেই রামদাসের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন একদল সৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ শিষ্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রহিয়াছেন—কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ (রামদাসের ভ্রাতা), উদ্ধব গোসাবি, দিবাকর, বেনাবাঈ, আকাবাঈ প্রভৃতি।

শিষ্য কল্যাণ শুধু ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনার দ্বারাই গুরুর অনুগ্রহলাভ করেন নাই, ডোমগাঁও মঠে রামদাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান মঠ স্থাপন করিয়া গুরুর আরব্ধ মহান কার্য্যকে তিনি অনেকাংশে সফল করিয়া তোলেন।

কল্যাণ ছিলেন রামদাসের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত পরিকর। তাঁহার গুরুভক্তির একটি আখ্যায়িকা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। রামদাস মাঝে মাঝে নানা অভিনব উপায়ে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদের ভক্তির দৃঢ়তা ও আনুগত্যের পরীক্ষা নিতেন।

একদিন শিষ্যদের তিনি নিকটে ডাকিলেন। হাতে একটি তরবারি নিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “ত্যাখো, আজ থেকে কেউ আর আমায় ভোরবেলার ধ্যানজপের পর যেন প্রণাম ক’রো না। যে

করবে, আমি তার মস্তক ছেদন করবো। রামদাস কোন মানুষের সঙ্গই যেন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সকলেই মহা শঙ্কিত। স্বামীজী মহারাজকে তাঁহারা যতটা পারেন এড়াইয়া চলিতেছেন।

কয়েকদিন পরে রামদাস আশ্রম ত্যাগ করিলেন। পরনে মাত্র একখানি কৌপীন, হাতে একটি তীক্ষ্ণ তরবারী। এই বেশে প্রবেশ করিলেন নিকটস্থ অরণ্যে। যাইবার সময়ে শাসাইয়া গেলেন, "সাবধান, কেউ যেন আমার এই নির্জ্জনবাসের সময় আমার সামনে না যায়, আর আমার চরণ কেউ স্পর্শ না করে।"

আশ্রমিকরা তো ভয়ে জড়োসড়ো। কেহই তাঁহার সঙ্গ নিতে সাহসী হইলেন না। চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গেল, স্বামী রামদাস পাগল হইয়া গিয়াছেন। একথা অচিরে স্বামীজীর শিষ্য ডোমগাঁও-এর মহান্ত কল্যাণের কানে গেল। তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আশ্রমে। কহিলেন, "এ কেমনতরো কথা? স্বামীজী মহারাজ একলা অরণ্যে বাস করছেন, আর তোমরা কেউ তাঁর সঙ্গে গেলে না? আমরা থাকতে তাঁর সেবার ব্যবস্থা হবে না? বেশ, তোমরা না যাও আমি যাবো সেখানে।"

"কিন্তু ভাই, খোলা তলোয়ার নিয়ে স্বামীজী বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ প্রণাম করতে গেলেই নিশ্চয় হবে তার শিরশ্ছেদ।" আশ্রমের একজন সতর্ক করিয়া দেয়।

কল্যাণ উত্তরে বলেন, "বেশ তো, গুরু মহারাজের সেবায় এগিয়ে যদি তাঁর হাতে আমার প্রাণ যায়, তবে তা হবে আমার পরম সৌভাগ্য।"

আত্ম বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন কল্যাণ। রক্ত-চন্দন ললাটে লেপন করিলেন, মুখে গুঁজিয়া দিলেন পর্ণপত্র, তারপর গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন করজোড়ে।

রামদাস স্বামী প্রথমে রোষ-কষায়িত নেত্রে, ক্রুদ্ধস্বরে বেশ খানিকটা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলেন, বার বার আন্দোলিত করিলেন

তাঁহার তরবারি। কল্যাণ কিন্তু নির্ব্বিকার। গুরু উন্মাদই হোন আর যা-ই হোন, তিনি তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিবেনই, তাঁহার সেবায় হইবেন তৎপর।

মুহূর্ত্তমধ্যে রামদাস মহারাজের ক্রোধের অভিনয় বন্ধ হয়। হাতের তলোয়ার দূরে নিক্ষেপ করিয়া পরম স্নেহে কল্যাণকে করেন আলিঙ্গন। ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে কহেন, "বৎস, তোমার মত বীর, আত্মোৎসর্গে সদা প্রস্তুত শিষ্যই যে আমার চাই। তাছাড়া কি করে হবে প্রভু রামজীর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ?"

নীলোপন্থ নামে রামদাসজীর এক গৃহী শিষ্য ছিলেন। একবার পরিব্রাজনের পথে ভক্ত সঙ্গে স্বামীজী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। নীলোপন্থ তখন গ্রামের বাহিরে কি কাজে গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী নিরুবাঈ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিলেন। স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য তাড়াতাড়ি কিছু ভোজনের ব্যবস্থা করা চাই। এ অঞ্চলে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ঝড়-জল হইয়া গিয়াছে, ঘরে জ্বালানী কাঠ এক টুকরাও অবশিষ্ট নাই। অথচ স্বামীজী মহারাজকে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা যাইবে না, এখনি গ্রামান্তরে যাইবার জন্যে তিনি তাড়া লাগাইতেছেন।

নিরুবাঈর মাথায় জ্বালানীর এক বিকল্প বাহির হইল। তৎক্ষণাৎ নিজের তোরঙ্গ খুলিয়া জামা কাপড় শাড়ী ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি স্তূপীকৃত করিলেন, ঢুকাইয়া দিলেন উনুনে। জ্বালানীরূপে এগুলি ব্যবহার করিয়া পরমানন্দে প্রস্তুত করিলেন স্বামীজীর আহার্য্য।

কিছুকাল পরেই নীলো পন্থ ঘরে ফিরিয়া আসেন। স্বামীজী মহারাজকে গৃহে পাইয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। বিদায় কালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ভক্তিভরে গুরুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, এমন সময় রামদাসজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "নীলো পন্থ, তুমি ভাগ্যবান, এমন সাধ্বী স্ত্রী তোমার ঘরে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে ছাখো, আমার আহার্য্য তৈরী করতে গিয়ে মাতাজী নিরুবাঈ তোমাদের

মূল্যবান পরিচ্ছদ সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। ভালোই করেছে, প্রপঞ্চের মায়া কিছু কেটেছে।"

নীলোপন্থ তো মহা খুশী। যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, শত শত ভক্ত শিষ্য আপনার সেবার জন্য প্রাণপাত করছে। নিরুবাঈ সে তুলনায় তেমন কি আর করেছে? যাক্, যাবার আগে আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আপনার আশীর্ব্বাদই যে হবে আমাদের পরম পাথেয়।"

ঝুলি হইতে রামদাসজী একটি ডাব তুলিয়া নিলেন, নীলোপন্থের হাতে এইটি দিয়া কহিলেন, "বৎস, নাও, এই রইলো আমার আশীর্ব্বাদ। আমি জানি দীর্ঘদিন তোমরা অপুত্রক রয়েছো। আমার বরে মাতাজী নিরুবাঈর কোল জুড়ে আসবে একটি শিশুপুত্র। প্রভু রামজীর প্রতি থাকবে তার অচলা ভক্তি।"

অতঃপর সঙ্গীগণ-সহ স্বামীজী মহারাজ ধীরে ধীরে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যথাকালে নিরুবাঈ একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। উত্তরকালে এই পুত্র রামদাস মহারাজের কাছে দীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হয়।

কল্যাণের গুরুভক্তির আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সেবার রামদাস মহারাজ স্থির করিলেন, কিছুদিনের জন্য নির্জ্জনবাসে যাইবেন এবং একটি নিগূঢ় সাধনা সেখানে সমাপ্ত করিবেন। নদীর ওপারে রহিয়াছে এক দূর বিস্তারী অরণ্য, ইহারই এক কোণে পর্ণকুটির বাঁধিয়া স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন।

কয়েকদিন পরেই ডোমগাঁও হইতে কল্যাণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরুদেবের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তিনি তো মহা চিন্তিত। বুঝিলেন, একান্তে সাধনভজন তাঁহার হয়তো ঠিকই চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিত্যকার আহার্য্যের ব্যবস্থা কি? এজন্য নিশ্চয় তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইতেছে।

কল্যাণ স্থির করিলেন, এখন হইতে কিছুদিন একবার করিয়া

তিনি নদীর ওপারে স্বামীজীর ধ্যানকুটিরে যাইবেন, নিত্যকার খাবার দিয়া আসিবেন।

আগের দিন রাত্রে এ অঞ্চলে বর্ষার ঢল নামিয়াছিল। আশ্রমের সম্মুখস্থ ময়না নদী তাই স্ফীতকায়া হইয়া উঠিয়াছে, স্রোত বহিয়া চলিয়াছে খরবেগে। গুরুগতপ্রাণ কল্যাণ মোটেই দমিবার পাত্র নন। আহার্য্যের পাত্র মাথায় বাঁধিয়া নিলেন। তারপর, জয় জয় রঘুবীর, জয় সমর্থ রামদাস স্বামী, বলিয়া বর্ষা-প্লাবিত নদীগর্ভে দিলেন ঝাঁপ। ওপারে গিয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পর গুরুজীর সন্ধান পান, সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমাপ্ত করান তাঁহার ভোজন। রামদাসজীর অরণ্যবাসের প্রতিটি দিন কল্যাণকে এই খরস্রোতা বিপজ্জনক নদী সাঁতরাইয়া পার হইতে হয়।

হনুমন্ত স্বামীর রামদাস-চরিতে সমর্থ রামদাস স্বামীর বহুতর যোগবিভূতির বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাদের একটি শিষ্য-প্রধান কল্যাণ সম্পর্কিত।

সেদিন গভীর রাত্রি অবধি স্বামীজী মহারাজ কতকগুলি অভঙ্-পদ রচনা করিয়াছেন। শিষ্য-সেবকদের অনেকেই তখন নিদ্রায় অভিভূত। পান-সুপারী চর্ব্বণের অভ্যাস তাঁহার বরাবরই ছিল। সেবকদের ডাকিয়া তুলিয়া কহিলেন, "ছাখো তো কৌটার ভেতরে পান-সুপারী আছে কিনা। খানিকটা না চিবুতে পারলে ভালো লাগছে না।"

খুঁজিয়া দেখা গেল, কৌটায় সুপারী যথেষ্টই আছে কিন্তু পান একটিও নাই। "পান ছাড়া শুধু সুপারী কি ক'রে খাওয়া যায়—" এই বলিয়া রামদাস মহা হৈ-চৈ তুলিয়া দিলেন।

এত রাত্রে পাহাড়ে পান কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি সংগ্রহ করিতেই হয়, নীচে নামিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে যাইতে হইবে, যদি কোন গৃহস্থ বাড়ীতে সন্ধান মিলে। সেবকেরা সবাই এ উহার মুখ চাহিতেছেন, কিন্তু কল্যাণ তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করজোড়ে

কহিলেন, "প্রভু আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি নীচের গ্রাম থেকে এখনি কয়েকটি পান সংগ্রহ করে আনছি।"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার পাহাড়ী পথ দিয়া তিনি দ্রুত-পদে নীচে নামিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরেই শোনা গেল কল্যাণের আর্ত্ত চীৎকার। একটি মিশ কালো কেউটে সাপের গায়ে পা দিতেই তৎক্ষণাৎ উহা তাহাকে ছোবল মারিয়াছে। রামদাস ও শিষ্য সেবকেরা মশাল নিয়া তখনি সেখানে ছুটিয়া গেলেন। সর্পদষ্ট কল্যাণ তখন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। চোখে মুখে অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ। মুখ দিয়া অবিরাম ফেন নির্গত হইতেছে।

রামদাস হাঁটু গাড়িয়া শিষ্যের সম্মুখে বসিয়া পড়েন। অস্ফুট স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার বার কল্যাণের দেহে করেন কর-সঞ্চালন, তারপর স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে থাকেন, "বৎস কল্যাণ, এবার ওঠো—ওঠো।"

অল্পকাল মধ্যেই কল্যাণ চোখ মেলিয়া চান এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া বসেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া আবার উদ্যত হন গুরু মহারাজের পান সংগ্রহের জন্য।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে শিষ্যের দিকে চাহিয়া গুরুজী বলেন, "বৎস, আর তোমায় কোথাও যেতে হবে না। এবার আশ্রমে ফিরে চল।"

পথ চলিতে চলিতে একটি তরুণ শিষ্য মৃদুস্বরে মন্তব্য করেন, "এত গভীর রাতে, এভাবে একলা এমন করে চলে আসাটা কল্যাণের উচিত হয় নি।"

রামদাস স্বামী সহাস্যে উত্তর দেন, "ভ্যাখো, যা ঘটেছে রামজীর কৃপাতেই ঘটেছে। আমরা নিমিত্ত মাত্র। রামজী আমায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কল্যাণের আয়ু আর নেই।"

"সেকি প্রভু, তা জেনেও আপনি এই অন্ধকারের ভেতর বনপথে ওকে যেতে দিলেন ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন এক সেবক।

"সর্পাঘাতে ওর জীবনান্ত হবার কথা। অথচ ঈশ্বরের কাজে ওকে অনেক কিছু করতে হবে। তাইতো পান-সুপারীর জন্য চেঁচামেচি করে ওকে পথে নামালাম। কালসাপ ওকে দংশন করবে তা আমি জানতাম। আমার কাছাকাছি থাকা কালে এই দুর্ঘটনা হয়ে ভালই হলো। রামজীর কৃপায় ওকে বাঁচাতে পারলাম।"

রামদাস স্বামীর অন্যতম জীবনীকার ভীমস্বামী শিরগাভ্‌কার একটি মনোরম আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন—

সেবার বারাণসীর এক প্রখ্যাত পণ্ডিত ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাষ্ট্রে উপনীত হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিচার-মল্ল, যেখানেই যান সোৎসাহে সাধুদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। আত্মবিশ্বাস ইঁহার অত্যন্ত বেশী। সদাই গলদেশের উপবীতের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝুলানো থাকে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা, দম্ভভরে এটি সবাইকে দেখাইয়া বলেন, "শাস্ত্র বিচারে যখনি কেউ আমায় পরাস্ত করবে, তক্ষুনি তার সম্মুখে এই ছুরিকা দিয়ে নিজের হাতে আমি কেটে ফেলবো আমার জিহ্বা।"

মহারাষ্ট্রে লোকের ঘরে ঘরে তখন রামদাস স্বামীর 'দাসবোধ' পঠিত হয়, স্বামীজীর বিদ্যাবত্তা ও সাধন-বিভূতির প্রসিদ্ধিও নবাগত পণ্ডিতটি শুনিয়াছেন। একদিন তিনি সদলবলে ছাফলে আসিয়া উপস্থিত। সংবাদ দিলেন, স্বামীজীর সহিত অবিলম্বে তিনি তর্কদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে চান।

রামদাস ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শিষ্যদের কহিলেন, "যাও, যাও, এখনি তোমরা ঐ মহাত্মাকে সসম্মানে আশ্রমে নিয়ে এসো। মশাল আর বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে নিতে ভুলো না। বারাণসীর এমন কৃতী পণ্ডিত! দেখো, কোন দিক দিয়ে যেন তাঁর অমর্যাদা না হয়?"

সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়া বারাণসীর তর্কশূরকে আশ্রমে

আনয়ন করা হয়। রামদাস স্বামী স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু স্বামীজীর অভিবাদনের দিকে পণ্ডিতের কোন লক্ষ্যই নাই। দর্পভরে কহেন, "আমার সময় অতি মূল্যবান। আর বিলম্ব না করে, আপনি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন, অবশ্য যদি সমর্থ হন।"

রামদাস সহাস্যে কহিলেন, "বিদ্যা মানেই সেই পরমবস্তু যা হৃদয় কন্দরকে আলোকিত করে। তবে শাস্ত্রপারঙ্গম হয়েও আপনি এমন অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন কেন, বলুন তো?"

রোষে পণ্ডিতের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠে, হুঙ্কার দিয়া বলেন, "বটে, এতো ঔদ্ধত্য তোমার? এখানে কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছো, জানো?"

"খুব জানা আছে, পণ্ডিতবর। এবার একটু অনুগ্রহ করে আপনি আপনার শাস্ত্রতত্ত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করুন, যথাযথ সব উত্তর এখনি পাবেন।" সবিনয়ে নিবেদন করেন রামদাস।

ক্রুদ্ধ উত্তেজিত পণ্ডিত তাঁহার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী রামদাস প্রদর্শন করিলেন তাঁহার এক যোগবিভূতি। বহুলোক তাঁহাদের সম্মুখে ভীড় করিয়া আছে। এই ভীড়ের ভিতর হইতে একটি নিম্নশ্রেণীর অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষকে রামদাস কাছে ডাকিলেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার মধ্যে করিলেন শক্তি সঞ্চালন। এবার দৃঢ় কণ্ঠে দিলেন নির্দ্দেশ, "বৎস, পণ্ডিতজীর সব ক'টা শাস্ত্রীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তুমি দিয়ে দাও।"

সর্ব্বসমক্ষে ঘটিতে দেখা যায় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। অর্দ্ধশিক্ষিত লোকটির মুখ দিয়া অবিরলধারে নিঃসৃত হইতে থাকে শাস্ত্রের নানা দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বারাণসীর পণ্ডিত মহারাজ তো বিস্ময়ে হতবাক্। ইতিমধ্যে তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, রামদাস এক সিদ্ধ মহাত্মা। অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অলৌকিক শক্তির তিনি

অধিকারী। এ হেন ব্যক্তির সমক্ষে বিদ্যার দম্ভ প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত মারাত্মক ভুল করিয়াছেন।

রামদাসের চরণে পতিত হইয়া বার বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিতে থাকেন। নিজের জিহ্বা কর্ত্তনের জন্যও উদ্যত হন।

উপবীতে ঝুলানো ছুরিকাটি তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া রামদাসজী পণ্ডিতকে কহিলেন, "আপনাকে অনেক আগেই আমি ক্ষমা করেছি পণ্ডিতবর। মনে রাখবেন, আপনার জিহ্বা, আপনার দেহ, সবই রামজীর। ছেদন করতে হয় তিনি করবেন। আপনার দেহ-মন-আত্মা কোন কিছুর ওপরই তো আপনার অধিকার নেই। ভালোই হলো, আপনার দর্প এবার ভূমিসাৎ হলো, এবার সত্যকার বিদ্যা এলো আপনার আধারে।"

এই পণ্ডিত অতঃপর দীনভাবে রামদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বারাণসীতে ফিরিবার সময় সাগ্রহে রামদাসের রচনা দাসবোধের একটি প্রতিলিপি তিনি সঙ্গে নিয়া যান।

সিদ্ধপুরুষ বলিয়া রামদাসের তখন খ্যাতি রটিয়াছে, একটি সুসম্বদ্ধ ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের নেতা রূপেও মহারাষ্ট্রে তাঁহার বিরাট মর্য্যাদা। এই সময়ে এক শুভলগ্নে রামদাসের সহিত মিলন ঘটে রাজা শিবাজী ভোঁসলের। এই মিলন যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ। রামরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য, স্থাপনের যে স্বপ্ন রামদাস এতদিন দেখিয়া আসিতেছেন, যে স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, রাজা শিবাজী হন সেই মহান ঐশী কর্ম্মের ধারক ও বাহক। এই দুইয়ের মিলনে সারা মারাঠায় প্রবাহিত হয় আত্মিক শক্তি ও ক্ষাত্রশক্তির যুগ্মধারা। সারা ভারতেও ইহার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এক ও অখণ্ড ধর্ম্মরাজ্যের পরম সম্ভাবনার আশা ছড়াইয়া পড়ে দেশের দিকে দিকে।

শিবাজীর অভ্যুদয়ের দিকে স্বামী রামদাস নিয়ত তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। লক্ষ্য করিয়াছেন ঔরংগজেবের নগণ্য 'পার্ব্বত্য মূষিক' শিবাজী ভোঁসলে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছেন একটা দৃঢ় মূল স্বাধীন রাজ্যের বনিয়াদ। শুধু তাই নয় এই রাজ্য যাহাতে ধর্ম্মকৃত হয়, উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয় সেজন্য তাঁহার ব্যাকুলতার সীমা নাই। অন্তরে অন্তরে রামদাস বুঝিয়া নিয়াছেন, শিবাজীকে তাঁহার সাহায্য নিতেই হইবে। তাঁহার কাছে আসিতেই হইবে। কিন্তু এখনই নয়, আরো কিছুকাল রামদাসকে অপেক্ষা করিতে হইবে, লগ্ন সমাগত হইলেই শিবাজী আকুল আগ্রহ নিয়া ছুটিয়া আসিবেন, গ্রহণ করিবেন রামদাসের পরমাশ্রয়।

সৈন্যবল ও রাজ্যপরিধির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী ভোঁসলের অন্তরেও জাগিয়াছে পরম কল্যাণের ভাবনা, আত্মিক উজ্জীবনের জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। যখন যে সাধু মহাত্মার সন্ধান পান, সাগ্রহে তাঁহাকে দর্শন করেন, সাধ্যমত করেন সেবা পরিচর্য্যা। সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসী হইতে শুরু করিয়া পন্ধারপুরের সাধু তুকারামজীর সঙ্গে, কোন কিছুই শিবাজী বাদ দেন নাই। কিন্তু মনের মানুষের সন্ধান, চিহ্নিত সদ্গুরুর সন্ধান এখনও তিনি পান নাই।

রামদাস স্বামীর আদর্শ ও সংগঠনের নানা সংবাদ শিবাজী রাখেন, তাঁহার মাহাত্ম্য ও যোগৈশ্বর্য্যের খ্যাতিও তাঁহার অজানা নয়। এই মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণের জন্য অন্তর তাঁহার বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। রামদাস তখন কোন মঠেই স্থায়ীভাবে বাস করিতেন না। স্বেচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাই কিভাবে কোথায় মহাত্মার দর্শন করা যায় শিবাজী মাঝে মাঝে ভাবিতেছিলেন।

নর্সোমল্ নাথ নামে শিবাজীর এক কর্ম্মচারী সেবার খবর দেন, স্বামীজী এখন ছাফলের মঠে অবস্থান করিতেছেন। কয়েকজন পার্শ্বরক্ষী নিয়া শিবাজী তখনি সেখানে ছুটিয়া যান। কিন্তু সাক্ষাৎ

হইল না। শুনিলেন, রামদাস স্বামী তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

ছাফলের মঠটি ছোট হইলেও বড় মনোরম। শিবাজী সাধুদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে কাহার আনুকূল্যে, এই সুন্দর মঠটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

সাধুরা সবিস্ময়ে কহেন, "সে কি মহারাজ, আপনি কি জানেন না, এটি যে আপনার প্রদত্ত অর্থেই তৈরী হয়েছে। কয়েক বৎসর আগে পুনাতে, আপনার পুরোহিতের ভবনে গিরি গোসাবি নাসিখর নামে এক কীর্ত্তনিয়া রামলীলা কীর্ত্তন করছিলেন। কীর্ত্তন শুনে খুশী হয়ে আপনি তাঁকে কিছু অর্থ দান করতে চান। ঐ কীর্ত্তনিয়া রামদাস মহারাজের একজন পরম ভক্ত। তিনি অনুরোধ জানান—মহারাজের প্রতিশ্রুত অর্থ যেন রামদাস স্বামীজীকেই দেওয়া হয় ছাফলের রামমন্দির নির্ম্মাণের জন্য। এটিই তো সেই মন্দির। আপনার সরকার থেকে তিন শত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয়েছিল এই পবিত্র কাজের জন্য।"

এ সংবাদে শিবাজী হৃষ্ট হইলেন। মন্দিরের চারপাশে ঘুরিয়া দেখিলেন, নদীর খরস্রোত উহার ভিত্তির দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। সরকারী অধিকর্ত্তাকে ডাকিয়া তখনি তিনি হুকুম দিলেন, "যে কোন উপায়ে এই নদীর স্রোত-ধারাকে ঘুরিয়ে দাও, স্বামীজীর এই মন্দিরকে রক্ষা করো। এ জন্য যে কোন অর্থব্যয়ে কার্পণ্য ক'রো না।"

নির্দ্দেশমত কার্য্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হয় নাই। ফলে ছাফলের ঐ মন্দির ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পায়।

রামদাস স্বামীর কাছে শিবাজীর সব সংবাদই যথাসময়ে পৌঁছিল, ইহার কিছুদিন পরে শিবাজী মাহুলীতে একটি ধর্ম্মানুষ্ঠানে

১ টকাখাব্ অ্যাণ্ড কেলুস্কর : লাইফ অব শিবাজী মহারাজ পৃঃ ৫২৫

যোগ দিতে গিয়াছেন, সেখানে এক শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার হাতে আসিল রামদাস স্বামীর এক ক্ষুদ্র লিপি। এ লিপি পাইয়া রাজা মহা উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাকে উত্তর দেন :

"হে মহাতাপস, আমি আপনার চরণে অপরাধী। আপনার হৃদয়ে রয়েছে অসীম করুণা—আপনার আশিস্‌পূত লিপি আমায় ভরপুর করে দিয়েছে পরম আনন্দে। কি ভাষায় আমি তার বর্ণনা দেব? আপনি কৃপা করে আমার গুণগান করেছেন, কিন্তু আমি জানি আমি মোটেই তার উপযুক্ত নই। বহুদিন যাবৎ আপনার দর্শনের অভিলাষী রয়েছি, এবং সুযোগ পেলে এখনই আমি উপস্থিত হতে পারি আপনার সকাশে। হে প্রভু, আপনি কি আমায় গ্রহণ করবেন? আমার তৃষ্ণা কি করবেন দূর?"

এই পত্র পাঠাইয়া দিয়া পরদিনই শিবাজী তাঁহার রক্ষীদল নিয়া উপনীত হন ছাফলে। সেখানে গিয়া শুনিতে পান, রামদাস মহারাজ তখন সিংগন-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। মঠের সাধুরা তাঁহাকে বলেন, "মহারাজ, এই সময়ে স্বামীজীর কাছে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এখন তিনি হনুমানজীর মন্দিরে একটি বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। পূজা অর্চ্চনা সমাধা করে স্বামীজী মহারাজ নিজের হাতে বহুতর ভোগরাগ প্রস্তুত করবেন। তারপর মারুতীজীকে তা নিবেদন করে দিনশেষে বসবেন প্রসাদ গ্রহণের জন্য। আপনি বরং পরে আর কোনদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।"

শিবাজী একথা মানিলেন না। কহিলেন, "হৃদয় বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, আর ধৈর্য্য ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা-ছাড়া, আজ তো বৃহস্পতিবার—গুরুবার, এই শুভদিনেই স্বামীজীকে আমি দর্শন করবো।"

রক্ষীদল পশ্চাতে রাখিয়া তাড়াতাড়ি তিনি অগ্রসর হন। দুইজন সঙ্গী নিয়া সিংগন-বাড়ীর মঠে উপস্থিত হন, লুটাইয়া পড়েন রামদাসজীর চরণতলে।

রামদাস স্বামীর হস্তে তখনো ধৃত রহিয়াছে শিবাজীর সদ্যপ্রাপ্ত লিপি। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "রাজা, আপনি আসবেন তা আমি জানতাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সাক্ষাতের জন্য আপনি এত ব্যগ্র, কিন্তু আরো আগে কেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?"

"দুর্ভাগা আমি, তাই অভিলাষ থাকলেও এতদিন বঞ্চিত ছিলাম আপনার দর্শনে। প্রভু, এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমায় আপনি মার্জ্জনা করুন। এখন দর্শন যখন মিলেছে, আর আমায় দূরে সরিয়ে রাখবেন না। অবিলম্বে দীক্ষা দিয়ে আমায় উদ্ধার করুন।"

শাস্ত্রীয় বিধান মত দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। চৈতন্যময় মন্ত্র গ্রহণের পর গুরু মহারাজের কাছে শিবাজী চিরতরে আত্মসমর্পণ করিলেন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের এই শুভদিন, রামদাস ও শিবাজীর মিলনের দিন, মহারাষ্ট্রের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

গুরুর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় শিবাজীর অবদান যথেষ্ট। এই পরিকল্পনার পিছনে স্বামী রামদাস জোগাইয়াছেন অধ্যাত্মশক্তি, আর শিবাজী উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার ক্ষাত্রতেজ ও অর্থবল। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর হইতে শিবাজী তাঁহার রাজ কোষাগার উন্মুক্ত করেন নব নব মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠায়। বড় বড় জায়গীর দিয়া এই ধর্ম্মকেন্দ্রগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে তিনি সাহায্য করেন। গুরু ও শিষ্যের এই মহান যৌথ প্রয়াস সারা ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্ম্মাদর্শের সম্মুখে সেদিন উন্মোচন করে এক নূতন দিগন্ত, সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ আদর্শবাদী মানুষের বুকে জাগাইয়া তোলে বিরাট প্রত্যাশার আলো।

রামদাস স্বামী একদিন শিবাজীকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, "শিবাজী, গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ তুমি অসম্পূর্ণ রেখেছো, এবার সেটা শেষ করতে হবে।"

"কি সে কাজ, প্রভু, আদেশ করুন, সর্ব্বশক্তি দিয়ে আমি তা পালন করবো।"—যুক্তকরে নিবেদন করেন শিবাজী।

"তোমার রাজ্যাভিষেক তো এখনো হয় নি। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর তুমি। শুধু মারাঠাই নয় সারা ভারতভূমি আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমার এই শাসনকে শাস্ত্রীয় সমর্থনের ভিত্তিতে আমি দাঁড় করাতে চাই। তোমার শক্তি সত্যকার ক্ষাত্রশক্তি বলে গণ্য হোক, তাও আমি চাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ, সাধু-মহাত্মা, সমাজনেতা ও জনগণের সমক্ষে—প্রাচীন ভারতীয় প্রথায়—তোমার অভিষেক হোক। পবিত্র যজ্ঞ হোম সম্পন্ন হোক। অবিলম্বে এর উদ্যোগ আয়োজন করো।"

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শিবাজী ভোঁসলে অচিরে এ কাজে ব্রতী হন। কাশীধামে তখন অশেষ শাস্ত্রবিদ্ গাগা ভট্টের প্রবল প্রতাপ। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুইয়েতেই তিনি পারঙ্গম। তাঁহাকেই অভিষেক ক্রিয়ার প্রধান আচার্য্য রূপে মনোনীত করা হইল। ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংস্কৃতি ও সমাজের নেতাদের কাছে প্রেরিত হইল আমন্ত্রণ পত্র। সাড়ম্বরে ও শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী শিবাজী মহারাজের অভিষেক উৎসব সুসম্পন্ন হইল।

কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিতবর গাগা ভট্ট আগামী এক সপ্তাহের ভিতর বারাণসীর দিকে রওনা হইবেন। হঠাৎ একদিন ভট্টজী দেখেন, প্রত্যুষে উঠিয়া শিবাজী ভক্তিভরে সর্ব্বপ্রথমে মারাঠী ভাষায় লিখিত এক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন।

"মহারাজ, এই মারাঠী পুঁথি কি রোজই আপনি এ সময়ে পাঠ করেন?"—প্রশ্ন করেন ভট্টজী।

"হ্যাঁ, পণ্ডিতবর, এটি যে আমার প্রাত্যহিক কাজ এবং প্রধান কৃত্য।"

"কি নাম এ গ্রন্থের? কার রচিত? কোন্ তত্ত্ব আছে এতে, খুলে বলুন তো?"

"এ গ্রন্থ মারাঠীতে লেখা, নাম দাসবোধ, মহাত্মা রামদাস স্বামী, আমার গুরু মহারাজ এর রচয়িতা।"

"এ বড় অদ্ভুত কথা মহারাজ। আপনার মত বিচক্ষণ, শাস্ত্র-প্রেমিক ব্যক্তির একি রুচিহীনতা? আপনার পক্ষে এ গ্রন্থপাঠ তো মোটেই শোভন নয়। বৈদিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, তাই তো হবে আপনার আমার উপজীব্য। বেদ-বেদান্ত উপনিষদ সব কিছু ছেড়ে, শেষটায় আপনি মারাঠী দাসবোধ নিয়ে মেতে উঠলেন? ছিঃ।"

মহারাজ শিবাজী সবিনয়ে উত্তর দেন, "পণ্ডিতবর, এ পুঁথি মারাঠীতে লেখা হলেও, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকেই এর তত্ত্ব সঙ্কলিত হয়েছে। আমি মনে করি—প্রজ্ঞাবান্, যোগসিদ্ধ মহা-পুরুষের রচিত এ গ্রন্থ সব মানুষেরই কল্যাণ-সাধনে সক্ষম। তাই এটা আমার নিত্য পাঠ্য।"

গাগা ভট্ট শিবাজীর কথা দেখিয়া শ্লেষাত্মক হাসি হাসিলেন। এ প্রসঙ্গ নিয়া আর ঘাঁটাঘাঁটি করিলেন না।

শিবাজী কিন্তু ভট্টজীর কথাগুলি বিস্মৃত হইলেন না। মনে মনে স্থির করিলেন, পণ্ডিতবরকে অচিরে সমুচিত শিক্ষা দিয়া তবে মহারাষ্ট্র হইতে ছাড়া হইবে।

দুই দিন পরেই রাজপ্রাসাদের চত্বরে স্বামী রামদাসের এক ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান বসিল। এই সভায় প্রধান অঙ্গ—দাসবোধের ব্যাখ্যা ও রামলীলা কীর্ত্তন। গাগা ভট্ট এবং অন্যান্য বড় পণ্ডিতদেরও এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হইল।

সভা শুরু হইয়াছে। ইষ্টনাম ও ইষ্টলীলা গাহিতে গাহিতে স্বামী রামদাস দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। কখনো তিনি হাসিতেছেন, কখনো বা কাঁদিতেছেন—এ যেন মহাভাবের উৎসারক এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। অগণিত শ্রোতা ও দর্শনার্থী এই কৌপীনবন্ত

সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। তাঁহার ভাবরসের উত্তাল তরঙ্গ দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে। রামদাসের এই লীলা বর্ণনা যেন জীবন্ত। ভাববিহ্বল শ্রোতাদের নয়ন সম্মুখে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত আর মারুতী এক একটি মূর্ত্তি যেন ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব ও তত্ত্বের মিশ্রণে রচিত হইয়াছে দিব্যলোকের অপরূপ পরিমণ্ডল।

গাগা ভট্ট অনিমেষ নয়নে এই ভাবময় ইন্দ্রজালের দিকে তাকাইয়া আছেন, আর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্‌গত হইতেছে এক দুর্নিবার আকুতি। কোনমতে পণ্ডিত ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। তারপর সভার অন্তে আবেগভরে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন স্বামী রামদাসকে। গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাই।"

"পণ্ডিতবর, না-না, এসব কথা বলে আমায় পাপের পঙ্কে ডোবাবেন না।" বিনয়নম্র বচনে বলেন স্বামী রামদাস।

"না স্বামীজী, আমি সত্যই অপরাধী। আপনি যে কত বড় জ্ঞানী, কত বড় প্রেমিক পুরুষ, তা আমি বুঝতে পারি নি। আপনার মূল্য বুঝতে আমি ভুল করেছিলাম, আজ এই সভায় আপনার সত্যকার রূপ আমি চিন্‌তে পেরেছি।"

বারাণসীতে ফিরিয়া গিয়াও স্বামী রামদাসের দিব্যোজ্জ্বল স্মৃতি গাগা ভট্ট দীর্ঘদিন ভুলিতে পারেন নাই। এই মারাঠী সাধকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা চিরদিন অটুট ছিল।

রামদাস স্বামীর অন্যতম জীবনীকার ভীমস্বামী সিরগাভকার স্বামীজীর যোগবিভূতির এক অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি শিষ্যসহ স্বামীজী তখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিব্রাজন করিতেছিলেন। সেদিন একটি গ্রামের উপান্তে তাঁহারা বিশ্রাম

করিতেছেন। পাশেই রহিয়াছে একটি শ্মশান। হঠাৎ এক সদ্য বিধবার আর্ত্ত কান্না ও চীৎকার স্বামীজীর কানে গেল। বড় মর্ম্মভেদী এই কান্না। তাড়াতাড়ি শিষ্যদের নিয়া তিনি শ্মশানে ছুটিয়া যান। গিয়া দেখেন স্থানটি লোকে লোকারণ্য—গ্রামের পাটেল মারা গিয়াছে। এইমাত্র মৃতদেহ সেখানে আনা হইয়াছে। পাটেলের স্ত্রীর ললাট সিন্দূরলিপ্ত, পরিধানে লালপেড়ে একটি নূতন শাড়ী, সতীরূপে স্বামীর সহমরণে যাইতে তিনি প্রস্তুত। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষে চিতায় আরোহণ করিতে যাইবেন, এমন সময় সদ্য বিধবা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন, স্বামীর মৃতদেহটি জড়াইয়া ধরিয়া বিলাপ করিতে থাকেন।

বড় মর্ম্মন্তুদ এই দৃশ্য। অসহায়া বিধবার ক্রন্দনে রামদাস স্বামীর হৃদয় বিগলিত হইল, মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইল করুণাঘন রূপ। অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মাঈ, তুমি শান্ত হও। ভয় নেই, রামজীর কৃপায় তোমার স্বামী আবার তাঁর প্রাণ ফিরে পাবেন।"

শবের পাশে কিছুক্ষণ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে রামদাস উপবিষ্ট থাকিলেন, তারপর কমণ্ডলু হইতে ছিটাইয়া দিলেন এক অঞ্জলি পবিত্র বারি। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। মৃত পাটেল ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন।

জনতা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্বামী রামদাসকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। আর স্বামীজীর শিষ্যগণ বার বার উচ্চারণ করিতেছে জয়ধ্বনি—জয় জয় সমর্থ রঘুবীর—জয় জয় সমর্থ রামদাস।

পাটেলের স্ত্রী এবার স্বামীজীর পা দুটি জড়াইয়া ধরেন। সজল চক্ষে মিনতি করেন, "প্রভু, দয়া যদি একবার করেছেনই, তবে এই দাসীর উদ্ধারও আপনাকেই করতে হবে। আমার স্বামী আর আমাকে আপনি দীক্ষা দিন। আপনার পরমাশ্রয়ে থেকে রামজীর নামজপ করে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দিই।"

রামদাস প্রশান্ত স্বরে কহেন, "কিন্তু মা, আমি তো প্রস্তুতি ছাড়া

কাউকে দীক্ষা দিইনে। আমার পা ছাড়ো, শান্ত হয়ে উঠে বসো। জরুরী কাজ আছে আমার, এখনি আমায় যেতে হবে।”

“প্রভু, প্রস্তুতি কাকে বলে আমি জানিনে। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা কেবলি ডেকে বলছে, আপনিই আমার উদ্ধারকর্ত্তা। বেশ, আপনি চলে যাচ্ছেন যান। আমি বাধা দেবো না। কিন্তু জানিয়ে রাখছি, আজ থেকে আমি আমরণ উপবাস ব্রত গ্রহণ করলাম। যে ক'টা দিন বাঁচি, কাটাবো প্রভু রামজীর ধ্যানে। আমি যদি সত্যকার সতী হই, আপনাকে আমায় উদ্ধার করতে আবার আসতেই হবে।”

রামদাস স্বামী অতঃপর কার্য্যান্তরে চলিয়া যান। কিন্তু ভক্তিমতী পাটেলের স্ত্রীর সঙ্কল্প আবার তাঁহাকে এই গ্রামে টানিয়া আনে। একমাস পরে এখানে আসিয়া পাটেল ও তাহার স্ত্রীকে তিনি দীক্ষা দান করেন।

নিজের এক জন্মদিনে শিবাজী মহারাজ ছাফল মঠে রামদাসজীর আশীর্ব্বাদ নিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে আনিয়াছেন গুরুর জন্য কয়েকটি মূল্যবান আঙ্‌রাখা ও শাল।

প্রণাম ও কুশল প্রশ্নের পর উভয়ে নানা কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। বিশিষ্ট ভক্ত ও শিষ্যেরা আশেপাশে দণ্ডায়মান। হঠাৎ শিবাজী লক্ষ্য করিলেন, গুরুদেবের গায়ের উত্তরীয় কৌপীন সব একেবারে ভেজা। মনে হয়, এই মাত্র তিনি যেন নদীতে স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছেন। সেবকেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক্। স্বামীজী তো স্নান তর্পণ সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই সারিয়াছেন, তারপর পরিধান করিয়াছেন তাহাদের দেওয়া শুষ্ক আঙ্‌রাখা ও কৌপীন। এমনভাবে কি করিয়া হঠাৎ তাহা জলসিক্ত হইল?

কৌতূহলী হইয়া শিবাজী প্রশ্ন করিলেন, “প্রভু, বলুন তো কি

এর রহস্য। নদীর জল এলো কোথা থেকে, কি করেই বা আপনার শুষ্কবস্ত্র ভিজিয়ে দিল?"

"না, মহারাজ, নদীর জল নয়। এ সব ভিজেছে সমুদ্রের জলে। এই ছ্যাখো।" মুচকি হাসি হাসিয়া রামদাসজী মহারাজের অঞ্জলিতে ঢালিয়া দিলেন উত্তরীয় নিংড়ানো কিছুটা জল।

এ জল মুখে দিতেই শিবাজী চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো, এ যে ঘোর লবণাক্ত, নদীর জল তো নয়—সমুদ্রের জলই বটে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গুরুর দিকে তাকাইতেই তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আজকের তারিখটা তুমি বিশেষভাবে মনে করে রেখো। ঠিক পনের দিন পরে এই সাগরজলের রহস্য উন্মোচিত হবে। তখন আশ্রমে এলে সব টের পাবে।"

নির্দ্ধারিত দিনে শিবাজী আবার ছাফলে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন, একটি ধনী বণিক স্বামীজীর সহিত নিভৃতে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। শিবাজীকে দেখিয়াই গুরু স্নেহভরে তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "মহারাজ, সেদিনকার সাগরজলের রহস্য, আজ বুঝা গেল। ইনি হচ্ছেন রাজাপুরের মুঞ্জেজী, আমার একজন আশ্রিত শিষ্য। এঁর মুখেই শোন সব কথা।"

মুঞ্জে এতক্ষণ স্বামীজীকে যে কাহিনী বলিতেছিলেন, শিবাজীর কাছে করিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি। মারাঠার উপকূল বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান বণিক এই মুঞ্জে। পনের দিন আগে জাহাজভর্ত্তি মালপত্র নিয়া তিনি সমুদ্রপথে চলিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়িয়া জাহাজটি জলমগ্ন হইতে থাকে। মুঞ্জে এই সময়ে গুরুদেব রামদাসজীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণ চীৎকারে তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন, ধনপ্রাণ রক্ষার প্রার্থনা জানান। এই সময়ে জাহাজের খোলের উপরে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন সমর্থ রামদাস স্বামী। বরাভয় দানে আশ্বস্ত করেন আশ্রিত শিষ্যকে। ক্ষণকাল পরেই ঝড়ের তাণ্ডব হ্রাস পায়, সমুদ্র শান্ত হইয়া আসে। মুঞ্জের দৃঢ়

বিশ্বাস, গুরুমহারাজের করুণাবলেই এ যাত্রা সে বাঁচিয়া গিয়াছে, জাহাজটিও রক্ষা পাইয়াছে ভরাডুবি হইতে। বন্দরে বন্দরে মাল পৌঁছাইয়া দিয়া মাত্র গতকালই মুঞ্জে দেশে ফিরিয়াছে। আজ আসিয়াছে স্বামীজীর চরণ দর্শনে।

শিবাজী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, পক্ষকাল আগে যে তারিখে ও যে সময়ে স্বামী রামদাসজীর বসন তিনি সিক্ত দেখিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই বণিকের জাহাজটি ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সাগরে বিপন্ন হইয়া পড়ে।

শিবাজীর জীবনে এখন একটানা সাফল্যের কাল। দুর্গের পর দুর্গ মুঘলের হাত হইতে তিনি ছিনাইয়া নিতেছেন, রাজ্যের পরিধি হইতেছে বিস্তৃততর। সেনাবল ও অর্থবলও বিপুল। কিন্তু প্রবীণ নৃপতি শিবাজীকে কিন্তু এই জাগতিক সমৃদ্ধি বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। বরং ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে তিনি আরো তৎপর হইয়াছেন, গুরু রামদাস স্বামীর পরমাশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন আরো দৃঢ় হস্তে। স্বামীজীও বিশ্বাস করেন, যে ঐশী কার্য্যের ভার তিনি নিয়াছেন তাহার প্রধান সহায় হইতেছেন শিবাজী। তাই শিবাজীর জীবনকে অধ্যাত্মরসে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে তাঁহার প্রয়াসের অন্ত নাই। অনন্ত আশা নিয়া, সদা সতর্ক দৃষ্টিতে এই রাজ শিষ্যের দিকে দিনের পর দিন তিনি চাহিয়া আছেন।

সে-বার পদব্রজে ঘুরিতে ঘুরিতে রামদাস স্বামী সাতারায় আসিয়াছেন। শিবাজী তখন রাজধানীর দুর্গেই অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু গুরুজীর আগমন সংবাদ তখনো পান নাই। রামদাসজী স্থির করিয়াছেন, অপর শিষ্যদের সহিত কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া তারপর দর্শন দিবেন শিবাজী মহারাজকে।

পদব্রজে পরিব্রাজন, আর মাধুকরী দুইটিই স্বামী রামদাসের

পরম প্রিয়। সাতারায় আসিয়া প্রতিদিনই তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেন।

শিবাজী সেদিন দুর্গের বারদুয়ারীতে বসিয়া অনুচরদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল সন্নিহিত মহল্লার এক কুটির দ্বারে। দেখিলেন, গুরুজী রামদাস স্বামী ভিক্ষাপাত্র হাতে সেখানে দণ্ডায়মান।

মুহূর্ত্তে চিন্তার ঝলক খেলিয়া যায় তাঁহার মনে। একি অদ্ভুত কাণ্ড! রাজ্যের অধীশ্বর যাঁর পদানত—যাঁর বিশ্বস্ত সেবক, সেই রাজগুরু মহাসমর্থ রামদাস স্বামী রাজ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন দীন কাঙ্গালের বেশে, ভিক্ষান্নে করিবেন জীবনধারণ? না-না, শিবাজী কিছুতেই তা আর চলিতে দিবেন না।[১]

বিশ্বস্ত অনুচর বালাজীকে ডাকিয়া তখনি তাহার হাতে এক পত্র দিলেন। কহিলেন, "গুরুজী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন দুর্গদ্বারে। তুমি আমার এই পত্র তাঁর চরণতলে রেখে দিও।"

দুর্গ তোরণে দাঁড়ানো মাত্র শিবাজীর পত্র রামদাসজীকে দেওয়া হইল। কৌতূহলভরে তিনি এটি পাঠ করিলেন। মহারাজ শিবাজী লিখিয়াছেন,—"প্রভু, আপনার এই ভিক্ষাবৃত্তির দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। এই সমগ্র রাজ্য, আর আমার যা কিছু ব্যক্তিগত বিত্তবিভব আছে সবই আমি আপনার চরণে উৎসর্গ করলাম। আপনি কৃপা করে এসব গ্রহণ করুন, ক্ষান্ত হোন ভিক্ষাবৃত্তিতে।"

মৃদু হাস্যে পত্রটি হাতে নিয়া রামদাস সেদিন সেখান হইতে চলিয়া যান। পরের দিনই সাক্ষাৎ করেন শিবাজীর সঙ্গে। বলেন, "মহারাজ, তোমার সবই তো দান করেছো আমায়, তোমার নিজের বলতে আর তো কিছু অবশিষ্ট নেই। এবার তবে আমার সঙ্গে

১ স্যর যদুনাথ সরকার: শিবাজী অ্যাণ্ড হিজ টাইম্‌স পৃ: ৮; অ্যাকওয়ার্থ: মারাঠী ব্যালাড্‌স: ভূমিকা।

দুর্গের বাইরে এসে দাঁড়াও। আমার প্রকৃত চেলা হয়ে আমার সঙ্গে শুরু করো মাধুকরী।"

সানন্দে ভিক্ষাঝুলি কাঁধে নিয়া শিবাজী গুরুর অনুসরণ করেন, দ্বারে দ্বারে মাগিয়া ফিরেন।

ভিক্ষুকের বেশে শিবাজী মহারাজ উপস্থিত। ঘরে ঘরে সোরগোল পড়িয়া যায়, সসঙ্কোচে, কম্পিত হস্তে রাজভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থেরা সরিয়া দাঁড়ায়।

দিন শেষে রাজধানীর উপান্তে এক অরণ্যে বসিয়া গুরু শিষ্য উভয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেন। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া রামদাস এবার কহিলেন, "বৎস শিবাজী, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো। তোমার রাজ্য ও রাজৈশ্বর্য্য আমায় দান করে তুমি ভিক্ষুক হয়েছিলে। আজ সব কিছু আবার আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম। তুমি আবার রাজসিংহাসনে বসবে বটে, কিন্তু চিরদিনই রবে আমারই প্রতিনিধি রূপে। আমার গেরুয়া গাত্রবাস তোমায় দান করছি, বৈরাগীর এই উত্তরীয়ই হবে তোমার রাষ্ট্র-পতাকা।"

এই গেরুয়া পতাকা বা ভগোয়া ঝাণ্ডা মহারাজা শিবাজীর রাজ্যে যতদিন উড্ডীয়মান ছিল, ভারতবাসীর হৃদয়পটে ততদিন ত্যাগ-বৈরাগ্যের পরম আদর্শ ছিল দেদীপ্যমান। আজো সে আদর্শের স্মৃতি এদেশ বিস্মৃত হয় নাই।

একদল ভক্ত ও শিষ্য নিয়া রামদাসজী একদিন দূর গ্রামের এক মঠে যাইতেছেন। দীর্ঘ দুর্গম পথ। চলিতে চলিতে সঙ্গীরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই একটি ভুট্টার ক্ষেত। ভক্তেরা নিবেদন করে, "প্রভু, এখানে তো কাছাকাছি কোন লোকালয় দেখছিনে। আমরা সবাই শ্রান্ত অবসন্ন। ক্ষুধার জ্বালায় পথ চলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা বলছি কি, ক্ষেত থেকে কিছু ভুট্টা তুলে

আমরা প্রাণ বাঁচাই, তারপর অন্য সময়ে ক্ষেতের মালিককে এর দাম দিয়ে দিলেই হবে।”

শিষ্যদের দুর্দ্দশা দেখিয়া স্বামীজী এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। প্রয়োজনীয় ভুট্টা সংগৃহীত হইল, সামনের এক বটগাছের নীচে আগুন জ্বালাইয়া, দগ্ধ ভুট্টা ভোজনের পর সকলে সুস্থ হইলেন।

এমন সময়ে যমদূতের মত গ্রামের পাটেল সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভুট্টার ক্ষেতটি তাহারই। সাধুদের কাণ্ড দেখিয়া সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অকথ্য ভাষায় দলের নেতা রামদাসজীকে গালি-গালাজ করিতে থাকে। ভুট্টার কয়েকটি অবশিষ্ট আঁটি সম্মুখে পড়িয়া ছিল, সেগুলি উঠাইয়া নিয়া পাটেল সজোরে রামদাসজীকে আঘাত করিতে থাকে। স্বামীজীর দেহের নানা স্থানে কাটিয়া যায়, রক্ত ঝরিতে থাকে। আঘাতকারীকে কোন প্রকার বাধা না দিয়া স্বামী রামদাস প্রশান্ত বদনে রহেন দণ্ডায়মান।

স্বামীজীর এই সমদর্শিতা ও নির্ব্বিকার ভাব ভক্ত-শিষ্যদের থাকিবে কেন? তাহারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, সবাই মিলিয়া পাটেলকে জাপটাইয়া ধরে, মুষ্ট্যাঘাতে করে তাহাকে ধরাশায়ী।

রামদাসজীকে এবার উত্তেজিত হইতে দেখা যায়। শিষ্যদের হটাইয়া দিয়া পাটেলকে তিনি মুক্ত করেন, তিরস্কারের সুরে কহেন, “এ তোমাদের অন্যায়। ভুট্টার ক্ষেতের মালিক এই পাটেল। তার ভুট্টা খেয়ে, আবার তাকেই ধরে মারবে এ কেমন কথা? না—একে তোমরা কিছু ব'লো না, অপরাধ তো বরং আমাদেরই। পরদ্রব্য না বলে আমরা নিয়েছি।”

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে শিবাজী মহারাজ একদিন গুরুর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। কৌপীনবন্ত রামদাসজী খালি গায়ে নিজ আসনে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপে রত, হঠাৎ তাঁহার দেহের কাঁচা ঘায়ের দিকে শিবাজীর দৃষ্টি পড়িল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু স্বামীজী একেবারে নিরুত্তর।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক সেবক কিন্তু মূল কথাটা ফাঁস করিয়া দেয়। ভুট্টা ক্ষেতের মালিক পাটেলের মারধোরের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে।

আনুপূর্ব্বিক সব শুনিয়া শিবাজী তো মহারুষ্ট। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "রাজগুরুর প্রতি এই অত্যাচার! আচ্ছা, এখনি এই পাটেলের সমুচিত দণ্ডবিধান আমি করছি।"

স্বামী রামদাস সহাস্যে বলেন, "বৎস, মনে রেখো, তুমি রাজ-সিংহাসনে বসলেও আসলে তুমি হচ্ছো ধর্ম্মের প্রতিনিধি, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর প্রতিনিধি। এ স্থলে অপরাধ হয়েছে আমাদেরই, পাটেলের নয়। ভক্তেরা ভুট্টা খাবার প্রস্তাব করার সময় আমি ভেবেছিলাম, পরে এসে ক্ষেতের মালিককে এর মূল্য দিয়ে যাবো। তুমি বরং আমার হয়ে তাই দাও এই পাটেলকে। তাকে কয়েক বিঘা জমি তুমি পুরস্কার স্বরূপ দান করো, তবেই আমি লাভ করবো অপার সন্তোষ।"

বলা বাহুল্য, গুরুর এই নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হইতে সেদিন বিলম্ব হয় নাই।

গুরুর প্রতি শিবাজীর আত্মসমর্পণ ও ভক্তিপ্রেমের তথ্য গবেষকেরা কতকগুলি চিঠিপত্র হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। রাজা শিবাজীর একটি পত্রের অনুবাদ নিম্নরূপ :

শ্রীস্বামীজী মহারাজ! মহত্তম গুরো!

আমি শিবাজী হচ্ছি আপনার শ্রীচরণের ধূলি। শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে জানাচ্ছি আমার এই আবেদন। হে পরমপূজ্য, আপনি আমায় দীক্ষা দান করে ঢেলে দিয়েছেন কল্যাণবহ আশীর্ব্বাদ। একটি স্বাধীন রাজ্যগঠন, ধর্ম্মসংস্থাপন, দেবদ্বিজের আরাধনা, জন-গণের রক্ষণ ও দুঃখ দূরীকরণ—এইসব মহৎ কার্য্য সাধনের নির্দ্দেশ আপনি আমায় দিয়েছিলেন। তাছাড়া পরম বস্তুর অন্বেষণেও আপনি আমায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আর আশ্বাস দিয়েছিলেন—আমার সকল

কিছু প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠবে প্রভু শ্রীরামজীর কৃপায়। তদনুসারে আমিও এগিয়ে চলেছি আমার কর্ম্মসূচী নিয়ে। সফল হয়েছি দুষ্ট মুসলমান শক্তির দমনে, বিপুল ধনরত্ন এসেছে আমার অধিকারে, নির্ম্মাণ করেছি দুর্জ্জয় দুর্গসমূহ। এ সবই, প্রভু, সম্ভব হয়েছে আপনার আশীর্ব্বাদের বলে।

—বোধহয় আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার চরণে সঁপে দিয়েছিলাম আমার সমগ্র রাজ্য ও বৈভব। বলেছিলাম—আমি আপনার সেবায় নিজেকে করবো উৎসর্গ। আপনি তখন উত্তরে বলেছিলেন, আমি যদি আমার রাজকর্ত্তব্য নিষ্ঠাভরে পালন করে যাই, তবে তাই গণ্য হবে আপনার শ্রেষ্ঠ সেবাকার্য্যরূপে।

—আর এক প্রার্থনা ছিল, শ্রীরামজীর মন্দির যেন আমার কাছাকাছি কোথাও নির্ম্মিত হয়, তাহলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবো, আর রামদাসী সম্প্রদায়ও ছড়িয়ে পড়তে পারবে দিকে দিকে। হে আমার পরমপূজ্য, আপনি আমার সে প্রার্থনা শুনেছিলেন। আমার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুহায় এসে আপনি বাস করতে থাকেন, ছাফল্-এ প্রভু রামজীর মন্দিরও নির্ম্মিত হয়, এরপর সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যদের প্রভাবও বেড়ে চলে দিনের পর দিন। তাছাড়া, আরো একটা আন্তরিক অনুরোধ আমার ছিল। আমার আরো আবেদন ছিল, শ্রীরামজীর পূজায়, উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহে, ছাফল মন্দিরের নির্ম্মাণকাজে এবং অন্যান্য স্থানের মূর্ত্তির সেবায় আমি যেন কিছু পরিমাণ জমিখণ্ড দান করতে পারি। তার উত্তরে আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন,—এজন্য আমি যেন চিন্তিত না হই, যেসব জমি আমি এ উদ্দেশ্যে দান করা প্রয়োজন মনে করি তা যেন দিই, এবং সম্প্রদায়, রাজ্য এবং জাতির কল্যাণে যেন আত্মনিয়োগ করি। তারপর আমি আমার রাজকীয় নির্দ্দেশনামা প্রদান করি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার হইতে জমি অর্পণের ব্যবস্থা করা হয়। ছাফলের চারপাশে যে ১২১টি গ্রাম রয়েছে

তাদের প্রত্যেকটি থেকে ১১ বিঘা জমি দান করার নির্দ্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গিয়েছে।[১]

অভিষেকের পর হইতেই শিবাজীর জীবনে অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা বাড়িয়া উঠিতে থাকে ; স্বামী রামদাসের উপরও আসে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরতা। যে কোন প্রশ্ন, তাহা সাধনতত্ত্ব সম্পর্কেই হোক, সামাজিক বা রাজনীতি সম্পর্কেই হোক, গুরুকে দিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া না নিলে শিবাজীর চলে না। তাছাড়া, এখন হইতে গুরুর সঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের জন্যও তাঁহার মন বড় বেশী ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কিন্তু রামদাসজীকে কোন একটি বিশেষ স্থানে ধরিয়া রাখিবার জো নাই। তীর্থে-তীর্থে মঠে-মঠে স্বেচ্ছামত তিনি ঘুরিয়া বেড়ান।

পরলী দুর্গটি শিবাজীর অধিকারে আসার পর তিনি স্থির করেন, গুরুর জন্য এখানে একটি স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। অনেক অনুনয় করিয়া রামদাসজীকে রাজী করানো হয়। শিবাজীর নির্দ্দেশমত দুর্গ-শীর্ষে রামদাসজীর এক নূতন ভবনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে সাধু-সন্ন্যাসীদের একটি মঠ এবং উপনিবেশ। সাধু-সজ্জনের আবাস-ভূমি—তাই ইহার নাম দেওয়া হয় সজ্জনগড়। দুর্গের চারদিকের গ্রামগুলির আয় শিবাজী দান করিলেন এই সাধু-উপনিবেশের জন্য। রামদাসজীর প্রবর্ত্তিত বড় বড় ধর্ম্ম-উৎসবগুলি সাড়ম্বরে এখানে পালন করা হইত। সে ব্যয়ও নির্ব্বাহ হইত সরকারের প্রদত্ত নজরানা হইতে।

সজ্জনগড় সাতারা হইতে বেশী দূর নয়। শিবাজীর প্রিয় দুর্গ রায়গড়ও খুবই কাছাকাছি। শিবাজী প্রায়ই রায়গড়ে যাইতেন এবং নিকটবর্ত্তী গুরুস্থান সজ্জনগড় ছিল তাঁহার এক বড় আকর্ষণ। অবসর পাইলে সেখানে গুরুজীর সমীপে গিয়া উপস্থিত হইতেন, গ্রহণ করিতেন সাধনভজন ও রাজকার্য্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশ।

১ উইলবার এস্ ডেমিং : রামদাস—পৃঃ ৬১

অনেকের ধারণা, রামদাস স্বামী তাঁহার শিষ্য শিবাজীর রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্র চিন্তার নিয়ামক ছিলেন, এবং ইহাই স্বামীজীর বড় পরিচয়। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই যুক্তিসহ নয়। শিবাজী রামদাসজীর আশ্রয়ে আসেন জীবনের শেষপাদে। ধর্ম্মধৃত রাজ্যের যে সঙ্কল্প তাঁহার মনে ছিল, রামদাসজীর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর সে সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধপুরুষ রামদাসজী ছিলেন রাজা শিবাজীর অধ্যাত্মজীবনের আলোকদিশারী এবং তাঁহার সাধন জীবনেরই নিয়ন্তা। উত্তর জীবনে শিবাজীর মুমুক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠে এবং গুরুর চরণে করেন তিনি আত্মসমর্পণ।

এ সম্পর্কে রামদাস স্বামীর অন্যতম জীবনীকার যাহা বলিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য, তাঁহার মতে, "শিবাজীর উপর রামদাসের আধ্যাত্মিক প্রভাবই ছিল মুখ্য, রাজনৈতিক প্রভাব গৌণ। তথ্য প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, শিবাজীর রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনে রামদাস খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। কাজেই রামদাসের রাজনৈতিক প্রভাবকে বড় করিয়া তোলাটা শুধু যে ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা অসমর্থিত তা-ই নয়, ইহা দ্বারা মহারাজা শিবাজী এবং স্বামী রামদাস উভয়কেই খাটো করা হয়। ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে স্বামীজী ছিলেন সর্ব্বময় প্রভু, এবং ইতিহাস নিশ্চয়ই তাঁহার এই প্রভুত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকিবে। কারণ, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মসাধনা সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল সুগভীর এবং সেখানকার সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় দক্ষ। প্রধানতঃ ধর্ম্মগুরুরূপে স্বীকৃতি না দিয়া তাঁহাকে যদি রাজনৈতিক গুরু বলিয়া আমরা প্রচার করি তবে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে, ভুল করিব। একথা সত্য যে বড় জীবনের শেষ ভাগে প্রিয় শিষ্য ও আদর্শবাদী রাজা শিবাজীর কাজকর্ম্মের ধারা দেখিয়া তিনি পরিতুষ্ট হন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে নির্দ্দেশও তিনি দিতেন। তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ দাসবোধের শেষ অংশে

সামাজিক ও রাজনৈতিক উপদেশ কিছুটা রহিয়াছে। শিবাজী মহারাজ শেষ জীবনে গুরুজীর কাছে আসিয়া রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কাজকর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত জানিয়া নিতেন, কারণ স্বামীজীর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে স্বামী রামদাস ভক্ত-তুকারাম বা অন্যান্য বৈষ্ণব সাধক হইতে ভিন্ন ধরণের ছিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম, সম্প্রদায়ের সংগঠন কর্ম্ম প্রভৃতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও স্বামী রামদাস মুখ্যত ছিলেন একজন সিদ্ধসাধক ও জনকল্যাণকর অধ্যাত্ম-আন্দোলনের নেতা।"[১]

সজ্জনগড়ের পরিবেশ ছিল বড় পবিত্র, বড় রমণীয়। চারিদিকে শস্য-শ্যামল উপত্যকা বিস্তারিত। নদী-নালার বঙ্কিম রেখায় রেখায় প্রকৃতি যেন ক্ষীণ-শুভ্র আলপনা আঁকিয়া রাখিয়াছে পরম প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায়। উর্দ্ধাকাশের মহাবিস্তারে তাকাইলে প্রাণমন মুহূর্ত্তে কোথায় যেন উধাও হইয়া যায়। এই অনুকূল পরিবেশে আসিয়া রামদাস ধ্যান-ভজনে বিভোর হইয়া পড়েন। পাহাড়ের চূড়ায় ঘনিষ্ঠ ভক্তশিষ্য নিয়া তিনি বাস করিতে থাকেন।

মঠ এবং মণ্ডলীর সংখ্যা ও পরিধি বাড়িয়াছে, কাজও অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু রামদাসের জীবনে আসিয়াছে প্রচুর অবসর। বিশ্বস্ত, কর্ম্মকুশল ও ত্যাগব্রতী শিষ্যেরা মঠ-মন্দিরগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতেছেন, তদুপরি রাজশিষ্য শিবাজীর জনবল ও কোষাগার সতত রহিয়াছে গুরুর সেবায় নিয়োজিত। প্রয়োজন বোধে মঠের মোহন্তেরা, শিবাজী ও তাঁহার উচ্চকর্ম্মচারীরা, সজ্জন-গড়ের শীর্ষে ছুটিয়া আসেন, স্বামী রামদাসের পরামর্শ ও আদেশে হয় তাঁহাদের সমস্যার সমাধান।

স্বামীজীর সজ্জনগড়ের এই পরিবেশটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

১ উইলবার এম্ ডেমিং : রামদাস পৃঃ ৭১-৭২

একনাথ স্বামী

মারাঠার ভক্তি আন্দোলনের আদি ও প্রধান উৎস পন্ধারপুর। এখানকার জাগ্রত বিগ্রহ বিঠ্ঠলজীকে কেন্দ্র করিয়া ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতকে প্রেমভক্তির যে প্লাবন উৎসারিত হয় তাহার নায়ক ছিলেন জ্ঞানদেব ও নামদেব। এই দুই মহাত্মার প্রয়াণের পর ভক্তি আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসে, সমাজজীবনে দেখা দেয় অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও ধর্ম্মবিমুখতা। এই অবনতি ও অবক্ষয়ের দিনে, জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রায় দুইশত বৎসর ব্যবধানে আবির্ভূত হন একনাথ স্বামী। মারাঠার বৈষ্ণব আন্দোলনে তিনি সঞ্চারিত করেন নূতন প্রাণপ্রবাহ, ভক্তি ও প্রপত্তির পরম পাথেয় পৌঁছাইয়া দেন সমাজের উচ্চনীচ ধনী নির্ধন সকল মানুষের অঙ্গনে।

পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদের কথা। এসময়ে পৈঠান বা প্রতিষ্ঠানপুরে অভ্যুদয় ঘটে সাধকপ্রবর ভানুদাসের। একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন। পন্ধারপুরের বিঠ্ঠলজী বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সেবা পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াও ভানুদাস প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান রাজাদের অত্যাচারে পন্ধারপুরের মন্দির দুইবার বিধ্বস্ত হয়। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় তাই বিঠ্ঠলজী বিগ্রহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তৎপর হইয়া উঠেন এবং নিজের রাজধানী হাম্পি নগরে এক নূতন মন্দিরে করেন ইহাকে সংস্থাপিত। রাজনৈতিক অশান্তি ও উপদ্রব অতঃপর কমিয়া যায় এবং পন্ধারপুরের ভক্তসাধক ভানুদাসের নেতৃত্বে বিঠ্ঠলজীকে দেশে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা হয়। কথিত আছে, সাধক ভানুদাসই বিজয়নগর হইতে এই শ্রীমূর্ত্তি বহন করিয়া আনেন এবং প্রবর্ত্তন করেন সেবা পূজার নবপর্য্যায়ের ব্যবস্থা।

এই ভানুদাসেরই বংশে তাঁহার প্রপৌত্ররূপে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন সার্থকনামা ভক্তসাধক একনাথ।

একনাথের পিতার নাম সূর্য্যনারায়ণ, মাতা রুক্মিণী বাঈ। একনাথ যখন ছোট শিশু, তখন তাঁহার পিতা মাতা উভয়েরই প্রাণবিয়োগ ঘটে। অতঃপর পিতামহ ও পিতামহীর যত্নে তিনি পালিত হইতে থাকেন।

শুভ সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছেন, তাই বালককাল হইতেই একনাথের জীবনে প্রকাশ পায় ভগবদ্-ভক্তি। খেলাধূলায় কোন উৎসাহ নাই, স্বভাবে চাপল্য নাই—সৌম্য শান্ত বালক অবসর পাইলেই গ্রামের উপান্তে শিব-মন্দিরটিতে গিয়া উপস্থিত হয়, সারা দিন সেখানে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

অপূর্ব্ব মেধা বালকের। মন্দিরে পুরাণপাঠ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যাহা হয়, সবই তাঁহার কণ্ঠস্থ। ধর্ম্মজীবনের কাহিনী শুনিতে বসিলেই সে মাতিয়া উঠে, ধ্রুব প্রহ্লাদের পুণ্য কথা ভাবিতে ভাবিতে মন কোথায় উধাও হইয়া যায়।

একনাথের বয়স তখন বারো বৎসরের বেশী নয়। একদিন জনবিরলপথে শিবমন্দির হইতে তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ কানে আসে এক দৈবী প্রত্যাদেশ, "ওরে, বৃথা কেন আর কাল ক্ষেপণ করছিস, চলে যা দেবগড়ে জনার্দ্দন স্বামীর কাছে। তিনিই যে তোর চিহ্নিত সদ্‌গুরু, তোর জীবনের চাবিকাঠি রয়েছে তাঁরই হাতে।"

বালকের মর্ম্মমূলে কে যেন এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া যায়। অজানা লোকের অদৃশ্য ইঙ্গিত মনকে বার বার উচ্চকিত, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। সেইদিনই পিতামহীর স্নেহনীড় ছাড়িয়া, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া পদব্রজে সে বাহির হইয়া পড়ে দেবগড়ের উদ্দেশে।

কে এই জনার্দ্দন স্বামী, কি তাঁহার পরিচয়, কিছুই একনাথের

অল্পদিনের মধ্যেই নেপথ্যের মহানাট্যকার তাঁহার জীবনলীলাকে ঠেলিয়া দেন শেষ অঙ্কের দিকে।

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শিবাজী একবার গুরুর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। নানা প্রসঙ্গের পর গুরু রহস্যময় হাসি হাসিয়া কহেন, "মহারাজ, মাটির মানুষ আমি, রঘুনাথজীর এক দীন সেবক। তাকে তুমি পাহাড়ের শীর্ষে আকাশে তুলে এনে রেখেছো। আকাশ হাতছানি দিচ্ছে বার বার। মহারাজ, স্পষ্টই বুঝতে পারছি, মরজীবনে ছেদ পড়তে বেশী বাকী নেই।"

"তা কি করে হয় গুরুদেব। লক্ষ লক্ষ লোক যে আপনার মুখ চেয়ে আছে, আপনার অভয় বাণী শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। এত তাড়াতাড়ি আপনার চলে যাওয়া কি করে হয়? তাছাড়া, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের অনেক কিছুই যে এখনো বাকী।"—যুক্তকরে নিবেদন করেন শিবাজী।

"মহারাজ, আমরা বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র, আমরা শুধু একটা ক্ষীণতম ক্ষীণ স্পন্দন তুলতে পারি। যা করবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রই করবেন। তবে তাঁর ভক্ত ও অনুচর হিসেবে আমায় তোমায় তাঁর পুনরাবির্ভাবের পটভূমি কিছুটা রচনা করতে হবে। তাঁর আসন পাত্‌তে হবে। ধর্ম্মরাজ্যের আদর্শ আমরা তুলে ধরলাম, বীজ ছড়িয়ে গেলাম—এই তো ছিল আমাদের কর্ত্তব্য।"

নতশিরে শিবাজী গুরুর চরণসমীপে বসিয়া আছেন। মুখে একটি শব্দ নাই।

গুরু আবার কহিলেন, "বৎস, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার শরীর দুর্ব্বল হয়েছে, অপটু হয়েও পড়েছে। খুব সাবধানে থেকো। রায়গড়ে গিয়ে তুমি পূর্ণ বিশ্রাম করো।"

শিবাজী রায়গড়ে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েকটি সামরিক অভিযান চালানোর ফলে স্বাস্থ্য তাঁহার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আর তাহা জোড়া লাগে নাই।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শিবাজী মহারাজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বামী রামদাসের দক্ষিণবাহু যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, ধর্ম্মরাজ্যে স্থাপনা ছিল রামদাসজীর কাছে এক মহান ঐশী ব্রত। আদর্শবাদী পরম ধার্ম্মিক মহারাজা শিবাজীর আনুগত্য ও সেবা ছিল তাঁহার এই কর্ম্মের বড় সহায়। বিধির বিধানে আজ তাহা অন্তর্হিত হইল।

রামদাস-শিষ্য শিবাজীর প্রকৃত মূল্যায়ন বিদেশী ঐতিহাসিকেরা করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তীকালে এ দেশের মনীষী গবেষকেরা তাঁহার আত্মিক জীবন ও ধর্ম্মীয় জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায়ও মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে শিবাজীর ধর্ম্মধৃত জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য। একাধারে বিপুল আশা, আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বকবির অমর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে ঃ

সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন
দারিদ্র্যের বল।
'এক ধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

এবার পরপারের ডাক আসিয়া গিয়াছে সমর্থ রামদাসস্বামীর অন্তরসত্তায়। প্রাণপ্রভু রামজীর চরণকমলে নিজেকে এবার তিনি বিলীন করিতে চান। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয় ইষ্টধ্যানে। ধ্যান তন্ময়তা ভাঙ্গাইয়া সেবকেরা মাঝে মাঝে চেষ্টা

করেন খাওয়ানোর জন্য, কিন্তু প্রায়ই তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। উপবাসে তনু দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে।

প্রধান শিষ্য কল্যাণ ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। কয়েকটি নিগূঢ় নির্দ্দেশ নিয়া গুরু মহারাজের আদেশে ফিরিয়া গেলেন আপন কর্ম্মকেন্দ্রে। অন্যান্য মঠ-মন্দিরের পরিচালক ও ভক্ত-শিষ্যেরা শেষবারের মত স্বামীজীকে দর্শন করিয়া গেলেন।

প্রধান শিষ্য উদ্ধব ও ভক্তিমতী আকাবাঈ গুরুজীর শয্যাপার্শ্বে সদা উপস্থিত। প্রাণপণে তাঁহারা সেবা করিয়া চলিয়াছেন, শঙ্কাকুল চিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছেন বিচ্ছেদের মর্মন্তুদ মুহূর্ত্তটির জন্য।

কয়েকদিন আগে স্বামীজী তাঁহার অভিলাষ অনুযায়ী রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও মারুতীজীর নূতন নূতন নয়নলোভন বিগ্রহ গড়াইয়া আনিয়াছেন। এই বিগ্রহগুলি এবার তাঁহার শয়নঘরে স্থাপন করিতে বলিলেন। বহুক্ষণ ইঁহাদের সম্মুখে রহিলেন ধ্যানাবিষ্ট।

শয়নগৃহে তখন উপস্থিত একনিষ্ঠ সেবিকা আকাবাঈ আর প্রধান শিষ্য উদ্ধব। ধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়া আকাবাঈ-এর হাত হইতে গুরু গ্রহণ করিলেন একপাত্র চিনির সরবৎ। তারপর প্রসন্ন মধুর হাস্যে কহিলেন, "বৎসে, এবার তবে তোমরা আমায় বিদায় দাও।"

কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন আকাবাঈ। সান্ত্বনা দিয়া গুরুজী কহিলেন, "চির আনন্দধামে যাচ্ছি, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামজীর লীলা নিকেতনে আমি রওনা হচ্ছি। পরম মধুর মিলন-ক্ষণে এই কান্না কেন?"

"প্রভু, মরদেহ ছেড়ে যাচ্ছেন, আর তো শুনতে পাবো না আপনার অমৃতবাণী, আর পাবো না আপনার পরম আশ্রয়।"

"এতদিন কি আমার কাছে থেকে তোমরা শুধু এই শিখলে? প্রপঞ্চস্বরূপ এ দেহ একদিন তো ত্যাগ করতেই হবে। প্রাণপ্রভুর নির্দ্দেশ এসেছে, সানন্দে তাই আমি চলে যাচ্ছি। ভয় কেন গো, তোমাদের? এ মুখের কথা নাই বা শুনলে, কিন্তু 'দাসবোধ' তো

আছে। তাই রইল আমার মর্ম্মকথা। 'দাসবোধ' তোমরা সবাই নিত্যপাঠ করবে, থাক্‌বে রামজীর নিত্যদাস হয়ে।"

ইষ্টবিগ্রহের দিকে প্রেমাপ্লুত নয়নে তাকাইয়া রামদাস স্বামী মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "হর হর—রাম রাম, জয় সমর্থ রঘুবীর।" সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র পথ দিয়া করিল উৎক্রমণ।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দের এই মহাপ্রয়াণের দিনে সারা মারাঠার ভক্ত-সমাজে পতিত হয় গভীর শোকের ছায়া। রামদাসী সম্প্রদায়ের শত শত লোক সাশ্রুনয়নে আসিয়া উপস্থিত হয়। উদ্ধব গোসাবী ও অন্যান্য প্রধান শিষ্য ও মহান্তেরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গুরুর শেষ-কৃত্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন। পবিত্র তুলসীতরু জ্বালাইয়া রামদাস স্বামীর মরদেহ করা হইল ভস্মীভূত।

প্রভু রঘুবীরজীর নিত্যদাস—সমর্থ রামদাস ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের, রামরাজ্যের, ধ্যানকল্পনার বীজ ছড়াইয়া দিয়া গেলেন সারা ভারতের আকাশে বাতাসে।

জানা নাই। পথ চলিতে চলিতে লোকের মুখে শোনেন, তিনি দেবগড়ের কেল্লাদার, মুসলমান রাজার এক অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। যুদ্ধকুশল ও রাজনীতিবিদ্ বলিয়া যেমন তাঁহার খ্যাতি আছে, তেমনি খ্যাতি আছে সিদ্ধ সাধকরূপে। সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নৃসিংহ সরস্বতী তাঁহার গুরু। সমর্থগুরুর কৃপা ও আপন সাধনবলে জনার্দ্দনের সাংসারিক জীবন আর অধ্যাত্মজীবনের ঘটিয়াছে এক বিস্ময়কর সমাহার। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে আন্তরিকভাবে।

কেল্লার ভিতরে জনার্দ্দন স্বামীর দর্শন ঘটিল। সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া একনাথ কহিলেন, "প্রভু, আমি পৈঠানের লোক, ভানুদাসজীর প্রপৌত্র—একনাথ। ঈশ্বর কি বস্তু, কি করে তা লাভ করা যায়, কিছুই আমি জানিনে। কিন্তু কি জানি কেন, এক প্রচণ্ড ব্যাকুলতার বেগ আমায় কেবলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।"

"ভানুদাসের প্রপৌত্র তুমি ? অতি আনন্দের কথা। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, আমাদের সকলের নমস্য। তা বৎস, এত সাধু সন্ত থাকতে আমার মত কেল্লাদারের কাছে তুমি এলে কেন বলতো ?" প্রশ্ন করেন জনার্দ্দন স্বামী।

"প্রত্যাদেশ শুনেছি, আপনিই আমার গুরু, আমার ইহকাল পরকালের চাবিকাঠি আপনারই হাতে।"

"কি করে বুঝলে, বালক, এ প্রত্যাদেশ সত্য ?"

"আমার অন্তরাত্মা কেবলই ডেকে বলছে, এ দৈবী আদেশ এসেছে আমারই পরম কল্যাণের জন্য।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অশ্রুসজল চক্ষে একনাথ বলেন, "প্রভু, শৈশবে পিতামাতা হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ি, ঈশ্বরের কৃপায় পিতামহীর আশ্রয় পাই। আজো আবার তেমনি অসহায় হয়ে এই বালক আপনার আশ্রয় চাচ্ছে, আপনি কি কৃপা করবেন না ?"

"বৎস, শান্ত হও। আমি তোমায় আশ্রয় দেবো। সত্য বলতে কি,

তোমার আগমন আমার অপ্রত্যাশিত নয়। তোমার ছবি আগে থেকেই আমার মানসপটে ফুটে উঠেছে। জন্মান্তরের ভালো সংস্কার আছে তোমার ভেতর। তাইতো এ বয়সে ঈশ্বরের জন্যে এমন ব্যাকুল হয়েছো।”

পরম যত্নে জনার্দ্দন স্বামী একনাথকে দীক্ষা দেন, সেই সঙ্গে দেন নিগূঢ় ভক্তিসাধনার উপদেশ। বালক শিষ্যের শাস্ত্র পুরাণ অধ্যয়নের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। জ্ঞানেশ্বরী গীতা ও ভাগবতের তত্ত্বসমূহে অচিরে একনাথের আয়ত্তে আসিয়া যায়। তাছাড়া, একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ভক্তির নবধা লক্ষণও তাঁহার সাধন-সত্তায় প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে।

গুরুগৃহে একাদিক্রমে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। বালকশিষ্য ক্রমে পদার্পণ করে যৌবনে। শাস্ত্রজ্ঞান, প্রেমাবেগ ও কাব্য প্রতিভার অপরূপ স্ফুরণ দেখা যায় তাঁহার মধ্যে। অপার স্নেহ মমতা দিয়া গুরুজী একনাথকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার এই রূপান্তর দেখিয়া সেদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, “বৎস, একনাথ, তোমার সাধনা ও শিক্ষা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এবার তোমায় শুরু করতে হবে জীবনের একটা দুরূহ পর্য্যায়। সাধনজীবন ও অধ্যাত্ম-জীবনকে নিয়ে দূরে নিভৃতে সরে থাকলে চলবে না। এ সাধন দৃঢ়মূল হয়েছে কিনা তা যাচাই হবে নিত্যকার ব্যবহারিক জীবনে। উপলব্ধিতে আনতে হবে শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরমতত্ত্ব। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণই রূপায়িত হয়ে আছেন সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুতে। সর্ব্বঘটে ব্যাপ্ত রয়েছে মহাকাশ। তেমনি সর্ব্ব বস্তুতে সর্ব্ব ঘটে কৃষ্ণ বিরাজিত। তাই তোমার কৃষ্ণসেবা হবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই তত্ত্ব ও সাধনকে জীবনে রূপায়িত করতে হলে ব্যবহারিক জীবন বা সাংসারিক জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম্ম করতে হবে কৃষ্ণের কর্ম্ম বলে। আমি ভাবছি, তোমার অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষাও তোমাকে দেবো। দুটোকে মিলিয়ে যদি চলতে

পারো, তবেই সার্থক হয়ে উঠবে তোমার এই ভাগবত-ভিত্তিক ধর্ম্মসাধনা।”

অতঃপর একনাথকে গুরু সরকারী কাজকর্ম্মের নানাবিধ শিক্ষা দান করেন। দুর্গের কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজও ধীরে ধীরে তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

জনশ্রুতি আছে, এই সময়কার একটি ঘটনায় তরুণ একনাথ যে সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দেন, তাহার ফলে দেবগড় কেল্লা রক্ষা পায় এবং কেল্লাদার জনার্দ্দন স্বামীও এক ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াইতে সক্ষম হন।

সেদিন গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিতান্ত আকস্মিকভাবে শত্রুর এক সেনাবাহিনী দেবগড় আক্রমণ করিয়া বসে। জনার্দ্দন স্বামী তখন কেল্লার অভ্যন্তরে একটি নির্জ্জন কক্ষে রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। শত্রুসেনা রণহুঙ্কার দিয়া প্রাণপণে গুলীবর্ষণ করিতেছে, দুই একটি দল পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠার চেষ্টাও করিতেছে। এই সঙ্কট সময়ে কেল্লার নায়কের দেখা নাই, কেল্লার রক্ষীদল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে।

তরুণ একনাথ চকিতে এ বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া নিয়াছেন। গুরুদেবকে ধ্যানাসন হইতে উঠানোর উপায় নাই, অথচ শত্রুর প্রতিরোধ করিতেই হইবে। তড়িৎবেগে তিনি জনার্দ্দন স্বামীর কক্ষে ঢুকিয়া পড়েন, নিজেকে সজ্জিত করেন তাঁহার বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্রে। তারপর দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া দক্ষ নায়কের মত দেন প্রতি-আক্রমণের নির্দ্দেশ। রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধের হাঁকডাক ও উত্তেজনায় একনাথকে কেহই চিনিতে পারে নাই, ভাবিয়াছে দুর্গের নায়ক জনার্দ্দন স্বামীই তাঁহার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া দিতেছেন কৌশলপূর্ণ সামরিক নির্দ্দেশ।

তীব্র প্রতিরোধের ফলে শত্রুসেনার মনোবল সেদিন ভাঙ্গিয়া পড়ে, পরাস্ত হইয়া তাহারা পলায়নপর হয়।

ইতিমধ্যে জনার্দ্দন স্বামী ধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া নিতে তাঁহার দেরী হইল না। এ ঘোর বিপদে একনাথের উপস্থিত বুদ্ধি, বীরত্ব ও নেতৃত্বই আজ অসাধ্য সাধন করিয়াছে। শত্রু সেনা যেমন বিধ্বস্ত হইয়াছে তেমনি দুর্গবাসীদেরও হইয়াছে প্রাণরক্ষা।

একবার জনার্দ্দন স্বামী সরকারের একটি জটিল হিসাব নিয়া বড় বিপদে পড়েন। হিসাবে একটা মারাত্মক ভুল রহিয়াছে কিন্তু সে ভুলের সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কয়েকদিন ধরিয়া অবিরত চেষ্টা চলিল, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। একনাথের একটা বিশেষ গুণ, যখনি যে কাজে সে হাত দেয়, নিষ্ঠা ও দায়িত্ব নিয়া সে তাহা সম্পন্ন করে। জনার্দ্দন স্বামী তাঁহার এই হিসাবের গরমিল সংশোধনের ভার শিষ্যের উপরই দিলেন।

একনাথ একাগ্র হইয়া এই হিসাব নিয়া পড়িলেন এবং বহু পরিশ্রমের পর ভুলের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া গেল। জনার্দ্দন স্বামী তো মহা আনন্দিত। কহিলেন, "বৎস, একনাথ, তোমার নিষ্ঠা ও মনঃসংযম প্রশংসনীয়। এমনিভাবে অধ্যাত্ম-সাধনের উপরেও মনকে করতে হবে কেন্দ্রীভূত। তোমায় আমি একটি নিগূঢ় সাধন এবার দেবো। কেল্লার বাইরে যে অরণ্য রয়েছে, সেখানে বসে এই প্রক্রিয়াটি তুমি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠান করো। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সাধনা অচিরে জয়যুক্ত হয়ে উঠুক।"

গুরুর এই আশীর্ব্বাদ সফল হইয়া উঠে, ভক্তিপ্রেম-সিদ্ধ একনাথ শ্রীহরির দর্শনলাভে হন কৃতকৃতার্থ।

শিষ্যের এ সাফল্যে জনার্দ্দন স্বামীর আনন্দের অবধি নাই। স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বৎস, একনাথ, আমার এখানে আর তোমার অবস্থান করার প্রয়োজন নেই। ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করে, বেরিয়ে পড়ো, দর্শন করো দেশের প্রধান প্রধান দেবমন্দির ও তীর্থগুলি।"

পিতৃসম মমতায় গুরু এ কয়টি বৎসর একনাথকে সঞ্জীবিত

রাখিয়াছেন, গুরুরূপে তাঁহার সাধনজীবনকে করিয়াছেন উদ্দীপিত। এবার আসিয়াছে বিচ্ছেদের পালা।

সজলচক্ষে করজোড়ে একনাথ কহেন, "প্রভু, এ ক'টি বৎসর এমন নিবিড় করে আপনাকে পেয়েছিলাম, কোনদিন ভাবতেও পারি নি, এভাবে আপনি আমায় দূরে সরিয়ে দেবেন।"

"না, বৎস, দূরে আমি কোনদিনই থাকবো না, দীক্ষামন্ত্রের মধ্যেই যে থাকে গুরুর নিবাস, ইষ্টধ্যানে জড়িয়ে থাকেন তিনি ওতপ্রোত হয়ে। তোমায় আমায় বিচ্ছেদ কোন দিনই হবে না, আর শোন—তীর্থ পরিক্রমায় একটা বড় লাভ আছে।"

"বুঝিয়ে বলুন আমায়, প্রভু।"

"হ্যাঁ, এই পরিক্রমা উপলক্ষে পথে প্রান্তরে, বনে জঙ্গলে কত ঘুরে বেড়াতে হবে, সাধু তস্কর, যোগী ভোগী সবারই মুখোমুখী হতে হবে। পর্য্যটনের জীবনে আসবে কত সুখ-দুঃখ কত উত্থান পতন, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই উত্থান-পতনের মধ্যে নামজপ আর ইষ্টধ্যান ঠিক থাকে কিনা, ইষ্টের উপলব্ধি আরো দৃঢ় হয় কিনা, সঠিকভাবে তা যাচাই করা হয়ে যাবে।"

পরিব্রাজন ও তীর্থদর্শনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়, তারপর একনাথ দেবগড়ে গুরুর সকাশে উপনীত হন। গুরু শিষ্যের পুনর্ম্মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠে।

স্নেহপূর্ণ স্বরে জনার্দ্দন স্বামী কহেন, "বৎস, তোমার উপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। ঈশ্বর উপলব্ধি তোমার দৃঢ়তর হয়েছে, সাধনায় হয়েছো তুমি সফলকাম। এবার নিজের ঘরে ফিরে যাও। বিবাহ করে সংসারী হও।"

একথা শোনা মাত্র আঁৎকিয়া উঠেন একনাথ। তিনি কিছু বলার আগেই জনার্দ্দন স্বামী হাসিয়া কহেন, "এতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ

হবার কিছু নেই, একনাথ! সাধনজীবনে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের সমন্বয় ফুটিয়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন আমার গুরুদেব শ্রীনৃসিংহ সরস্বতী। তার কিছুটা নিদর্শন তুমি দেবগড়ে থেকে প্রত্যক্ষ করেছো। তোমাকেও তেমনি জীবন যাপন করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি বিবাহ করো,—যাপন করো অনাসক্ত কৃষ্ণভক্তের জীবন। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের রচিত এই বিশ্বসংসার এই উভয়কেই অবলম্বন করে থাকো। কৃষ্ণময় হও তুমি, আর প্রতি ভক্ত-মানুষের হৃদয়ে গড়ে তোল এক একটি কৃষ্ণমন্দির। আমার আর একটা নির্দ্দেশ, সাধারণ ভক্তমানুষের উপযোগী সুখবোধ্য ভক্তি-গ্রন্থাদি তুমি রচনা করো, পুরাণ শাস্ত্রের তত্ত্ব ও কাহিনীকে জনমানসের গ্রহণীয় করে দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।"

গুরুর নির্দ্দেশ একনাথ শিরোধার্য্য করিয়া নেন। পৈঠানে ফিরিয়া গিয়া মিলিত হন বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহীর সঙ্গে। অতঃপর বিজাপুরের এক সৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। নাম তাঁহার গিরিজাবাঈ। একনাথের সাধনা ও ধর্ম্মাচরণে পতিব্রতা গিরিজাবাঈ চিরকাল অকুণ্ঠ চিত্তে সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন।"

এবার পৈঠানে বসিয়া একনাথ রচনা করেন বহুতর ভক্তিমূলক গ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন ও ভাবসম্পদের দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান তাঁহার ভাগবতের ব্যাখ্যা। একাদশ স্কন্ধকে ভিত্তি করিয়া এটি রচিত। মারাঠী জনসাধারণ এ গ্রন্থকে বলে একনাথী ভাগবত। বিশহাজার পদ-সমন্বিত এই মহান গ্রন্থ মারাঠা সাহিত্যের এক অক্ষয় কীর্ত্তি।

ভাবার্থ রামায়ণ একনাথের অন্যতম সার্থক আধ্যাত্মিক সাহিত্য কীর্ত্তি। একনাথ নিজে বলিয়া গিয়াছেন—রামভক্তির এক দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই গ্রন্থ রচনা তিনি শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধ-কাণ্ডের চতুর্দ্দশ অধ্যায় অবধি গিয়া আর এটি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য গাবোয়া এটি সমাপ্ত

করেন। রুক্মিণী স্বয়ম্বর একনাথের আর এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কৃষ্ণ-রুক্মিণীর সুমধুর প্রেমরসের ভিয়ান চড়ানো হইয়াছে ইহাতে। ইহা ছাড়া, তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে রহিয়াছে চতুঃশ্লোকী ভাগবত, স্বাত্মসুখ ও কয়েক শত মনোজ্ঞ অভঙ্গপদ। এই সব রচনায় একনাথের অধ্যাত্ম অনুভূতি ও জীবনদর্শনই শুধু প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহার কবিত্ব শক্তির মহিমাও চমৎকার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উত্তরসূরী জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রভাব একনাথের মধ্যে যথেষ্টই আছে, কারণ জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতা, অমৃতানুভব এবং নামদেবের প্রেম-ভক্তি-আপ্লুত অভঙ্গের দ্বারা তিনি অনেকাংশে অনুপ্রাণিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজ সাহিত্য-কৃতিতে একনাথের স্বকীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিরসাত্মক সাহিত্য সৃষ্টি করিলেও জ্ঞানদেব ও নামদেব তাঁহাদের গুরু নাথযোগীদের দার্শনিক মতবাদ এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু একনাথের সময়ে মারাঠার ভক্তি-আন্দোলনে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রের প্রচার বাড়িয়াছে, ভক্তিধর্ম্ম তাহার উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে সনাতন ধর্ম্ম ও অবতার পুরুষদের লীলা কাহিনীতে। এই উৎস হইতেই, বিশেষ করিয়া ভাগবত পুরাণ হইতে একনাথ সংগ্রহ করিলেন তাঁহার অধ্যাত্ম-সাহিত্যের মূল রস, তারপর গুরুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী সহজ ভাষায়, সর্ব্বজনীন সংবেদনে, তাহা পরিবেশন করিলেন ভক্ত সাধারণের কাছে। ফলে অল্পকালের মধ্যে একনাথ চিহ্নিত হইয়া উঠিলেন এক ভক্তিসিদ্ধ আচার্য্যরূপে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এক নবতর খাতে হরিকথা ও হরিভক্তির রসপ্রবাহ সারা দেশে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। পৌরাণিক ভক্তিধর্ম্ম মারাঠায় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল তাঁহারই জীবন সাধনা ও সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়া।

অধ্যাপক পটবর্ধন একনাথের সাধনজীবন ও কবিত্ব শক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—একনাথের রচনায় অন্তরের আবেগধর্ম্মিতা ও ভাবরসের সহিত মিলিত হইয়াছে

ভক্তি-সাধনার পরমতত্ত্ব। তাই দেখা যায়, একনাথ শুধু একজন ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ মাত্র ছিলেন না, এই সঙ্গে তিনি ছিলেন অতি উচ্চ শ্রেণীর একজন ভাবুক কবি। প্রধানতঃ এই কারণেই একনাথ কীর্ত্তিত হন একজন অতিশয় জনপ্রিয় ধর্ম্মগুরু রূপে।[1]

ভক্ত কবি সিদ্ধপুরুষ একনাথের খ্যাতি পৈঠান ও পন্ধারপুর অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শত শত লোক আসিয়া ভীড় জমায় তাঁহার কীর্ত্তনের অঙ্গনে। মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন একনাথ স্বামী নামে।

একনাথের রচিত অভঙ্গপদে গুরুভক্তি ও গুরুর পদে আত্ম-সমর্পণের তত্ত্ব বার বার প্রচারিত হইয়াছে। একটি অভঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তিনি বলিতেছেন—

গুরুর দেওয়া বিপুল ঋণ
কি করে একনাথ শুধবে তার এই জীবনে ?
গুরু দেখিয়েছেন এক চমকপ্রদ ইন্দ্রজাল—
শিষ্য একনাথের অহমিকার তীব্র বিষ
নিঃশেষে করেছেন তিনি পান,
দৃষ্টি টেনে নিয়েছেন অন্তরের গভীরে,
যেখানে রয়েছে সেই দিব্য আলোকের উদ্ভাসন—
নেই কখনো যার উদয় আর অস্ত। (অভঙ্গ ৪)

গুরুর কৃপা হইতেছে পরশ-পাথর, যাহার স্পর্শগুণে শিষ্য ধন্য হয়, তাহার সর্ব্বসত্তায় ঘটে রূপান্তর। একনাথ আর একটি পদে গুরুদেব জনার্দ্দন স্বামীর মহিমা জ্ঞাপন করিতেছেন :

এ কি পরম বিস্ময় ঘটালেন গুরু আমায় দিয়ে,
হৃদয় কন্দরে করিলেন শ্রীভগবানের দর্শন।

১ অধ্যাপক পটবর্ধন : উইলসন ফিলসফিক্যাল লেকচার্‌স।

আর এমনি কৃপালু তিনি
ত্যাগ দুঃখের চরম মূল্য থেকে
দিলেন আমায় অব্যাহতি।
শোন তবে গুরু-কৃপার গোপন রহস্য।
এই কৃপার আলোয় সর্ব্ব বস্তু আর সর্ব্ব চরাচর
হয়ে ওঠে ঈশ্বরময়।
চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি,
যে আস্বাদ গ্রহণ করি জিহ্বায়,
সব কিছুতেই পাই ঈশ্বরের পরিচয়। (অভঙ্গ ৮)

ভক্তি আর নাম-সাধনা সম্পর্কে একনাথের বাণী বড় মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার মতে জীবন-প্রভু ঈশ্বরের নিরন্তর স্মরণই জীবন। আর ঈশ্বরের বিমুখতা ও বিস্মরণ হইতেছে মায়া-বিভ্রম।

স্মরণ মনন ও জপ কীর্ত্তনের যে কোন সাধনই শ্রীভগবানকে অমোঘ শক্তিতে আকর্ষণ করে, তিনি ছুটিয়া আসেন এই ধূলার ধরণীতে। একটি পদে একনাথ গাহিতেছেন—'সদা অনুধ্যানের ফলেই তো তিনি ত্রাণ করলেন যখন কোপন স্বভাব ঋষি ও তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা এসে চাইলেন ক্ষুধার অন্ন; অর্জ্জুনের ভাবনায় সদা জাগ্রত ছিলেন কৃষ্ণ, তাই তো প্রভু বাঁচিয়েছিলেন তাঁকে বার বার। ভক্তিতে শুধু শ্রীভগবান দর্শনই দান করেন না, ভক্তের বশ্যতাও তিনি স্বীকার করেন। এমনি তাঁর মহত্ব, আর এমনি ভক্তি-সাধনার মাহাত্ম্য':

সদা ভক্ত-বশ আমার পরম প্রভু—
দ্রৌপদীকে করেন উদ্ধার তার চরম বিপদে,
সুদামার দারিদ্র্য-দুঃখ মুহূর্ত্তে করেন দূর,
পরীক্ষিৎকে মাতৃজঠরে বাঁচাতো কে
যদি না হতো তাঁর কৃপাঘন দৃষ্টিপাত ?

গোবর্ধন ধারণ ক'রে, তার নীচে গিরিধর
রক্ষা করেন গাভী আর গোপগোপীদের।
গোরা কুমোরের সাথে বসে প্রভু আমার
শুকিয়ে তোলেন ভেজা মাটির ভাণ্ড।
চোখা মেলার সাথে চড়ান পশুর দল,
সাওতা মালীর পাশে বসে কাটেন বুনো ঘাস।
কবীরের সাথে টানা-পোড়েনে বুনেন কাপড়,
রুইদাসের সঙ্গী হয়ে চামড়ায় রং লাগান,
সজ্জন কষাইর মাংস বিক্রয়
আর স্বর্ণকার নরহরির সোনা গালানোর কাজে
হাত এগিয়ে দেন কৃপালু প্রভু।
জনাবাঈর গোবর সানন্দে বহন করেন তিনি,
আবার ভূমিকা নেন দামাজীর পারিয়া দূতের।

মহারাষ্ট্রের জনগণ পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল না। একনাথ স্বামী এই পরিচয় সাধিত করিলেন প্রধানতঃ তাঁহার একনাথী ভাগবত ও রামায়ণ ভাষ্যের মধ্য দিয়া।

জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতার প্রভাব একনাথের সাধনজীবন ও সাহিত্যকর্ম্মের উপর যথেষ্ট ছিল। একনাথ নিজে তাহা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায়, গুরুর আদেশে ভাগবত-অনুকূল ভক্তিপ্রেমের যে সাধনা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুকৃপায় যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, উত্তর কালে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শনে তাই প্রতিফলিত হইয়া উঠে অধিক পরিমাণে।

নিজের প্রেমভক্তি সাধনার অন্যতম উৎস ভাগবত সম্পর্কে একনাথের উক্তিটি বড় মনোরম। তিনি বলিতেছেন: শ্রীভাগবত হচ্ছে একটি বড় ক্ষেত। ব্রহ্মা প্রথমে এর জন্য প্রদান করেন শস্য-বীজ। নারদ এই ক্ষেতের অধিকারী, ঐ শস্য-বীজ তিনিই বপন

করেন তাঁর নিপুণ হস্তে। ব্যাসদেব করেন ঐ ক্ষেতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা—দশটি বাঁধ দিয়ে বেঁধে দেন এর চারদিকে। ফলে সে স্থান ভরে ওঠে দিব্য আনন্দ আর শান্তির ফসলে। শুক এই ফসল পাহারা দেবার ভার গ্রহণ করেন। হরিনাম অবিরত নিক্ষেপ করেন তিনি, আর পাপরূপ পাখীরা যায় দূরে পালিয়ে। ভক্ত উদ্ধব করেছিলেন কেটে-আনা শস্যের ঝাড়-বাছাই। কৃষ্ণজীর পরম বাণীর মূল্যবান শস্যকণা বার করে রেখেছিলেন তা' থেকে। এ থেকে তৈরী হয়েছে দিব্যলোকের সৌরভ মাখানো কত আহার্য্য। পরীক্ষিৎ এলেন তারপর। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে, শুক-দেবের মুখে পবিত্র ভাগবত কথা শুনে পান করেন তিনি ভাগবতী আনন্দের সুধা। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীধর ভাগবতের নিগূঢ় মর্ম্মকথার ওপর করেন আলোকপাত, দিব্য আনন্দ লাভ করে নিজে হন কৃতকৃতার্থ। জনার্দ্দন স্বামীর প্রিয় মক্ষিকা, একনাথ তাঁর মারাঠী ভাষার দুটি পাখনা মেলে উড়ে গিয়ে বসেছে সেই লোভনীয় আহার্য্যের ওপর, প্রাণভরে ভোজন করে হয়েছে ধন্য।"

ভক্তি-সাধনকে একনাথ স্বামী বলিয়াছেন—পরম ধামে যাইবার প্রশস্ত রাজকীয় পথ। শ্রীহরি স্বয়ং এ পথের রক্ষণাবেক্ষণকারী, পথে তিনি চক্র হস্তে দাঁড়াইয়া থাকেন। আক্রমণকারী দস্যু বা বৈরীদের করেন হনন। নিজস্ব অস্ত্র দিয়া প্রভু আরো একটি বড় কৃপার কাজ করেন। সাধনপথের বড় শত্রু—সাধকের অহংবোধ। এই অহং-বোধকে কৃপালু প্রভু চূর্ণ করেন তাঁর গদার আঘাতে। তাঁর মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে ভক্তের অন্তর, জ্ঞানালোক প্রবেশ করে তাতে। আর শ্রীহস্তের প্রস্ফুটিত কমল দিয়ে আপ্তকাম ভক্তের করেন তিনি সম্বর্দ্ধনা।

আদর্শ ভক্ত ও তাঁহার ভক্তিসিদ্ধির যে বর্ণনা একনাথ দিয়েছেন তাহা ভাগবত হইতেই নেওয়া :

—এই চরম অবস্থায় পথ ও লক্ষ্যবস্তু এক হয়ে ওঠে—ঈশ্বরের

বরণীয়, কৃপাপ্রাপ্ত দুই-চারিটি সাধকের ভাগ্যেই এটা ঘটতে দেখা যায়। একৈকনিষ্ঠা আর শরণাগতির ফলে, সাধক গুরুর কৃপা লাভে ধন্য হন, উপলব্ধি করেন আত্মার স্বরূপ। তিনি দেখতে পান, সব মানুষের হৃদয়েই বিরাজিত রয়েছে শ্রীহরির মন্দির। শ্রীহরিকে দেখেন তিনি ভিতরে ও বাইরে, সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে। তারপর ধ্যাতা আর ধ্যেয়ের ভেতর থাকে না কোন পার্থক্য। ভক্ত নিজেই হয়ে যান ভগবান—যিনি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন ওতপ্রোত। এখন থেকে অবস্থান, চলাফেরা সব কিছু ভগবানের মধ্যে, ভগবানের সারূপ্য লাভ করেন তিনি। নাম রূপ, কার্য্য কারণের বিভেদ ঘুচে যায়, এ অবস্থায় সর্ব্ববস্তুর মধ্যে প্রকৃত ভগবৎ-সত্তাকে তিনি দেখতে পান। সৃষ্টির এত কিছু বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে—এক ও অদ্বিতীয় পরমবস্তু শ্রীভগবানকে নিরন্তর করেন তিনি প্রত্যক্ষ। একনাথ বলেন, সর্ব্বভূতে ভগবৎ-দর্শন—এই হচ্ছে ভক্তি সাধনার চরম কথা। কিন্তু এ অবস্থা ভক্ত লাভ করতে পারে না—যদি না প্রভুর কৃপার আলোয় তাঁর হৃদয় হয় উদ্ভাসিত।[১]

গুরু জনার্দ্দন স্বামীর কৃপায় ও নিজের সাধন বলে একনাথ-স্বামী পরিণত হন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। নিজ জীবনে এই সিদ্ধি কি ভাবে আসিল, কি ছিল তখনকার অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, এ তথ্য তাঁহার কতকগুলি অভঙ্গপদে নিহিত রহিয়াছে।

একটি পদে তিনি গাহিতেছেন :

অন্তরাত্মায় অধ্যাত্ম-সূর্য্যের ঘটলো দীপ্তিময় প্রকাশ—
দেখলাম আমি, এ প্রকাশের নেই উষা,
নেই মধ্যাহ্ন বা অস্তাচল।
নেই এর কোন আদি বা অন্ত।
সম্মুখে আমার আত্মিক সূর্য্যের চির উদ্ভাসন,
পূর্ব্ব-পশ্চিমের পার্থক্য চিরকালের মত গেছে ঘুচে।

১ রাণাডে : মিষ্টিসিজম ইন মহারাষ্ট্র—পৃঃ ২৪৯

কর্ম্ম আর নৈষ্কর্ম্য দুই-ই হয়ে গেছে অর্থহীন
দিনের আকাশে চাঁদের ছায়ার মত।

একনাথ স্বামী ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ। বহুজনের বন্দিত, বহুজনের সাধনপথের আলোক দিশারী তিনি। কিন্তু গুরুদেব জনার্দ্দন স্বামীর নির্দ্দেশে, চিরদিন তিনি লোকালয়েই বাস করিয়াছেন, যাপন করিয়াছেন সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহস্থ জীবন। ঘৃতের প্রদীপের মত এই জীবন পবিত্রতা আর স্নিগ্ধতায় ভরা, এই প্রদীপের আলো বিকীর্ণ হয় প্রায় চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া। মহারাষ্ট্রের সহস্র সহস্র ভক্তের সাধনজীবন এই কল্যাণময় আলোকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

পৈঠানে একনাথের দিনচর্য্যা ছিল এইরূপ: প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি কিছুটা সময় ধ্যান-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। তারপর নদীতে গিয়া সমাপন করিতেন স্নান তর্পণ। এবার শাস্ত্রপাঠের পর্ব্ব। ভাগবত ও গীতার পাঠ ব্যাখ্যার আসরে সমবেত হইত অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী। দিব্যভাবে আবিষ্ট পরম বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল অতিথি সৎকার। অতিথিদের সঙ্গে নিয়া মিতাহারী একনাথ আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। বিশ্রামের পর অপরাহ্ণে আবার ভক্তিগ্রন্থ পাঠ। জ্ঞানেশ্বরী গীতা বা ভাগবত এই দুইটি প্রিয় গ্রন্থ প্রধানতঃ তিনি আলোচনা করিতেন। শ্রোতাদের মধ্যে তখন বহিয়া যাইত প্রেম-ভক্তি রসের প্রবাহ। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল একনাথের সান্ধ্য সংকীর্ত্তন। নিজের রচিত অভঙ্গ পদ গাহিয়া-গাহিয়া একনাথ স্বামী ভাবরসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন। ভক্তদের মধ্যে জাগিয়া উঠিত ভক্তিপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনা। দূর-দূরান্ত হইতে বহু দর্শনার্থীর আগমন ঘটিত পৈঠানের এই বৈষ্ণব মহাত্মাকে দর্শনের জন্য।

একনাথ ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব, ভক্তেরা ভগবানের আপনজন,

প্রিয়জন, তাঁহাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য থাকিবে, তাঁহার কাছে এই চিন্তা ছিল অসহনীয়। কীর্ত্তনের আসরে উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ, সকলের সঙ্গে তিনি একসঙ্গে উপবেশন করেন, নির্ব্বিচারে যে কোন জাতির ভক্ত অতিথিদের নিয়া ভোজনে বসেন, গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ইহা সুচক্ষে দেখেন নাই। কঠোর ভাষায় তাঁহারা একনাথের এই আচরণের বিরুদ্ধে বলাবলি করিতে থাকেন।

একনাথ এ বিষয়ে একেবারে নির্ব্বিকার; স্বরচিত অভঙ্গপদে তিনি গাহিলেন[১]—

হো কাঁ বর্ণামাজী অগ্রণী।
যো বিমুখ হরিচরণী।
ত্যাহূনি শ্বপচ শ্রেষ্ঠ মানী—
জো ভগবদ্ ভজনী প্রেমল।

—শ্রীহরির চরণকমল থেকে যে বিমুখ, বর্ণের দিক দিয়ে অগ্রণী হয়েও সে যে নিষ্ফল, ব্যর্থ। তার থেকে সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ যদি সে প্রেমভরে করে ভগবদ্ ভজন।

পৈঠান ও তাহার কাছাকাছি গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা স্বভাবতঃই রক্ষণশীল। একনাথ স্বামীর নৃত্য কীর্ত্তন ও ধর্ম্ম উপদেশ সমাজে বিশৃঙ্খলা আনিতেছে, সমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নিতেছে বলিয়া তাহারা সোরগোল তুলিলেন। জনগণের মধ্যে একনাথের প্রভাব দিন দিনই বৃদ্ধির পথে, ইহাতেও অনেকের ঈর্ষার অবধি নাই। শুরু হইল নানা নিন্দাবাদ। বিরোধীরা রটাইলেন, একনাথের-গুরুকরণ হয় নাই। সত্যকার কোন সাধনা ও সিদ্ধিও তাঁহার নাই। যশ ও অর্থের লোভে তিনি ভূয়া আচার্য্যগিরি করিতেছেন, লোক ঠকাইয়া বেড়াইতেছেন।

এই সব দুর্নাম একনাথ স্বামী শুনিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কিছুমাত্র

১ উজ্জীবন, আষাঢ় ১৩৭৫, মধ্যযুগের ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য।

বিচলিত হইতে দেখা গেল না। উদার ক্ষমাসুন্দর সাধক ইহার উত্তরে যাহা লিখিলেন যে কোন সাধক বা সমাজ-সংস্কারকের কাছে তাহা চিরকাল স্মরণ রাখার মত।

নিন্দক কামাচা কামাচা।
গড়ী আত্মারামাচা।
নিন্দক আমুচী গঙ্গা।
আমুচী পাতকেঁ নেতে ভঙ্গা।
নিন্দক আমুচা সখা।
আমূচী বস্ত্রে ধুনো ফুকা।
নিন্দক আমুচী কাশী।
আমুচী পাতকেঁ অবধী নাশী—
নিন্দক আমুচা গুরু
একা জনার্দ্দন থোরু।[১]

—নিন্দুকেরা আমার অতি প্রিয়, কারণ তারা যে সৃষ্ট একই আত্মারামের দ্বারা। নিন্দুকেরা যেন গঙ্গার পবিত্র ধারা, আমাদের যত কিছু পাপরাশি করছে বহন। নিন্দুকেরা আমাদের সখা, আমাদের কলুষিত বস্ত্র বিনামূল্যে দিচ্ছে ধুয়ে। নিন্দুকেরা আমার কাশী, সব কিছু পাপ করছে বিনষ্ট। নিন্দুকেরা আমার গুরু, কারণ, তারাই যে আমায় গড়ে তুলেছে জনার্দ্দন স্বামীর শিষ্যরূপে।

সাধক-কবি হিসাবে একনাথ স্বামীর তুইটি অবদান ধর্ম্মসংস্কৃতির ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। প্রথমত, আপন রচনার মাধ্যমে বেদান্তের তত্ত্বকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার ভক্তি সাহিত্য মারাঠী ভাষায় রচিত হওয়ার ফলে মারাঠী জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

১ উজ্জীবন, আষাঢ় ১৩৭৫, মধ্যযুগের ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য।

বেদান্তের উচ্চতর তত্ত্বের আলোচনা আগে শুধু সংস্কৃতে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার তাহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, সমাজের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। একনাথের অভঙ্গপদ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গীত হইত। একনাথী ভাগবত ও রামায়ণ পঠিত হইত বহুতর ধর্ম্মসভায়। কাজেই তাঁহার তত্ত্ব ও আদর্শের প্রচার দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলে।

পূর্ব্বসূরী জ্ঞানদেব তাঁহার গীতাভাষ্যে বেদান্তের তত্ত্ব আলোচনা যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদেবের দার্শনিক তত্ত্ব ও তাঁহার ভাষা ছিল জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। তাঁহার দর্শন-ব্যাখ্যা ছিল মেঘলোকের মত ধোঁয়াটে, সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার উর্দ্ধে। কিন্তু একনাথের ব্যাখ্যা ছিল অতি প্রাঞ্জল, গ্রাম্য মানুষের পক্ষেও তাহার রসস্বাদ গ্রহণ করা কঠিন হইত না। মর্ত্তের মানুষের কাছে স্বর্গীয় সুধা তিনি যেন নির্ব্বিচারে অকৃপণ করে বিলাইয়া গেলেন।[১]

মারাঠীতে রচিত একনাথের ধর্ম্মসাহিত্যের প্রশংসায় মুখর হইয়া অধ্যাপক পটবর্দ্ধন লিখিয়াছেন: "পণ্ডিতদের জন্য লিখে নাম-যশের অধিকারী হবার ইচ্ছে একনাথের ছিল না। তিনি লিখেছিলেন সমাজের সর্ব্ব স্তরে সত্যবোধ ও জ্ঞানের আলোক বিস্তারের জন্য। স্ত্রীলোক, শূদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের কল্যাণেই লেখনী ধারণ করেছিলেন তিনি। পণ্ডিতের ঘৃণাকে তিনি করতেন ঘৃণা, আর লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দেশবাসীর দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে সদাই লিখে চলতেন দেশজ ভাষায়।

"দেশজ ভাষার জন্য তাঁকে অসম সাহসে যুঝতে হয়েছিল—এবং এতকালের ব্যবধানেও, আজকের দিনেও, দেশজ ভাষার লড়াই আমাদেরও কম চালিয়ে যেতে হচ্ছে না। তখনকার দিনে সংস্কৃত জানা পণ্ডিতরা ছিলেন গর্ব্বস্ফীত—মারাঠী ভাষা হচ্ছে অশিক্ষিত, নিম্নস্তরের গ্রাম্য লোকের ভাষা, এ ভাষায় লিখে নিজেকে হেয়

---

১ রাণাডে: মিষ্টিসিজম ইন মহারাষ্ট্র—পৃ ২৫০

করবো কেন—এই ছিল তাঁদের মনোভাব। একনাথ তাঁর মহান পূর্ব্বসূরী জ্ঞানদেবেরই অনুসরণ করে চললেন। অন্ধ মূক জনগণের জন্য তাঁহার হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—ঐ হতভাগ্য জনগণের হৃদয়ে প্রবেশের পথ হচ্ছে তাদের মাতৃভাষা। তাই সেই ভাষাতেই নিজের ভক্তি সাহিত্য তিনি রচনা করলেন।”

দেশজ ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ রচনার জন্য কাশীর শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা একনাথকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের রক্ষণশীল বিরোধিতাও বার বার তাঁহার বিরুদ্ধে উদগ্র হইয়া উঠে। এমনকি ঘরের মধ্যে নিজের পুত্রের গঞ্জনাও তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হয় নাই। এই প্রতিকূল পরিবেশে যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় নিয়া তিনি নিজের আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

পুত্র হরি শাস্ত্রী সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। একদিন পিতাকে তিনি খুব চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, “পিতা, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশে আমাদের জন্ম। সারা দেশের এক শ্রেষ্ঠ সাধকরূপে,—সুপণ্ডিত ও আদর্শবাদী আচার্য্যরূপে, আপনার কত সুনাম। আপনার মত লোক মারাঠী ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ লিখবেন, ভাষণ দেবেন? উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা এ নিয়ে আপনার কত নিন্দাবাদ করছেন।”

“এসব তো আমার অজানা নয়, বৎস, তা এখন তোমার মূল বক্তব্যটা কি বল দেখি?” প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন একনাথ স্বামী।

“আমার বক্তব্য আর সারা দেশের পণ্ডিতসমাজের বক্তব্য একই। এখন থেকে আপনি সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করুন আপনার ধর্ম্মগ্রন্থ। প্রয়োজনমত মারাঠী সাহিত্যিকেরাই তা থেকে অনুবাদ করে নেবেন। হ্যাঁ, আমাদের বিশেষ অনুরোধ, মারাঠী ভাষায় আপনি আর লিখবেন না, ভাষণও দেবেন না।”

“এ অনুরোধ অন্যায়। জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর, বৎস।”

অতঃপর স্বরচিত একটি অভঙ্গপদে একনাথ দেশবাসীকে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ

সংস্কৃত বাণী দেবেঁ কেলী—
প্রাকৃত ওরী চোরাপাসুনী ঝালী
অসোত যা অভিমান ভুলী।
বৃথা বোলী কায় কাজ—
আতাঁ সংস্কৃতা অথবা প্রাকৃতা।
ভাষা ঝালী জে হরি কথা
তে পাবনাচে তত্ত্বতাঁ
সত্য সর্বথা মানলী—
দেবাসি নাহীঁ বাচাভিমান
সংস্কৃত প্রাকৃত তায় সমান।
জ্যা বাণী জাহলেঁ ব্রহ্মকথন
ত্যা ভাষা শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষে॥

—সংস্কৃত ভাষা কি দেবতার সৃষ্টি ?
আর প্রাকৃত সৃষ্টি করেছে চোরেরা ?
আসলে অহমিকার জালে
ভুল করে বলা হয় এমনতরো কথা।
আসলে সংস্কৃত বা প্রাকৃত যা-ই হোক,
যে ভাষা বর্ণনা করে হরিকথা—
পবিত্র আর সত্য বাণী রূপে
সবাই মোরা দিই তার সম্মান।
ভাষা নিয়ে দেবতার নেই পক্ষপাত,
সংস্কৃত আর প্রাকৃত দুই-ই তুল্য তাঁর কাছে।
ব্রহ্মবাণী, ব্রহ্মজ্ঞান যে ভাষাতে হয় বর্ণন
তাতেই যে হয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ।

পৈঠান এবং পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়া একনাথ স্বামী অতিবাহিত করেন প্রায় চল্লিশ বৎসর। কর্ম্মময় ও সাধনময় এই দীর্ঘ জীবনে তাঁহাকে ঘিরিয়া গঠিত হয় একটি বিরাট ভক্ত দল। শত শত ভক্ত সাধককে অন্তরঙ্গ ভক্তিসাধন দিয়া তিনি কৃতার্থ করেন, আর সহস্র সহস্র সাধারণ মানুষ তাঁহার ভাবসমৃদ্ধ কীর্ত্তন, ভাষণ ও ধর্ম্মসাহিত্য হইতে লাভ করে প্রেমভক্তির উদ্দীপনা।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে পৈঠানে নিজ গৃহের অঙ্গনে হরিকথা বলিতে বলিতে এই হরিময় ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ সজ্ঞানে অমরলোকে প্রয়াণ করেন।

বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী

উত্তর ভারতের সাধক ও সারস্বত সমাজের এক অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়পাদ হইতে শুরু করিয়া অর্দ্ধশত বৎসরেরও অধিককাল অধ্যাত্ম-ভারতের প্রাণকেন্দ্র বারাণসীতে এই মহাত্মা বিরাজিত থাকেন, বিস্তারিত করেন তাঁহার তপস্যার আলোক। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ দুই-ই দলে দলে শরণ নিত এই মহাত্মার চরণে। ত্যাগ বৈরাগ্য ও জ্ঞানের হরিহর-মূর্ত্তি এই মহাসাধকের জীবন হইতে সংগ্রহ করিত মুক্তিপথের পাথেয়।

বিশুদ্ধানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের পিতার নাম সংগমলাল, মাতা যমুনা দেবী। উত্তর প্রদেশের বৌড়ী গ্রামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ বংশে সংগমলালজীর জন্ম। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ছিল না। ভাগ্য অন্বেষণে দেশের নানাস্থানে ঘোরাফেরা করিয়া অবশেষে তিনি হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কল্যাণী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। সবসুখরাম এখানকার নবাব সরকারের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, ইঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া সংগমলাল সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে সবসুখরামের ভগিনী যমুনাদেবীকে বিবাহ করেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীর পুণ্যদিনে মাতুলগৃহে বিশুদ্ধানন্দের জন্ম হয়। গৌরকান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর এই নবজাত শিশুটিকে পাইয়া সকলের আনন্দের অবধি নাই।

জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে জন্ম, তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া শিশুর নাম রাখা হইল—বংশীধর। পিতা সংগমলালজী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া শহরের এক জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া আনিলেন। ইতিপূর্ব্বে পর পর দুইটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পকাল মধ্যে মারা গিয়াছে। তাই নবজাত শিশুটিকে নিয়া দুশ্চিন্তার অবধি নাই। কিন্তু জন্মলগ্ন বিচার

করিয়া জ্যোতিষী কহিলেন, "আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এ শিশু দীর্ঘজীবী হবে, শুধু তাই নয় সহস্র সহস্র মানুষকে সে দেবে আশ্রয়।"

বৎসর খানেক পরে ধুমধাম করিয়া বংশীধরের অন্নারম্ভ উৎসব সম্পন্ন হয়। শিশুর কল্যাণের জন্য পূজা হোম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও কম করা হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকালের মধ্যে বংশীধর আক্রান্ত হয় দুশ্চিকিৎস্য রোগে। তাহার দেহে দেখা দেয় মূর্চ্ছা বা অপস্মার রোগ। এ রোগের আক্রমণের শেষে দেহটি দুর্ব্বল ও অসাড় হইয়া পড়িত।

দিন দিন শিশুর দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। সকলেরই ধারণা হয়, এ মৃগী রোগ আর সারিবার নয়। সারা গৃহে নামিয়া আসে বিষাদ ও হতাশার অন্ধকার।

মাতুল সবসুখরাম বড় ভালবাসেন বংশীধরকে। অবসর পাইলেই মাঝে মাঝে তাহাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হন, নানা গল্পকথায় তাহাকে উৎফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করেন।

বংশীধরের বয়স তখন চার বৎসর। মাতুলের সঙ্গে একদিন সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখা যায় বালকের অদ্ভুত ভাবান্তর। চোখদুটি বিস্ফারিত, ভাবাবেশে সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মাতুলের হাতটি সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া হঠাৎ সে থামিয়া পড়ে। ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া সবসুখরাম প্রশ্ন করেন, "কিরে বংশীধর কি হয়েছে? অমন করছিস কেন? আমায় কিছু বলবি?"

"মামাজী, মামাজী! আমার কেতাব কোথায়?" উত্তেজিত স্বরে বলিতে থাকে বালক বংশীধর।

"কোন্ কেতাব, কিসের কেতাব, ভাল করে বুঝিয়ে বল, এখনই তোকে আমি তা কিনে দিচ্ছি।"

"আমার নিজের সেই কেতাবটি এনে দাও। তা পেলেই আমার

ব্যারাম সেরে যাবে। আমি ভালো হয়ে উঠবো।” মোহগ্রস্তের মত কথাটি সে বার বার আওড়ায়।

সবসুখরাম ভাবেন, রোগে ভুগিতে ভুগিতে বালকের মস্তিষ্কের ধারণশক্তি কমিয়া গিয়াছে। মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপিয়াছে, একটা বই চাই। তাই নিয়াই সে এমন উত্তেজিত। বাড়ীতে ফিরিয়া রংবেরং-এর বই দুই চারটি আনিয়া দিলেন, কিন্তু বংশীধরের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নাই। এগুলি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে কাঁদিতে বসে তাহার কোন্ এক কাল্পনিক বই-এর জন্য।

মাতুল সান্ত্বনা দেন, “বেশ তো, বংশী, এনে দেবো তোর বই। কিন্তু কোথায় রয়েছে তা তো বলবি।”

সজলচক্ষে বালক উত্তর দেয়, “তা রয়েছে আমার কুঠিয়ায়। শিগ্‌গীর তোমরা খুঁজে নিয়ে এসো। নইলে আমি বাঁচবো না।” এ অদ্ভুত কথার কি রহস্য তা কে জানে? বাড়ীর লোকেরা আর ইহা নিয়া মাথা ঘামান নাই।

অসুখ কি করিয়া ভাল হইবে, এই চিন্তায় জননীর মনে কিন্তু একটুও শান্তি নাই। সাধুসন্তের সন্ধান পাইলেই তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া যান। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাঁহাকে ঘরে আনাইয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করান, কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হইতেছে না। যমুনাদেবী ক্রমে একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন।

কল্যাণীতে সে-বার এক সতীদাহ অনুষ্ঠিত হইবে। একটি ক্ষত্রিয়া নারী পতির চিতায় আরোহণ করার সঙ্কল্প নিয়াছেন; সংবাদ পাইয়া দলে দলে লোক ছুটিয়া চলিয়াছে শ্মশানের দিকে।

সাধারণ মানুষের ধারণা, চিতাশয্যায় উপবিষ্টা সতী নারীর আশীর্ব্বাদ একেবারে অমোঘ, তাহা কখনো ব্যর্থ হয় না। যমুনাদেবী স্থির করিলেন, বালক বংশীধরকে নিয়া সতীর কাছে যাইবেন, রোগমুক্তির জন্য মাগিবেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ।

চিতাশয্যার কাছে গিয়া সাশ্রুনয়নে পুত্রের জটিল রোগের কথা

নিবেদন করা মাত্র সতী বলিয়া উঠেন, "বহিন, তুমি তোমার এ ছেলের জন্য মোটেই ভেবো না। সিদ্ধযোগীর চিহ্ন রয়েছে এর দেহে। অকালমৃত্যু কখনো এর ঘটবে না। তবে একে হয়তো তোমরা ধরে রাখতে পারবে না, ঘর ছেড়ে এ ছেলে সন্ন্যাসী হবে।"

পুত্রকে নিয়া যমুনাদেবী গৃহে ফিরিয়া আসেন। যে কারণেই হোক, বেশ কিছুদিন বংশীধর মূর্চ্ছা-রোগে আক্রান্ত হয় নাই। কিন্তু বৎসরখানেক বাদে আবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে শুরু করে। আত্মীয়স্বজনদের উদ্বেগ আরো বাড়িয়া যায়।

কল্যাণীর কাছেই কীর্ণা ও মঞ্জিরা নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থল। প্রতি বৎসর হাজার হাজার নরনারী এখানে স্নান করিতে আসে। একটি বৃহৎ মেলা উৎসবও এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সবসুখরাম আত্মপরিজন ও বন্ধুদের নিয়া সে-বার এই মেলায় আসিয়াছেন। স্নান-তর্পণের শেষে একজন সঙ্গী কহেন, "এখানে ঘাটের খুব কাছেই একটা পর্ণ কুটিরে একান্তে বাস করেন এক বড় মহাত্মা। যাবে তাঁকে দর্শন করতে?"

সাধুদর্শনের কথায় সবাই মহা উৎসাহী হইয়া উঠে। সবসুখরাম বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বলেন, "না, এত লোক নিয়ে গিয়ে মহাত্মার শান্তিভঙ্গ করা ঠিক নয়। ছোট ছেলেমেয়েরা এই ঘাটে বসে থাকুক। চল, আমরা আর সবাই সেখানে যাই।"

সঙ্গীরা সবাই এ কথায় সায় দেয়—কিন্তু গোল বাধাইয়া বসে পাঁচ বৎসরের বালক বংশীধর। সে বায়না ধরে, "না—আমি যাবোই সাধুজীকে দেখতে। আমায় নিয়ে চল। আমি এখানে থাকবো না।"

বালককে বুঝাইয়া নিরস্ত করা যায় না, তখনি সে শুরু করে চীৎকার আর কান্না। মাতুলকে হার মানিতে হয়, বংশীধরসহ সবাইকে নিয়া উপস্থিত হন সাধুর আশ্রমে।

প্রণাম নিবেদনের পর সাধু একে একে সবাইকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। এবার বালকের দিকে সহাস্যে তাকাইয়া মাতুল

সবসুখরাম কহেন, "বংশী এখানে আসবার জন্য তো এতো কাঁদাকাটি কর্‌লি। কিন্তু এসে কি তোর লাভ হলো, বলতো ?"

বলিক ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পর্ণকুটিরের এদিক ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন সে খুঁজিয়া বেড়ায়। হঠাৎ দৃঢ় স্বরে সে বলিয়া বসে, "মামাজী, এই তো, এই কুঠিয়ার ভেতরেই আছে আমার সেই কেতাব, আমার নিজের হাতে লেখা কেতাব। হ্যাঁ, এখানেই রয়েছে।"

মহাত্মার দিকে ফিরিয়া সবসুখরাম যুক্তকরে বলেন, "প্রভু, দেখুন এ বালক কি বল্‌ছে। তার নিজের হাতে লেখা একটা বই নাকি এখানে রয়েছে। এ বইয়ের কথা আগেও ওর মুখে আমরা শুনেছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি, এর ভেতরে কোনও রহস্য আছে কিনা, তা আমরা কি করে বুঝবো ?"

মহাত্মা শান্ত স্বরে কহেন, "আর কি বলে এই বালক, আমায় খুলে বল তো ?"

"প্রভু, আমার এই ভাগ্নেটি মৃগীরোগে ভুগছে অনেকদিন। শরীর বড় দুর্ব্বল, আর বেশী দিন বাঁচবে বলে মনে হয় না। এই বই প্রসঙ্গে বালক কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলে। এ বই ওর নিজস্ব বই, আর এটা খুঁজে পেলে ওর রোগ নাকি সেরে যাবে। এখন আপনার আশ্রমে এসে তো দৃঢ়স্বরে বলছে বইটি এখানেই রয়েছে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সাধু মহারাজ কহেন, "ছাখো, এ বালক কিন্তু ঠিক বালকভাব থেকে কথাগুলো বলছে না, একটা দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। তোমরা তন্ন তন্ন করে আমার কুটিরে অনুসন্ধান করো। কোন পুরাণো হাতে-লেখা পুঁথি আছে কিনা, ছাখো।"

ছোট খড়ো ঘর। গ্রন্থপেটিকা ছাড়া অন্য আসবাবপত্র তেমন বেশী কিছু নাই। অনুসন্ধানের কাজ শেষ হইল, কিন্তু বালকের কথিত বই-এর পাণ্ডুলিপি কোথাও পাওয়া গেল না।

ভাবাবিষ্ট বংশীধরের দেখা গেল এক নূতন রূপ। কি এক অজ্ঞাত আনন্দে সে ভরপুর। সারা দেহ রোমাঞ্চিত, কম্পমান। দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু, নাসিকায় ঘন ঘন বহিতেছে দীর্ঘশ্বাস। আত্মপ্রত্যয়ের সুরে সে বলিয়া ওঠে, "কুটিরের চালের বাতা ভাল করে খুঁজে ছাখো। ওখানেই পাবে আমার বই। হ্যাঁ, আর ভয় নেই, এবারে আমার রোগ যাবে পালিয়ে, তোমাদেরও আর থাকবে না কোন কষ্ট।"

বালকের নির্দ্দেশিত সেই স্থানটিতেই পাওয়া গেল একখানি পুরাতন হস্তলিখিত জীর্ণ পুঁথি, এক খণ্ড কাপড় দিয়া সযত্নে জড়ানো।

বংশীধরের হাতে বইয়ের মোড়কটি দেওয়া মাত্র চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ভাবাবেশ অন্তর্হিত হয়। স্বাভাবিক বালক-ভাব আবার ফুটিয়া উঠে তাহার দেহে-মনে

সাধুজী গ্রন্থটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করেন, বিস্ময়ে তাঁহার চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠে। সজল চক্ষে আবেগভরা কণ্ঠে কহেন, "এ যে আমার গুরুদেবের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ। গীতার নির্য্যাস এতে তিনি লিখেছেন, এ গ্রন্থ তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। পাঁচ বৎসর আগে, তাঁর দেহান্তের প্রাক্কালে বার বার এটি তিনি চেয়েছিলেন। তখন খুঁজে পাওয়া যায় নি এবং এ জন্য মর্ম্মাহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

উপস্থিত সকলে তো এ কাহিনী শুনিয়া মহা বিস্মিত। সবসুখরাম কৌতূহলভরে প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, সেই গ্রন্থের সঙ্গে এ বালকের কি সম্পর্ক তাতো বুঝতে পারছিনে। একটু বিশদ করে বলুন।"

"ভগবান গীতাতে বলেছেন, মৃত্যুর সময়ে মানুষ যে ভাবে ভাবিত হয় পরবর্তী জীবনে সেই ভাব ও সেই সংস্কার উদ্গত হতে দেখা যায় তার ভেতর। তোমাদের এই জাতিস্মর বালক পূর্ব্বজন্মে ছিলেন আমাদের গুরুদেব। এ আশ্রমেরই অধ্যক্ষ তিনি ছিলেন। এখন থেকে এর দেহ রোগমুক্ত হলো। তোমরা দেখো, অদূর

ভবিষ্যতে এর সাত্ত্বিক সংস্কার জেগে উঠবে। আর পূর্ব্বজন্মের মত এ জন্মেও গ্রহণ করবেন সন্ন্যাস-জীবন।”

অতঃপর বাড়ির সবার সঙ্গে বংশীধর কল্যাণীতে ফিরিয়া আসে। এই ঘটনার পর হইতে আর কোনদিন কিন্তু মূর্চ্ছা-রোগে সে আক্রান্ত হয় নাই। ধীরে ধীরে সে একটি সুস্থ সবল কিশোরে পরিণত হয়।

কিশোর বংশীধরের জীবনে এবার আসে এক বড় দুর্দ্দৈব। অল্পদিনের ব্যবধানে পিতামাতা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মাতুল সবসুখরাম এই কিশোর ভাগ্‌নেটিকে বড় ভালোবাসেন। এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন বংশীধরের সকল কিছু দায়িত্ব। শিক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিয়া প্রকৃত মানুষরূপে তাহাকে গড়িয়া তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হন।

ভট্টজী নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত নিকটেই থাকেন, তাঁহার টোলে বংশীধরকে পড়িতে দেওয়া হয়। বালক অতি অল্প সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতির পাঠ শেষ করিয়া ফেলে। স্মৃতিশক্তি তাহার অতিশয় প্রখর, একবার যাহা শ্রবণ করে, আর কখনো বিস্মৃত হয় না। শিক্ষাগুরু ভট্টজী এজন্য তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন, ডাকিতেন শ্রুতিধর বলিয়া।

কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ বেদান্ত পাঠে অতিবাহিত হয়। অতঃপর সবসুখরাম বংশীধরের ফার্সী ও মারাঠী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই দুইটি ভাষার উপর দখল না থাকিলে তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যে কেহ সরকারী দপ্তরে উন্নতি করিতে পারিত না। তাই সবসুখরাম তাড়াতাড়ি ভাগ্‌নেকে এই ভাষা দুইটি শিখাইয়া নিতে চেষ্টিত হন। প্রতিভাধর বংশীধরও অনতিবিলম্বে ইহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

বংশীধর তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সুন্দর সুঠাম দেহ ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য সহজেই আকর্ষণ করে। খেলার মাঠে

দৈহিক শক্তি ও মনোবলের দিক দিয়া কেহই তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

মাতুল সবসুখরাম নবাব সরকারের সেনাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাছাড়া, নবাব মমতাজ্জল ওমরাহ্ তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন। তাই সবসুখরাম ভাবিলেন, ভাগ্নেকে সেনা বিভাগে ভর্ত্তি করাইয়া দিবেন। দৈহিক বল, সাহস ও দক্ষতা বংশীধরের যথেষ্ট। কাজেই এ বিভাগের কাজে তাড়াতাড়ি সে উন্নতি করিতে পারিবে। এসব ভাবিয়া বংশীধরকে অশ্বচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ করিয়া তুলিতে তিনি উদ্যোগী হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়, বংশীধর একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর সুযোগমত মাতুল তাঁহাকে সেনাদলের শিক্ষা-নবীশের কাজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

নবাবের সেনা শিবিরে সেদিন একটি তেজী আরবী ঘোড়া কেনা হইয়াছে। বড় দুরন্ত ও চঞ্চল এই ঘোড়াটি, সহজে বশে আসিতে চায় না। সওয়ার তেমন দক্ষ নয় বুঝিলেই ঝাঁকুনি দিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয়। তাই এ ঘোড়াটি নিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বড় সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। বংশীধর কহিল, "আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমি এই দুষ্টু ঘোড়াটাকে সায়েস্তা করতে পারি।"

দুর্দ্ধর্ষ ঘোড়াটি নিয়া শিবিরের অধ্যক্ষের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। কহিলেন, "এতো খুব ভালো কথা। বংশীধর, তুমি এখনই ঘোড়াটাকে কিছুক্ষণ ছুটিয়ে নিয়ে এসো।"

বংশীধরের অপর দুই শিক্ষানবীশ বন্ধু সেখানে দণ্ডায়মান। ইঁহাদের একজন নবাবের পুত্র মেহেদি হুসেন, অপরজন বব্বর হুসেন —নবাবের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র। সেনাবিভাগের নূতন শিক্ষার্থিদের মধ্যে বংশীধর সাহস, কৌশল ও দক্ষতায় শীর্ষস্থানীয়। তাই উপরোক্ত দুই বন্ধুর কিছুটা ঈর্ষা আছে তাঁহার প্রতি। বংশীধরকে কোন কৃতিত্বের সুযোগ দিতে তাহারা ইচ্ছুক নয়। ভয় দেখাইয়া তাহারা

বলে, "এই পাগ্‌লা ঘোড়াটায় সওয়ার হয়ে, কেন ভাই শুধু শুধু প্রাণটা খোয়াবি ?"

বংশীধর নিরস্ত হওয়ার পাত্র নয়। হাসিয়া বলে, "দেখি একবার কে জেতে, ঘোড়া না তার সওয়ার।"

এই আরবী ঘোড়ার উপর অবলীলায় সে চড়িয়া বসে। অদ্ভুত কৌশলে তাকে আয়ত্তে আনে, তারপরে সপাসপ্‌ চাবুক চালাইয়া বহুদূরে এটিকে নিয়া উধাও হইয়া যায়। উর্দ্ধশ্বাসে কয়েক ঘণ্টা অবিরাম দৌড়ানোর পর ঘোড়াটি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শিবিরে ফিরিলে দেখা যায়—পূর্ব্বের সে অবাধ্যতা আর নাই, দুর্দ্ধর্ষ আরবী ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে তাহার সওয়ারের বশে আসিয়া গিয়াছে। উপস্থিত অনেকেই বংশীধরকে সাধুবাদ করিতে থাকে।

ঘোড়াটিকে দানাপানি দিয়া আদর জানাইয়া বংশীধর ঘরে ফিরিয়া যায়। পরের দিন ভোরে উঠিয়াই কিন্তু শুনে এক দুঃসংবাদ। এত পরিশ্রম করিয়া যে ঘোড়াটাকে সে আয়ত্তে আনিয়াছে গত রাত্রে সেটি হঠাৎ মারা গিয়াছে।

শিবিরের অধ্যক্ষ বড় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। নবাব বাহাদুর নিজে সখ করিয়া, বহু অর্থব্যয়ে এই তেজী আরবী ঘোড়াটি বিদেশী বণিকদের কাছ হইতে কিনিয়াছেন। এটির মৃত্যু হইয়াছে শুনিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিবে না।

এদিকে বংশীধরের সাফল্যে নবাবের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরও শুরু হয়েছে গাত্রদাহ। তাড়াতাড়ি নবাবকে তাহারা ঘোড়াটির মৃত্যু-সংবাদ দেয়। আরো জানায়, "এজন্য দায়ী বংশীধর। অবিরাম চাবুক মেরে ঘোড়াটাকে অনর্থক সে দূর দূরান্তে ছুটিয়েছে। অতিরিক্ত শ্রান্ত হবার ফলেই ঘটেছে তার মৃত্যু।"

নবাব বাহাদুর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। বংশীধরকে তখনি সেখানে ডাকাইয়া আনা হয়। অভিযোগ শুনিয়া শান্তস্বরে সে বলে, "হুজুর, কাল সন্ধ্যার পর আস্তাবলে ফিরে এসে ঐ ঘোড়া আমার

হাত থেকে সাগ্রহে দানাপানি খেয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় পশুরা সহজে কোন কিছু খেতে চায় না। কিন্তু এ ঘোড়াটি খেতে তখন কোন অনিচ্ছা প্রকাশ করে নি। কাজেই বহুক্ষণ ছুটাছুটির পরেও সে বেশ সুস্থই ছিল। মৃত্যু ঘটেছে গভীর রাতে। হয় কোন সংক্রামক রোগে, নয় তো সহিসদের দোষে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এজন্য আমাকে দায়ী করা কি সঙ্গত ?"

নবাব রুষ্ট হইয়াই আছেন, এ কথায় কোন কান দিলেন না। বংশীধরের জন্য ব্যবস্থা হইল হাজতবাসের। মাতুল সবসুখরাম দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তি, তিনি কাছে থাকিলে নবাবকে বুঝাইয়া নরম করিতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী কাজে কয়েকদিনের জন্য তিনি হায়দ্রাবাদে গিয়াছেন। কাজেই বংশীধরকে হাজতে প্রবেশ করিতেই হইল।

কয়েকদিনের মধ্যেই সবসুখরাম কল্যাণীতে ফিরিয়া আসিলেন। আনুপূর্ব্বিক সব ঘটনা শুনিয়া তিনি তো স্তম্ভিত। অতঃপর নবাব বাহাদুরকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তিনি শান্ত করেন, ভাগিনেয়কে মুক্ত করেন হাজতবাস হইতে।

এদিকে এ কয়দিন কারাকক্ষে বাস করার ফলে বংশীধরের অন্তরে জাগিয়াছে নির্ব্বেদ, সংসারের সব কিছুতে আসিয়াছে চরম বিরক্তি। বসিয়া বসিয়া কেবলই ভাবেন, যেখানে প্রতি পদে ঈর্ষা, স্বার্থবুদ্ধি আর বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গীন উঁচানো, সেখানে কোথায় আনন্দ, কোথায় শান্তি ? নাঃ, এমন স্থানে বাস করার কোন সার্থকতা নাই। এর চাইতে সন্ন্যাসী হইয়া পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ানো অনেক ভাল।

কল্যাণীর একপ্রান্তে লোকালয় হইতে দূরে একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। মনে শান্তি নাই, নানা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত বংশীধর

আজকাল প্রায়ই সেখানে ছুটিয়া যান, নির্জ্জনে আপন মনে চুপচাপ বসিয়া থাকেন। সেদিন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন জটাজুটমণ্ডিত সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী। পরমহংসজী নামে এ অঞ্চলে তিনি খ্যাত। পূর্ব্বাশ্রমে ছিলেন পেশোয়া বংশের সন্তান। মোক্ষলাভের আশায় বহুদিন আগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হন, কঠোর তপস্থায় হন আপ্তকাম।

পরমহংসজীকে দেখা মাত্র বংশীধর উচ্চকিত হইয়া উঠেন, নিকটে গিয়া নিবেদন করেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

আশিস্ জানাইয়া পরমহংসজী কহেন, "বৎস, দেখছি, অন্তরে তোমার শান্তি নেই। এক দুঃসহ জ্বালা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছো। কি তোমার সঙ্কট, আমায় খুলে বল।"

"প্রভু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, ঠিকই ধরেছেন। অন্তরের জ্বালা আমার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সংসারের সব কিছুই হয়ে গিয়েছে তিক্ত, বিস্বাদ অর্থশূন্য। স্থির করেছি, মনের দুঃখ-জ্বালা এড়াবার জন্য গ্রহণ করবো সন্ন্যাসীর জীবন।"—কাতর স্বরে নিবেদন করেন বংশীধর।

"এই তরুণ বয়সে, কেন সংসারের প্রতি তোমার এই বিরক্তি, বৎস?"

"সাত বৎসর বয়সে পিতামাতা দুই-ই হারিয়েছি। বালক-জীবনের ওপর পড়েছে বিধাতার নির্ম্মম আঘাত। তারপর মাতুলের আশ্রয়ে দিন মোটামুটি ভালোই কাটছিল। কিন্তু এবার যেন জীবনের বাস্তব রূপ, নিষ্ঠুর রূপটাই, আমার অভিজ্ঞতায় বেশী ধরা পড়েছে।"

"বিশদ করে সকল কথা আমায় বলো, বৎস।"

"যাদের আমি অকৃত্রিম বন্ধু বলে জানতাম, তাদের চক্রান্তে আমায় যেতে হয়েছে কারাগারে। দেশের শাসক ও প্রতিপালক মতিচ্ছন্ন হয়েছেন, ঘোরতর অবিচার করেছেন আমার প্রতি। কয়েকদিনের কারাবাসই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। বুঝেছি, গোটা গৃহস্থ-জীবনই আসলে একটা বন্দী জীবন। শান্তি নেই,

আনন্দ নেই, এখানে পড়ে পড়ে অদৃষ্টের মার খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। তাই তো সন্ন্যাস নেবো বলে সঙ্কল্প করেছি। কৃপা করে আপনি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করুন।"

"বৎস, যিনি তোমার আমার প্রভু, সবার প্রভু, তিনি আগে থেকেই তোমার অবস্থার কথা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই ঠিক এই সময়ে তোমার সমক্ষে আমার আগমন।"

"আশা হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে, আপনার কথা শুনে। এবার কৃপা করে বলুন, কি আমায় করতে হবে।"

"বৎস, সন্ন্যাস বড় কঠিন ব্রত। এ ব্রত নেবার আগে যথেষ্ট প্রস্তুতি চাই। শুধু গৃহত্যাগ করলেই হবে না। সন্ন্যাসীকে এ জন্মেই ব্রহ্মলাভ করতে হবে এবং এজন্য সর্ব্বাগ্রে চাই ত্যাগ বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য—চাই শাস্ত্রাভ্যাস ও কঠোর সাধনা। প্রস্তুতির এই ধাপগুলি পেরিয়ে যেতে পারলে তবেই আসবে পরাশান্তি ও পরাজ্ঞান—যেজন্য অজানিতে তোমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

"বেশ প্রভু, আপনার কথিত মত দীর্ঘ-প্রস্তুতির পথই আমি বেছে নেবো। কিন্তু একটা প্রার্থনা। কৃপা করে যখন এসেছেনই, আপনি আমায় দীক্ষা দিন, সন্ন্যাস দিন, এ জীবন কৃতার্থ হোক।"

"না—বৎস, আমি তোমার গুরু নই। তোমার চিহ্নিত গুরু রয়েছেন উত্তর ভারতে। যথা সময়ে তাঁর দর্শন পাবে। হ্যাঁ, এবার শোন আমার কথা। প্রথমে তুমি পুণ্যতীর্থ নাসিকে যাও। সেখানে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে বেদ বেদাঙ্গের অধ্যয়ন শুরু করো।"

"আপনার দর্শন ও উপদেশ আবার কবে পাবো, প্রভু?" সজল চক্ষে প্রশ্ন করেন বংশীধর।

"প্রয়োজনমত আমি নিজেই আবির্ভূত হবো তোমার সকাশে।" একথা বলার পর পরমহংসজী মন্দির চত্বর ছাড়িয়া প্রবেশ করেন সন্নিহিত অরণ্যে। তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যান।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বংশীধর মাতুল সবসুখরামের উদ্দেশে এক চিঠি লিখিলেন। সতের বৎসরের বালকের সেই চিঠির মর্ম্ম :

“জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা এই অল্প বয়সে আমার হয়েছে, তাতে দেখেছি—এ সংসার নিতান্ত দুঃখময়। এর জটিল জালে জড়িয়ে অসহায়ের মত কেবলি নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়। আর এটাও আমি বুঝেছি—সংসারের সব কিছুই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র ঈশ্বরই অবিনশ্বর, তাঁর ধামেই রয়েছে পরম শান্তি, পরম আনন্দ। আমি ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই চিরতরে গৃহত্যাগ করে যাচ্ছি। আমায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন না, কারণ ঘরে ফেরা আমার কোন মতেই সম্ভব নয়। পুত্রনির্ব্বিশেষে আপনি আমায় পালন করেছেন, মাতা পিতার অভাব বুঝতে দেন নি কোনদিন, আপনার স্নেহ মমতা ও কল্যাণেচ্ছার ঋণ কখনো শোধ করার নয়। আমায় আপনি মার্জ্জনা করবেন, গ্রহণ করবেন আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম।”

সেই রাত্রেই গোপনে বংশীধর কল্যাণী ত্যাগ করিলেন। পদব্রজে চলিলেন নাসিকের উদ্দেশে। পরের দিন তাঁহার চিঠি পড়িয়া মাতুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। সারা গৃহে নামিয়া আসে নৈরাশ্যের অন্ধকার।

নাসিকের এক নিষ্ঠাবান সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে থাকিয়া বংশীধর বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তি তাঁহার। তিন বৎসরের মধ্যে শিক্ষাগুরুর গ্রন্থাদি তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে তপস্যার জন্য, প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের জন্যও তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কোথায় তাঁহার চিহ্নিত সদ্‌গুরু, কবে তাঁহার কৃপা পাইবেন, কোন্ সাধন নিয়া অগ্রসর হইবেন, ভাবিয়া কূল-কিনারা পান না।

বিষাদ-খিন্ন হৃদয়ে গোদাবরীর ঘাটে সেদিন বসিয়া আছেন, এমন

সময়ে দ্বিতীয়বার দর্শন দিলেন কল্যাণকামী সন্ন্যাসী পরমহংসজী। স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "বৎস বংশীধর, তুমি এবার পদব্রজে বেরিয়ে পড়ো উত্তর ভারতের দিকে। পথে ওঙ্কারনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ আর উজ্জয়িনীর মহাকাল দর্শন করে যেও। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে মহাকাল মন্দিরে ব'সে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্রের জপ সাধকদের পক্ষে কল্যাণকর। তুমি এই জপ-সাধন সেখানে সম্পন্ন ক'রো।"

ওঙ্কারনাথ তীর্থ লক্ষ্য করিয়া বংশীধর চলিতে থাকেন। তখনকার দিনের পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। মারাঠা শক্তির সবে মাত্র পতন ঘটিয়াছে। তাই চারিদিকেই রাজনৈতিক অশান্তি আর সামাজিক বিশৃঙ্খলা। পথে ঠগী ও ডাকাতদের উপদ্রবও বৃদ্ধির পথে। এ অবস্থায় একাকী কোথাও যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। একদল বণিকের সঙ্গে মিলিত হইয়া বংশীধর পথ চলিতেছেন।

এই দলে কখন যে কয়েকজন ডাকাত কারবারীর বেশে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। বংশীধরের কান্তি সুগৌর, দেহ সুন্দর সুঠাম, চোখে মুখে আভিজাত্যের ছাপ। ডাকাতরা ভাবিল, নিশ্চয়ই এ যুবক কোন সম্ভ্রান্ত জমিদারের পুত্র, কোন জরুরী কাজে দূরদেশে যাইতেছে। কোমরের পেটিতে প্রচুর অর্থ যে লুকানো আছে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। স্থির করিল, পথের মধ্যে কোথাও তাহাকে হত্যা করিয়া টাকাকড়ি ও সোনাদানা লুটিয়া নিবে।

যাত্রীদল সেদিন দৌলতাবাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ সময়ে এক চটিতে অবস্থান করার সময় দুর্বৃত্তেরা বংশীধরের খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে, দেহটি হয় নীলবর্ণ, অসাড়—মুখ দিয়া ঘন ঘন ফেনা নির্গত হইতে থাকে। সঙ্গীরা প্রমাদ গণিতে থাকে। এই মুমূর্ষু যুবক সম্বন্ধে আর মাথা না ঘামাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে তাহারা প্রস্থান করে। ডাকাতেরা দেহ তল্লাস করিয়া দেখে টাকাকড়ি

বংশীধরের কাছে কিছুই নাই। অগত্যা তাহারাও সেখানে হইতে চম্পট দেয়।

স্থানীয় এক বিত্তবান পাটেল এই সময়ে দৌলতাবাদের দিকে যাইতেছিলেন। চটির সম্মুখে আসিয়া দেখেন, এক সুদর্শন যুবক মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে। ব্যাকুল হইয়া তখনি তিনি গ্রাম হইতে এক চিকিৎসক ডাকাইয়া আনেন। চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার ফলে বংশীধর অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠেন। যুবকটির উপর পাটেলের ইতিমধ্যে বড় মমতা পড়িয়া গিয়াছে। পরম যত্নে তাঁহাকে তিনি এবার দৌলতাবাদের নিজ গৃহে নিয়া যান, সেবা ও শুশ্রূষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যেই বংশীধরকে অনেকটা ভালো হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

পাটেলের স্ত্রী সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন বংশীধরকে। মায়ের মমত্ব ও স্নেহ দিয়া সদাই তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিতে তিনি ব্যস্ত। বংশীধরকে তিনি জানাইয়া দেন, "ছাখো বাবা, ভগবানের দয়ায় মৃত্যুর মুখ থেকে তুমি উঠে এসেছ। স্বাস্থ্য তো একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। সাফ কথা বলে দিচ্ছি—তোমার শরীর না সারলে আমরা তোমায় কোথাও যেতে দেবো না। মনের আনন্দে আমাদের কাছে কয়েকমাস থাকো, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর যাবার কথা ভাববে।"

শুধু স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রীই নয়, বাড়ীর আর সকলেও বড় ভালো-বাসিয়া ফেলিয়াছে বংশীধরকে, কেহই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। অগত্যা কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে স্থান ত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়।

পরম আনন্দে ও আরামে দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। এভাবে প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হইল। পাটেলের বৃদ্ধা জননী বংশীধরকে

নিজের নাতির মতই স্নেহ করেন, বংশীধরও তাঁহার প্রতি কম শ্রদ্ধাবান নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধাকে তিনি ভাগবত পাঠ করিয়া শুনান। সেদিনও পাঠ চলিতেছে। প্রসঙ্গক্রমে জড়ভরতের উপাখ্যান শুরু হয়। রাজ্য, বিত্তবিভব ও আত্মপরিজন সব কিছু ত্যাগ করিয়া আসিয়া বনবাসী রাজা শেষটায় আবদ্ধ হন এক হরিণশিশুর মায়ায়। অদৃষ্টের একি নিদারুণ পরিহাস! এই করুণ কাহিনীটি বর্ণনা করিতে গিয়া বংশীধর ক্রন্দন করিতে থাকেন, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠেন, ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করেন, "বংশী, কি হয়েছে তোমার? এমন করে তুমি কাঁদছো কেন? কেউ কি তোমায় গালমন্দ দিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে?"

"না—দাদী, দুঃখ আমিই দিয়েছি আমার নিজেকে। দুঃখের সাগরে পড়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার অবস্থা ভরত রাজারই মত—অথবা তাঁর চাইতে আরো শোচনীয়। সন্ন্যাস নেবো বলে আত্মীয়স্বজনের স্নেহ প্রেম ঠেলে ফেলে এসেছিলাম। কিন্তু কি চরম দুর্ভাগ্য আমার—এখানে দৌলতাবাদে এসে এ গৃহপরিজনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। নাঃ—আর নয়। আজই আমি এ স্থান ত্যাগ করবো, সিদ্ধ করবো নিজের পবিত্র সঙ্কল্প।"

বৃদ্ধা দাদী অনেক করিয়া বুঝাইলেন। পাটেলের স্ত্রী আসিয়া শুরু করিলেন করুণ ক্রন্দন। কিন্তু বংশীধর নিজ সিদ্ধান্তে রহিলেন অচল অটল।

আঁচলে চোখ মুছিয়া পাটেলের স্ত্রী কহিলেন, "বেশ বেটা, সন্ন্যাসের পথে তুমি যখন যাবেই, যাও। আর তোমায় আমরা বাধা দেবো না। কিন্তু তোমায় আমি নিজ সন্তানের মত দেখি, এভাবে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় তুমি যেতে পারবে না। আমার নিজের কাছে জমানো রয়েছে পঞ্চাশটি সোনার মোহর। এগুলো তোমায় সঙ্গে নিতে হবে। খাওয়া-পরা আর আরামের জন্য

এগুলো তুমি খরচ করবে। হ্যাঁ, এতে তুমি আপত্তি ক'রো না, বেটা।"

"ঘোর আপত্তি আছে আমার। ঘর-সংসার ছেড়ে কাঙাল সন্ন্যাসীর জীবন যে গ্রহণ করতে চলেছে, একগাদা মোহর সে কি করে কোমরে বেঁধে রাখবে? কেনই বা রাখবে? ছি-ছি এ প্রলোভন আমায় আপনারা যেন দেখাবেন না। তাছাড়া, এই তো সেদিন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম। সঙ্গে একটি কানাকড়িও নেই, অথচ ডাকাতেরা আমায় বিষ খাওয়ালো। সোনার মোহর সঙ্গে থাকলে কি আর রক্ষে আছে? না—এসব দেবেন না?"

সাশ্রুনয়নে বাড়ীর সবাই বংশীধরকে বিদায় দেন। স্নেহান্ধ পাটেল গৃহিণী কিন্তু এক সময়ে এক কাণ্ড করিয়া বসেন। সামনেই আসিতেছে প্রচণ্ড শীত ঋতু। তাই ঝুলিতে ভরিয়া বংশীধরের জন্য একটি জীর্ণ কাঁথা দেওয়া হয়। পাটেল গৃহিণী গোপনে এই কাঁথাটির ভাঁজে পঞ্চাশটি মোহর তাড়াতাড়ি সেলাই করিয়া দেন। মনের একান্ত ইচ্ছা, পথে অর্থের প্রয়োজন হইলে বংশীধর ইহার সদ্ব্যবহার করিবেন।

অনেকটা দূর পথ চলিয়া আসিয়াছেন। হঠাৎ একসময়ে বংশীধরের হাতে ঠেকিল ঐ জীর্ণ কন্থার একপ্রান্ত। স্থানটি যেন বড় ভারী ঠেকিতেছে। ভাঁজ খুলিয়া তো তাঁহার চক্ষু স্থির। দেখেন, পঞ্চাশটি মোহর গাদাগাদি করিয়া সেখানে সেলাই করিয়া রাখা হইয়াছে।

মাতৃরূপিণী মহিলার এই স্নেহ নিদর্শন দেখিয়া চোখ দুটি তাঁহার শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসজল হইয়া আসে। কিন্তু কোনমতেই যে তাঁহার পক্ষে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পথ চালতে চলিতে স্থির করিলেন, অচিরে কোন দরিদ্র এবং যোগ্য পাত্রকে মোহরগুলি দান করিবেন।

কয়েকদিন পথ চলার পর বংশীধর ওঙ্কারনাথে আসিয়া পেঁাছেন। পুরাণে বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ এখানে বিরাজিত।

দর্শন করিয়া বংশীধরের আনন্দের সীমা নাই। দীর্ঘ সময় মন্দিরে ধ্যানজপ করিয়া কাটাইয়া দিলেন, নিবেদন করিলেন প্রাণের আকুতি। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, অদৃশ্যলোক থেকে তোমার হাতছানিই আমায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়েছে। দেখো, ত্যাগ-বৈরাগ্য থেকে, তোমার আরাধনার পথ থেকে, কোনদিন যেন বিচ্যুত না হই।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায়, কাঁথায় সেলাই করা স্বর্ণমুদ্রাগুলির কথা। সানুনয়ে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানান, "প্রভু, এ সোনার শৃঙ্খল আর যে সহ্য করতে পারছিনে। তোমার সত্যকার কোন দরিদ্র ভক্তকে এগুলো দিয়ে দাও।"

মন্দির হইতে বংশীধর নামিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ প্রাঙ্গণের একপাশে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবাবেগ জড়িত কণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ করিয়া চলিয়াছেন—জ্যোতির্ময়ায় পুনরুদ্ভব বারণায়, দারিদ্র্য-দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়।

বংশীধরের অন্তর হইতে কে যেন ডাকিয়া বলে,—ওরে এই তো তোর স্বর্ণমুদ্রার ভার লাঘব করার সুযোগ উপস্থিত, যোগ্যপাত্র যে সামনেই রয়েছে।

নীরবে ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাশে কিছুক্ষণ তিনি বসিয়া থাকেন। তারপর স্তোত্রপাঠ সাঙ্গ হইলে সবিনয়ে নিবেদন করেন—

"দ্বিজবর, দেবাদিদেব আপনার প্রার্থনা শুনেছেন। দারিদ্র্য-দুঃখ থেকে আপনাকে ত্রাণ করার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন কিছু অর্থ। আপনি তা গ্রহণ করুন।"

উত্তরে ব্রাহ্মণ কহেন, "দেখুন, নিজে আমি পরম আনন্দে আছি। শিবধামে বাস করি, আকাশবৃত্তিই আমার সম্বল। প্রভু নিজেই তাই নিত্যকার আহার জুটিয়ে দেন। আমার স্তোত্রপাঠ ও ধন-প্রার্থনা সেজন্য নয়।"

"তবে কিসের জন্য ?"

"আমার একটি কন্যা অনেক দিন বিবাহযোগ্যা হয়েছে। সম্প্রতি একটি পাত্রের সন্ধানও মিলেছে। কিন্তু আমার মত ভিক্ষুকের পক্ষে বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করার মত টাকাকড়ি কই? তাই তো রোজ এখানে এসে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

"আপনার প্রার্থনা সফল হয়েছে, দ্বিজবর।" বলিয়াই বংশীধর জীর্ণ কাঁথার সেলাই খুলিয়া ঝক্‌ঝকে একরাশ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের কোঁচড়ে ঢালিয়া দেন।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে ব্রাহ্মণ তাঁহার কোঁচড়ের দিকে তাকাইয়া আছেন। মুখে কোন কথা সরিতেছে না।

বংশীধরের চোখে মুখে তৃপ্তির হাসি। কহিলেন, "দ্বিজবর নিশ্চিন্ত মনে এগুলো গ্রহণ করুন। এ অর্থ অতি শুদ্ধ, কোন অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত হয় নি। কোন সম্পন্ন সৎ-গৃহস্থ এই মোহরগুলো জমিয়েছিলেন। পুত্রাধিক স্নেহে তা আমায় দান করেছেন। আমি কাঙাল, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের পথে বেরিয়েছি। এসব দিয়ে আমি কি করবো? বরং এ অর্থ আপনার মত ভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাজে লাগুক। প্রভু জ্যোতির্লিঙ্গের কৃপাতেই আমাদের এ যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।"

অপার ঐশী কৃপার এই স্পর্শ পাইয়া, দারিদ্র্য-দুঃখ দহনের এই চমৎকারিতা দেখিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে স্তব্ধ, আবেগ বিহ্বল। দুই নয়নে তাঁহার কেবলি ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

অতঃপর কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর বংশীধর উজ্জয়িনী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রাচীনকাল হইতেই এখানকার মহাকাল মন্দিরের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। তাছাড়া, সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত গৃহস্থেরা মহাকাল বিগ্রহকে পরম জাগ্রত বলিয়াও মনে করেন। পরমহংসজী বংশীধরকে এখানকার মন্দিরে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপের

নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। বংশীধর পরমনিষ্ঠায় সে নির্দ্দেশ প্রতিপালন করেন। জপসিদ্ধির ফলে অন্তর তাঁহার পরম শান্তিতে ভরিয়া উঠে, নূতনতর অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্দীপিত হয়।

প্রায় একমাস কাল তিনি মহাকাল মন্দির চত্বরে অবস্থান করেন। কৃচ্ছ্র সাধন ও কঠোর তপস্যার জন্য মন তাঁহার আকুল। একাদিক্রমে পাঁচদিন কাটে নিরম্বু উপবাসের মধ্য দিয়া। অবশিষ্ট দিনগুলি আকাশবৃত্তি করিয়াই অতিবাহিত করেন। এই সময়ে এক বৃদ্ধা চানাওয়ালী দিনান্তে বংশীধরকে একমুঠা ভিজা ছোলা দিয়া যাইত, তাহা দিয়াই বৈরাগ্যবান তরুণ সাধক করিতেন ক্ষুধার নিবৃত্তি। দেবাদিদেব মহেশ্বরের ধ্যানজপে এসময়ে এমন গভীরভাবে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন যে দিনরাত কোথা দিয়া চালিয়া যাইত, হুঁস থাকিত না।

এই সময়ে আর একবার ঘটে তাঁহার জীবনের অন্যতম পথপ্রদর্শক পরমহংসজীর আবির্ভাব। পরমহংসজী কহেন, "বৎস, এখানে আর তোমার থাকার প্রয়োজন নেই। তাড়াতাড়ি উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হও। বিঠৌরে বাল্মীকি তপোবনে রয়েছেন অশেষ শাস্ত্রবেত্তা, প্রবীণ সাধক, রাঘবেন্দ্র স্বামী। তাঁর আশ্রয়ে কিছুকাল বাস ক'রে শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ তুমি আয়ত্ত ক'রে নাও। তোমার সাধন প্রস্তুতির এ হবে একটা বড় অঙ্গ। আরও একটা কথা। পথে আজকাল নানা গোলযোগ হচ্ছে, হঠাৎ কোন বিপদে পড়লে ঘাবড়ে যেয়ো না। প্রভু মহেশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন।"

কয়েকজন পথচারীর সহিত মিলিত হইয়া বংশীধর সিন্ধিয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। এখানকার শাসনব্যবস্থায় তখন চরম বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ। উত্তরাধিকারীরা সিংহাসনের দাবী নিয়া উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে চলিয়াছে চক্রীদের ষড়যন্ত্র, গ্রেপ্তার ও নির্য্যাতন। সন্দেহবশে বংশীধরও কয়েকজন সঙ্গীসহ ধৃত হন। নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে। কয়েকদিনের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ

নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের মুক্ত করিয়া দেন। ইহার কয়েকদিন পরেই বিন্ধ্যাচলের তীর্থাদি পরিক্রমা করিয়া বংশীধর কানপুরের কাছে বিঠৌরে উপনীত হন।

সুপ্রাচীন যুগে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম বিরাজিত ছিল আধুনিক বিঠোরের সংলগ্ন পবিত্র ভূমিতে। আদিকবির পুণ্যময় স্মৃতিকে জনমানসে চির উজ্জ্বল রাখার জন্য পণ্ডিতবর রাঘবেন্দ্রজী এখানে একটি উচ্চতর শাস্ত্র অধ্যয়নের চতুষ্পাঠী খুলিয়াছেন, নাম বাল্মীকি তপোবন।

এখানে পেঁাছিয়াই বংশীধর রাঘবেন্দ্রজীর চরণে প্রণত হইলেন, নিবেদন করিলেন অন্তরের আকাজ্ক্ষা। দিব্যকান্তি, বৈরাগ্যবান এই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া আচার্য্য প্রীত হইলেন। দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, এ আশ্রমে তোমায় আমি আশ্রয় দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও পোষণ করছি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তুমি তৈরী করবে তোমার অধ্যাত্মজীবনের শাস্ত্র-ভিত্তি।"

বিঠৌরের এই আশ্রমে বংশীধর তিন বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অমানুষী মেধা, প্রতিভা ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া আচার্য্যের বিস্ময়ের অবধি নাই। পরম যত্নে নিজের অধীত বিদ্যা তাঁহাকে শিখাইতে থাকেন।

এই সময়ে ঘটনাচক্রে একদিন বংশীধর তাঁহার অসাধারণ গুরু-ভক্তির পরিচয় দেন। আচার্য্য রাঘবেন্দ্রজী সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই শিষ্যদের নিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন। সেদিনও গিয়াছেন। বর্ষার প্লাবন দেখা দিয়াছে কিছুদিন যাবৎ। স্ফীতকায়া গঙ্গা খরবেগে বহিয়া চলিয়াছে। আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র আনন্দ কলরব করিতে করিতে স্নান শুরু করিয়া দিল। একটু পরেই দেখা গেল, ইহাদের

একজন প্রবল স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছে। রক্ষার কোনই উপায় নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সবাই শঙ্কিত হৃদয়ে ঐ অসহায় ছাত্রটির দিকে তাকাইয়া আছে।

চরম বিপদের আর দেরী নাই। ক্ষণকাল পরেই অবসন্নদেহ ছাত্রটি গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া যাইবে। রাঘবেন্দ্র আচার্য্য উত্তেজিত স্বরে ছাত্রদের কহিলেন, "পুরাণে তোমরা তো গুরুভক্তির কত কথাই পড়েছো। তোমাদের ভেতর এমন একজনও কি নেই যে গুরুর আশ্রিত এ যুবকটিকে উদ্ধার করে আনতে পারে?"

বংশীধর নীরবে উঠিয়া দাঁড়ান, মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন বর্ষা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল গঙ্গায়। সন্তরণে চিরদিনই তিনি পটু, দেহের শক্তি ও সাহসও যথেষ্ট। স্রোতের অনুকূলে প্রায় এক ক্রোশ সাঁতরাইয়া গিয়া শেষটায় বিপন্ন ছাত্রটিকে ধরিয়া ফেলিলেন, টানিয়া আনিলেন তীরের দিকে।

ইতিমধ্যে রাত্রির অন্ধকার গঙ্গার দুইকূল ছাইয়া ফেলিয়াছে। আচার্য্য রাঘবেন্দ্রজী মশাল হাতে, অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে নিয়া, বংশীধর ও তাঁহার সহপাঠীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। অবশেষে তাহাদের দেখা মিলিল। সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বার বার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া গুরু কহিলেন, "বংশীধর, তুমি ধন্য। তোমার মত অন্তেবাসী পেয়ে আচার্য্য হিসেবে আমি গর্ব্ব বোধ করছি। তোমার এই গুরুভক্তি, পরহিতে প্রাণ বিপন্ন করবার এই মহৎ প্রয়াস সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুক, এই আমার কামনা।"

শাস্ত্রচর্চ্চায় অনেকদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এবারে বংশীধরের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে যোগসাধনার আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞান সাধনার উপর বেশী ঝোঁক থাকিলেও ঈশ্বরলাভের অন্যান্য শাস্ত্রসম্মত পথের অভিজ্ঞতাও তিনি পাইতে চান। এবার তাই বিঠৌর ত্যাগ করিয়া

তিনি উপনীত হন হিমালয়ে, উচ্চকোটির যোগীমহাত্মাদের অনুসন্ধান শুরু করেন। কয়েকদিন হরিদ্বার কন্‌খল ও হৃষিকেশে কাটাইয়া অবশেষে আসিয়া পেঁছান কেদার বদরীর মহাতীর্থে।

এখানে থাকাকালে সংবাদ পান, নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগের পর্ব্বতগুহায় হঠযোগে সিদ্ধ এক মহাপুরুষ বাস করেন। বড় দুর্গম ও জনহীন সেই অঞ্চল। বহু দুঃখ কষ্ট ও পথশ্রম স্বীকার করিয়া বংশীধর যোগীবরের গুহায় গিয়া উপস্থিত হন। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের পর ব্যক্ত করেন মনের অভিলাষ। এই যোগীর কৃপায় ও নিজের অনন্য নিষ্ঠায় কয়েক বৎসরের মধ্যে হঠযোগে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

হঠযোগের ফলে বংশীধরের দেহকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, দেহে মনে উদ্ভূত হয় এক অভূতপূর্ব্ব শক্তি। সিদ্ধাই ও যোগসামর্থ্যও ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কিন্তু এসব কোন কিছুতেই বংশীধরের শান্তি নাই, আনন্দ নাই। এতকালের পরিব্রাজন, তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চ্চার মধ্য দিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য, মন তাঁহার উদগ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছে—পরম প্রাপ্তির সঙ্কল্প হইয়াছে দৃঢ়তর। কিন্তু হঠযোগের সাধনক্রমের মধ্য দিয়া জীবনের সেই লক্ষ্যে তো পেঁছিতে পারিতেছেন না।

নিরপেক্ষ মন নিয়া দিনের পর দিন ভরিয়া দেখিলেন, নিজের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণও কম করিলেন না। চিত্তের যে শুদ্ধতা, প্রশান্তি ও স্থৈর্য্য সাধিত হইলে পরা চৈতন্যের উদয় হয়, হঠযোগের সাধনায় তাহা লাভ করা দুষ্কর। বরং এই যোগ সাধনার ফলে যে সিদ্ধাই ও বিভূতির স্ফুরণ হয়, তাহার ফলে নবীন সাধকের আত্মাভিমান বাড়িবারই আশঙ্কা থাকে। হৃদয়ে তাঁহার এবার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, রাজযোগের পথ ছাড়া পরমপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই। এবার সেই রাজযোগের রাজপথই তিনি অনুসরণ করিবেন একান্ত নিষ্ঠায়।

অতঃপর শিক্ষাদাতা হঠযোগী মহাত্মাকে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা

জানাইয়া বংশীধর বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে বাহির হইয়া পড়েন। উপস্থিত হন হৃষিকেশে।

হৃষিকেশে তখন গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমের খুব প্রসিদ্ধি। এই আশ্রমে স্বামী পূর্ণাশ্রম ও সতুয়া স্বামী নামে দুই মহাত্মা অবস্থান করিতেছেন। বেদান্তের ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ও রাজযোগের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ইঁহারা পারঙ্গম। ইঁহাদের সান্নিধ্য ও সাহায্য পাইবার জন্য বংশীধর গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমে আশ্রয় নিলেন।

সুদর্শন, শাস্ত্রবিদ্, বংশীধর অল্পদিনের মধ্যেই প্রবীণ স্বামীজীদ্বয়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। নবীন সাধক হঠযোগে পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন, এজন্য স্বামীজীরা আদর করিয়া তাঁহার নাম দেন—বীরভদ্র। এখানকার শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধন-অনুকূল পরিবেশে পরমানন্দে বংশীধর প্রায় তিন বৎসর কাটাইয়া দেন।

এই সময়ে আবার একদিন তাঁহার সম্মুখে আবিভূত হন তাঁহার চিরকল্যাণকামী পরমহংস মহারাজ, প্রদান করেন তাঁহাকে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ।

প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে পরমহংসজী বলেন, "বৎস বংশীধর, তোমার ব্রহ্মলাভের আকুতি দেখে, শাস্ত্রবুৎপত্তি দেখে, আমি আনন্দিত হয়েছি। ইতিমধ্যে হঠযোগ-সাধন তুমি নিয়েছো ভালোই করেছো। হঠযোগে ব্রহ্মলাভ হয় না, কিন্তু ব্রহ্মলাভের জন্য দুশ্চর তপস্যা করতে হয়—তাতে অবশ্যই সাহায্য হয়। দেহ হঠযোগ-কুশল ও দৃঢ় থাকলে কৃচ্ছ্র ও ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রস্তুতি ভালোভাবে গড়ে ওঠার অবকাশ পায়। কিন্তু বৎস, সদাই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে মূল লক্ষ্যের ওপর। আর সে দৃষ্টি যে তোমার আছে, তা আমি জানি। রাজযোগই তোমার আসল পথ, এ পথ নিজেই তুমি খুঁজে নিতে বেরিয়েছো এটা বড় আনন্দের কথা। হ্যাঁ বৎস, এবার তোমায় আমি একটা নূতন নির্দ্দেশ দেবো।"

"মহারাজ, আপনার আশীর্ব্বাদই আমায় এগিয়ে দিচ্ছে ধাপে

ধাপে। আপনার কল্যাণ কামনা আমায় সতত রক্ষা করছে বর্ম্মের মত। আপনার যে কোন নির্দ্দেশ আমার শিরোধার্য্য।" যুক্তকরে নিবেদন করেন বংশীধর।

"বৎস, সময় হয়ে এসেছে। তোমার চিহ্নিত সদ্‌গুরু তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। অবিলম্বে তুমি কাশীধামে যাও। সেখানে গুরুর কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করো। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ক'রে জীবন তোমার সফল হয়ে উঠুক।

পরমহংসজীর নির্দ্দেশপালনে বংশীধর আর বিলম্ব করেন নাই। দীর্ঘদিনের তিতিক্ষা, তপস্যা ও প্রত্যাশা সফল করার জন্য তিনি উপনীত হন কাশীধামে।

আনন্দদায়িনী কাশী বিদ্যাদায়িনী কাশী—মোক্ষদায়িনী কাশী। যুগ যুগ ধরিয়া শাশ্বত ভারতের ললাটে শুচিশুভ্র তিলকরূপে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে এই পুণ্যময়ী তীর্থনগরী। বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণার লীলা-নিকেতন এই কাশীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে গঙ্গার পবিত্র ধারা, আর রহিয়াছে অগণিত ব্রহ্মবিদ্ পুরুষদের তপস্যার অনন্ত প্রবাহ। তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা, ব্রহ্মচারী সাধকদল ও মুমুক্ষুদের দর্শন যেমন এখানে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় শাস্ত্রবিদ্ আচার্য্য আর সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের বিশিষ্ট ধারক বাহকদের। এখানকার কত মঠে মন্দিরে সোৎসাহে চলিতেছে বেদান্ত ও ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন, আবার কত বড় বড় ধর্ম্মসভায় অনুষ্ঠিত হইতেছে নানা দেশ হইতে আগত তর্ক-শূরদের বিচার দ্বন্দ্ব। অধ্যাত্ম-জীবন আর সারস্বত জীবনের মিলিত আলোকচ্ছটায় এই পুণ্যময়ী নগরীর দিক্-দিগন্ত উদ্ভাসিত। তাই এই কাশীধামে উপনীত হইয়া বংশীধরের আনন্দের অবধি নাই।

কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি নগরীর শ্রেষ্ঠ মঠ মন্দির পীঠস্থান

ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলি দর্শন করিয়া বেড়ান। আশ্রয়ের স্থান কোথাও মিলে নাই, ব্রহ্মচারী বেশে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান, সত্রে একবেলা আহার জুটিয়া যায়, তারপর নিশাযোগে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে ঘাটিয়ালদের ছাতার নীচে শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রায় ঢলিয়া পড়েন।

কাশীতে তখন শক্তিধর মহাত্মাদ্বয় তৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দের খুব প্রসিদ্ধি। বংশীধর সাগ্রহে ইঁহাদের দর্শন করিলেন, ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অন্তরে তাঁহার বড় প্রশ্ন—কোথায় তাঁহার চিহ্নিত সদ্‌গুরু যাঁহার নিকট হইতে নিবেন সন্ন্যাস দীক্ষা, যাঁহার চরণে চিরতরে করিবেন আত্মসমর্পণ। মনপ্রাণ তাঁহার রাজযোগের সাধন গ্রহণে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এ সাধন যিনি দিবেন তাঁহাকে একাধারে হইতে হইবে বৈরাগ্যবান, তপস্যাপরায়ণ, বেদান্তের অদ্বৈত বিচারে পারঙ্গম এবং রাজযোগের নিগূঢ় সাধনায় সিদ্ধকাম। যে সাধন-প্রস্তুতি এ যাবৎ বংশীধরের জীবনে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে এমনি এক মহাত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

পরমহংসজী আশ্বাস দিয়াছেন, এই কাশীধামেই গুরু তাঁহার জন্য অপেক্ষমান। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের এ আশ্বাসবাণী তো কখনো মিথ্যা হইবার নয়। আশায় আশায় দিন গুণিতে থাকেন বংশীধর।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলেন, গঙ্গাতীরে মহাযোগী অহল্যাবাঈর প্রতিষ্ঠিত মঠে এক পরমজ্ঞানী অশেষ শাস্ত্রবেত্তা মহাপুরুষ অবস্থান করেন। বিশেষ করিয়া বেদান্ত বিচারে ও রাজযোগের সাধনায় তাঁহার তুল্য ব্যক্তি সমকালীন উত্তর ভারতে কেহ নাই।

প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান সারিয়া ভস্ম-ভূষিত ললাটে, প্রদীপ্ত ভাস্করের মত সন্ন্যাসীবর গৌড়স্বামী অহল্যাঘাটে শিষ্যগণ সহ বসিয়া আছেন। দুরূহ শাস্ত্রতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও আলোচনা চলিয়াছে। আর প্রবীণ অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত স্বামীজীর অমৃতবাণী শ্রবণ করিতেছেন।

অনেকক্ষণ যাবৎ এই তত্ত্বালোচনা শুরু হইয়াছে। মণ্ডলীর এক কোণে বংশীধর নীরবে নির্নিমেষে প্রজ্ঞানঘন দিব্যোজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন। সর্ব্ব অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছেন,—যে পরম বস্তুলাভের জন্য তিনি সংসার ছাড়িয়াছেন, ভিখারীর মত দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া মরিতেছেন, তাহা এই মহান পুরুষেরই করায়ত্ত। আত্মসমর্পণ করিতে হয় তো এমন মহাত্মার চরণেই করিতে হয়।

শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও আলোচনার শেষে বংশীধর উঠিয়া দাঁড়ান, আচার্য্য গৌড়স্বামীর পদপ্রান্তে ভক্তিভরে লুটাইয়া পড়েন। তারপর নিজের পরিচয় দিয়া করজোড়ে নিবেদন করেন তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা—"প্রভু, সারা দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পরিক্রমা করে এই অভাগার জীবনতরী আজ আপনার চরণপ্রান্তে এসে ঠেকেছে। আপনি এর ভার নিন। কৃপা করে আমায় সন্ন্যাস দান করে, খুলে দিন মোক্ষপথের দ্বার।"

অনিন্দ্যসুন্দর যুবক, চোখে-মুখে প্রতিভা ও সাধন-নিষ্ঠার ছাপ। আচার্য্য গৌড়স্বামী মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ বংশীধরের দিকে চাহিয়া আছেন। তারপর প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন করা শুরু করেন। কি তাহার নাম, বংশপরিচয়, কোথায় কোন্ আচার্য্যের কাছে কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কোন্ সাধন নিয়া কতটা অগ্রসর হইয়াছেন, খুঁটিনাটি সকল তথ্যই স্বামীজী মহারাজ জানিয়া নিলেন।

শাস্ত্রালাপ শুরু করিতেই দেখা গেল, বয়সে তরুণ হইলেও বংশীধর একজন অসামান্য শাস্ত্রবেত্তা। দীর্ঘদিনের ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত জ্ঞানানুশীলন তাঁহার জীবনে যুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মাকারা বৃত্তির এক বিরাট আধার রূপে সে পরিণত হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ অন্তরে অন্তরে ব্রহ্ম-সাধনার এমনি এক উপযুক্ত অধিকারী পুরুষের, এমনি এক উত্তরসূরীর প্রতীক্ষায় ছিলেন গৌড়স্বামী।

তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় আচার্য্যের সুগৌর আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বংশীধরকে তাঁহার এ ভাবান্তর বুঝিতে দিলেন না।

কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "বৎস, উত্তম কথা। আমি তোমায় আমার কাছ থেকে সন্ন্যাস নেবার সুযোগ দেবো। কিন্তু তার আগে কয়েকটা মাস আমার কাছে নূতন করে তোমায় বেদান্তের পাঠ নিতে হবে। তোমার গ্রহণ ক্ষমতা যদি সন্তোষজনক হয়, তবেই তোমায় দীক্ষা দেবো, নতুবা আর কোথাও তোমায় যেতে হবে।"

বংশীধর তো আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বুঝিলেন, আচার্য্য তাঁহাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতে চান। বেশ, তাহাতেই তিনি সম্মত।

আচার্য্য গৌড়স্বামী আবার কহেন, "হ্যাঁ বৎস, আর একটা কথা। আমার এ আশ্রমে এখন তোমার স্থান হবে না। তুমি যেমনভাবে দিনাতিপাত করছো, তাই করে যাবে। আর প্রতিদিন দুই বেলা আশ্রমে এসে গ্রহণ করবে তোমার পাঠ।"

"যে আজ্ঞে মহারাজ। আপনার নির্দ্দেশ আমার শিরোধার্য্য"। আচার্য্যকে প্রণাম জানাইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে বংশীধর স্থান ত্যাগ করেন।

এবার গৌড়স্বামীর ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে শুরু হয় মৃদু গুঞ্জন। আচার্য্য কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করেন, "তোমরা কি আমায় কিছু বলতে চাও?"

"হ্যাঁ, প্রভু, আমাদের একটা নিবেদন আছে।" সবিনয়ে বলেন এক প্রধান শিষ্য। "আপনার এই বৃহৎ আশ্রমে স্থানের অভাব বিন্দুমাত্র নেই, রাজকীয় ভাণ্ডারা তো প্রায়ই লেগে আছে। তবে নবাগত ব্রহ্মচারীটিকে এখানে স্থান দিলেন না কেন, বুঝতে পারছিনে। ওকে তো বৈরাগ্যবান ও তপস্যা-পরায়ণ বলেই মনে হলো।"

"ঠিকই বলেছো। এ যুবকটির ভেতর বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। আধার বড় ও শুদ্ধ বলেই তো পরীক্ষা হবে কঠোরতর।

সত্রের শুকনো রুটি খেয়ে আর ঘাটিয়ালের ছাতার নীচে রাত্রিবাস করে আরো কিছুদিন কাটিয়ে দিক। ত্যাগ বৈরাগ্যের শোধন ওকে পাকা সোনায় পরিণত করুক। এটাই আমি চাই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৌড়স্বামী আপন মনে কহিতে থাকেন, "ভালো মন্দের কথা নয়—তবে একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কাশীর মঠ-মন্দির ও বিদ্যাকেন্দ্রে এতদিন দক্ষিণী দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরই ছিল একচেটিয়া নেতৃত্ব। উত্তর ভারতের এই প্রতিভাধর যুবকটি সেই ধারা এবার পাল্টে দেবে বলে মনে হচ্ছে।"

পরের দিন হইতেই বংশীধর গৌড়স্বামীর কাছে পাঠ নেওয়া শুরু করেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় পথে জীবনযাত্রা তাঁহার আগেকার মতই চলিতে থাকে।

গৌরকান্তি, সমুন্নত দেহ, প্রতিভা-সমুজ্জ্বল বংশীধরের প্রতি এ সময়ে অনেক মঠ-মণ্ডলীর মোহান্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নানা প্রলোভন দেখাইয়া এই শাস্ত্রবিদ্ তরুণকে তাঁহারা দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই হয় ব্যর্থ। গৌড়স্বামী এখন বংশীধরের জীবন-আকাশের ধ্রুবতারা, অনন্য-নিষ্ঠায় এই কৃপালু আচার্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাত্মপথের অভিযাত্রায় তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

উত্তর ভারতে তখন সিপাহী যুদ্ধের ঘোর তাণ্ডব চলিয়াছে। বারাণসীতেও এই সময়ে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ দেখা দিতে থাকে। শান্তিরক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে একদল গোরা সৈন্য মোতায়েন রাখেন। কিছু সংখ্যক সেনা মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষে টহল দিয়া বেড়ায়—সেদিনও তাঁহারা নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইংরেজ সেনার আবির্ভাব দেখিয়া ঘাটের লোকজন ভয়ে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে বংশীধর ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত।

নির্জ্জন ঘাটে কে এই লোকটি, কি তাহার অভিসন্ধি ? বজরার ইংরেজ সৈনিকেরা সন্দিহান হয়, তাড়াতাড়ি তীরে নামিয়া আসে। বহির্ব্বাস-পরা অর্দ্ধনগ্ন বংশীধরের সম্মুখে তাঁহারা সঙ্গীন উঁচাইয়া ধরে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দিতে নানা প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে থাকে। বংশীধরও যথাযথ উত্তর দেন। এই প্রশ্নোত্তরের মর্ম্মার্থ—

"ওহে, একলাটি এখানে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন, বলতো ?" গোরা সৈনিকেরা জিজ্ঞাসা করে।

"কেন, আমায় দেখে কি বিদ্রোহী বলে মনে হচ্ছে ? পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে পারছো না যে আমি একজন ভিক্ষাজীবী সাধু ?" —বংশীধর মুচকি হাসিয়া উত্তর দেন।

বংশীধরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার সপ্রতিভ হাসি দেখিয়া গোরারা একটু আশ্বস্ত হয়, বলে—"না, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি বদমায়েস নও। তুমি সাধু—জ্যোতিষী। আচ্ছা, তুমি জ্যোতিষী গণনা করতে পারো ?"

"কি তোমাদের প্রশ্ন বলই না সাহেব, একবার চেষ্টা করে দেখি পারি কিনা।" সকৌতুকে বলেন বংশীধর।

"ছাখো, সাধু, এলাহাবাদে এখন জোর লড়াই চল্‌ছে। বিদ্রোহী সিপাইরা ইংরেজ সরকারের কেল্লা ঘিরে ফেলেছে। আমরা বড় ছশ্চিন্তায় আছি। বলতে পারো ঐ কেল্লার পতন ঘটেছে কিনা ?"

"খুব পারি। আচ্ছা তোমরা আমার পায়ের কাছে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখতো। কি দেখছো ? পিঁপড়ের সারি মাটির একটা উঁচু চক্রের চারপাশ ঘিরে রয়েছে, ভেতরে ঢুকছে না,—তাই না ? এলাহাবাদ তুর্গের অবস্থাও এমনি। সিপাইরা তুর্গ অবরোধ করেছে, কিন্তু ঢুকে পড়ার মত শক্তি সঞ্চয় এখনো করে নি।"

গোরা সৈনিকেরা এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বলে, "সাধু, তুমি বড় ভালো লোক। আচ্ছা যাও, তুমি তোমার খুশী মত নদীর ঘাটে চলাফেরা করতে পারো।"

নির্ব্বিকার চিত্তে বংশীধর ঘাটের এক কোণে বসিয়া পড়েন, তারপর ধ্যান-ভজনে রত হন।

কয়েকমাস গত হইয়াছে। সাধনা, স্বাধ্যায় ও গুরুসেবার মধ্যে দিয়া বংশীধর আচার্য্য গৌড়স্বামীর আরো ঘনিষ্ঠ আরো প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। পরীক্ষার কয়েকটি পর্য্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। গুরু এবার নবীন তপস্বীকে সন্ন্যাস দীক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিলেন। উত্তরায়ণের পূর্ণিমায়, শুভ নক্ষত্রে, এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। বংশীধরের সন্ন্যাস নাম হইল—বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

অলৌকিক মেধা প্রতিভার অধিকারী, সৎ ব্রাহ্মণকুলে জাত এই নবীন শিষ্য। গুরু মনে মনে স্থির করিয়াছেন তাঁহাকেই করিবেন গদির উত্তরাধিকারী, তাঁহার সন্ন্যাসী মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ-নেতা। কাশীধামের সারস্বত সমাজে ও শাস্ত্রবিদ্ সন্ন্যাসী সমাজে যাহাতে সে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠে, সে প্রস্তুতি সাধনেও গৌড়স্বামী কোন ত্রুটি রাখিলেন না। প্রাচীন শাস্ত্র ও অধিবিদ্যায় তাঁহাকে পারঙ্গম করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

মীমাংসা দর্শন, বেদান্ত, প্রাচীন ও নব্যন্যায়, কপিল দর্শন, শৈবতন্ত্র, প্রভৃতির মূল, প্রকরণ, টীকা ভাষ্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী একে একে আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে গুরু তাঁহাকে নিজস্ব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অধ্যাপনা কার্য্যেরও দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কাশী ও উত্তর ভারতের শাস্ত্রার্থ বিচারসভাগুলিতে অশেষ শাস্ত্রবিদ্ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ আবির্ভূত হইতেন জ্বলন্ত পাবকের মত। শাস্ত্রের নিহিতার্থ উদ্‌ঘাটনে, সনাতন ধর্ম্মের বিজয়কেতন সংস্থাপনে তিনি ছিলেন এক অপ্রাতদ্বন্দ্বী নেতা। কাশীর মঠ মণ্ডলী আখড়া

ও গৃহীমণ্ডল যেখানেই বিশুদ্ধানন্দ যাইতেন, লাভ করিতেন সকলের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। শিষ্যের এই সাফল্যে আচার্য্য গৌড়স্বামীর আনন্দের সীমা নাই।

এ সময়ে মণ্ডলীর সকল সন্ন্যাসীকে একদিন তিনি সমবেত করিলেন, ঘোষণা করিলেন,—তাঁহার দেহান্তের পর বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীই হইবেন মঠ-মণ্ডলীর মোহান্ত এবং পরিচালক। তাই যতদিন এই মহাত্মা জীবিত ছিলেন, মঠের ভাবী উত্তরাধিকারী বিশুদ্ধানন্দের আচার-আচরণ ও আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে ছিল তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয় শিষ্যের অন্তরে আত্মাভিমান যেন কখনো না আসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাধনায় তাঁহার জীবন যেন সদাই থাকে সমুজ্জ্বল, এ জন্য তাঁহার সতর্কতার অবধি ছিল না। মঠের একদিনকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ইহার প্রমাণ মিলে।—

বিশুদ্ধানন্দের আগমনের কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য গৌড়স্বামী তিনজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দেন। ইহাদের মধ্যে স্বামী বিশ্বরূপ ছিলেন প্রবীণতম এবং গুরুদেবের সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহভাজন। সেদিন একটি তত্ত্বের মীমাংসা নিয়া বিশুদ্ধানন্দের সহিত স্বামী বিশ্বরূপের বিতর্ক উপস্থিত হয়। উভয়েই দক্ষতার সহিত শাস্ত্র প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে থাকেন এবং অবশেষে বিশুদ্ধানন্দই জয়ী হন। কিন্তু বিতর্কের কালে হঠাৎ এক সময়ে বিশুদ্ধানন্দ শান্তভাব হারাইয়া ফেলেন, ক্রুদ্ধস্বরে প্রধান গুরুভ্রাতাকে কিছু কড়া কথাও তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়।

এভাবে বিশুদ্ধানন্দ তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি হারাইবেন, গুরু তাহা ভাবিতে পারেন নাই। তাই দুঃখিত অন্তরে তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন, দীর্ঘ সময় কাহারো সহিত কোন বাক্যালাপ করিলেন না।

বিশুদ্ধানন্দ বুঝিলেন, সাময়িক উত্তেজনা বশে গুরু-মহারাজের অন্তরে আজ তিনি আঘাত দিয়াছেন। তখনি ছুটিয়া গিয়া আচার্য্য গৌড়স্বামীর পদতলে পতিত হইলেন, ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন অকুণ্ঠ চিত্তে। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, স্বামী বিশ্বরূপজীকে এখন থেকে আমি পরমপূজ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখবো, আজীবন গুরুজ্ঞানে তাঁর সেবা করে যাবো। এতে কোনদিনই অন্যথা হবে না।"

এ অঙ্গীকার বিশুদ্ধানন্দ কোনদিন বিস্মৃত হন নাই, উত্তরকালে অক্ষরে অক্ষরে ইহা পালন করিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য গৌড়স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। সন্ন্যাসী মণ্ডলীর সবাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধানন্দকে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করেন, কিন্তু আপত্তি উঠে বিশুদ্ধানন্দজীর দিক হইতে। প্রবীণ গুরু-ভ্রাতা বিশ্বরূপজীর চরণে প্রণাম করিয়া তিনি বলেন, "মণ্ডলীর সবাকার স্নেহ ও সমর্থন আমার ওপর আছে জেনে আমি আনন্দিত, গৌরবান্বিত। কিন্তু আপনি বর্ত্তমান থাকতে আমি এ পদাধিকার গ্রহণ করতে পারি নে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনিই এ পদের উপযুক্ত। তা ছাড়া, আপনি নিজেই অবগত আছেন, আপনাকে গুরুজ্ঞানে এত বৎসর যাবৎ আমি সেবা করে আসছি। আপনাকে মঠের মোহান্ত গুরুরূপে রেখে সেই সেবাকর্ম্মই অব্যাহত রাখতে চাই।"

বিশ্বরূপ স্বামী চমকিয়া উঠেন। বলেন, "এ তুমি কি অদ্ভুত প্রস্তাব করছো বিশুদ্ধানন্দ। গুরু মহারাজ স্বয়ং তোমায় ঘোষণা করে গেছেন তাঁর উত্তরাধিকারী বলে। আমরা সবাই সাগ্রহে আজ সে মনোনয়ন সমর্থনও করছি। আর তুমি বলতে চাচ্ছো—আমি বয়োবৃদ্ধ। তা হলে কি হয়, আমি তো জানি আমার চাইতে বয়সে ছোট হলেও তুমি—জ্ঞানবৃদ্ধ। তাছাড়া, গুরুজীর অবর্ত্তমানে তুমি যদি আমাকেই গুরু বলে মানতে চাও, তবে তোমায় আমি আদেশ

দিচ্ছি, অবিলম্বে তুমি মোহান্তের গদিতে অধিষ্ঠিত হও, সবারই অভিলাষ পূর্ণ করো।”

বিশুদ্ধানন্দজী গুরু গৌড়স্বামীর গদীতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু যতকাল তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ও গুরুপ্রতিম বিশ্বরূপ স্বামীর পরামর্শ না নিয়া কোন কর্ম্মে ব্রতী হন নাই, কোন গুরুতর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নাই।

একাদিক্রমে দীর্ঘ উনচল্লিশ বৎসরকাল কাশীর অধ্যাত্ম-সমাজে ও সারস্বত-সমাজে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী একাধিপত্য করেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ও ধ্যান-জপের পর ভস্ম-তিলকাঙ্কিত ললাটে এই সন্ন্যাসী-ভাস্কর শিষ্য ও ভক্ত দর্শনার্থীদের সম্মুখে পরমতত্ত্বের উপদেশ দিতেন। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত বেদান্তের অদ্বৈত বিচার ও রাজযোগের নিগূঢ় সাধন তত্ত্ব শুনিয়া শত শত শ্রোতা হইত কৃতকৃতার্থ।

সনাতন ধর্ম্মের দুর্গশিখরের শীর্ষপতাকা ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। উত্তর ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী সাধক ও শক্তিধর নেতা। ধর্ম্ম ও সমাজের বহুতর সমস্যা, বহুতর বিচার বিতর্ক উপস্থাপিত করা হইত এই মহাপুরুষের সম্মুখে। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির সাহায্যে সব কিছু সমস্যা, সংশয় ও বিতর্কের সমাধান অনায়াসে তিনি করিয়া দিতেন।

শাস্ত্রার্থ বিচারসভায় অনুগামী সন্ন্যাসীদের নিয়া বিশুদ্ধানন্দ বিরাজিত থাকিতেন শাস্ত্রমূর্ত্তিরূপে, ব্রহ্মসাধনার নিষ্কল দীপশিখা রূপে। সাধু সন্ন্যাসী, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিরক্ষর জনগণ সকলেরই সহজ শ্রদ্ধা, প্রেম ও আনুগত্য কি করিয়া তিনি অনায়াসে লাভ করিতেন তাহা ছিল এক পরম বিস্ময়।

পুরীধামের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী নাঙ্গাবাবার সহিত বিশুদ্ধানন্দজী দীর্ঘদিনের সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশীতে

আসিলেই নাঙ্গাবাবা মহারাজ প্রায়শঃ তাঁহার মঠে আসিয়া দর্শন দিতেন। দুই ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। অসিঘাটের হরিহরবাবা ও বনপুরোয়ার বীতরাগানন্দজী তখন নবীন সাধক। এ সময়ে প্রায়ই তাঁহারা বিশুদ্ধানন্দজীর চরণতলে গিয়া উপবেশন করিতেন, লাভ করিতেন শাস্ত্র ও সাধনার নিগূঢ় উপদেশ।[১] মণ্ডলী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সন্ন্যাসীরা বিশুদ্ধানন্দজীকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে আসিতেন, জানিয়া নিতেন পরম তত্ত্বের রহস্য।

সন্ন্যাসী শিরোমণি বিশুদ্ধানন্দজীর সারস্বত প্রতিভা দেশ-বিদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থীকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। উত্তরকালে ইঁহাদের এক একজন চিহ্নিত হইয়াছেন দিক্‌পাল পণ্ডিতরূপে।[২]

উত্তর ভারতের রাজরাজড়াদের মধ্যে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠা ছিল অসামান্য। ইঁহাদের কেহ কেহ ছিলেন তাঁহার গুণমুগ্ধ, কেহ বা ভক্ত শিষ্য। কিঙ্করের মত তাঁহার আদেশ পালনে ইঁহাদের অনেকে যত্নবান ছিলেন।[৩] স্বামীজীর আদেশে বহু সত্র, সন্ন্যাসী-মঠ ও আখড়ায় এই রাজারা অন্নবস্ত্রের যোগান দিতেন।

---

১ নাঙ্গাবাবা, হরিহরবাবা ও বীতরাগবাবার সহিত বিশুদ্ধানন্দজীর যোগাযোগের কাহিনী লেখক বীতরাগবাবার নিকট হইতে জানিয়াছেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বনপুরোয়ায় এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা বাস করিতেন। ১৯৬০ সালে দেড়শত বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে।

২ ইঁহাদের মধ্যে আছেন—দ্বারভাঙ্গার বাচ্চা ঝা, ভাটপাড়ার তারাচরণ তর্করত্ন (কাশীরাজের সভাপণ্ডিত) ও তাঁহার স্বনামধন্য পুত্র প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহারাষ্ট্রের সখারাম ও কাকারাম ভট্ট, বোম্বাইএর নান্থুরাম, রাজস্থানের চেতরামজী, অম্বিকাদত্ত ব্যাসজী, লাহোরের গুরুপ্রসাদ, মীরাটের সেবকরাম, স্বামীরাম মিশ্র, সত্যচরণ প্রভৃতি। দ্রঃ শিবম্, আশ্বিন ১৩৭২, বিশুদ্ধানন্দ (অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য)

৩ কাশ্মীর, সিন্ধিয়া, জয়পুর, ইন্দোর, বুন্দী, দ্বারভাঙ্গা, শিশোড়ী প্রভৃতির রাজারা স্বামীজীর পরম অনুগত ছিলেন। দ্রঃ ঐ

আর্য্য সমাজের প্রবর্ত্তক, সংস্কারপন্থী নেতা, দয়ানন্দ স্বামী তখন সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রবল আঘাত হানিতেছেন। উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র সফর করিয়া পণ্ডিত ও সাধু মণ্ডলীকে স্বমতে আনয়নের জন্য তাঁহার প্রয়াসের অন্ত নাই। সেবার কাশীতে আসিয়াও তিনি বহু ভাষণ দিতে থাকেন। কাশীর মহারাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের জন্য এক বিচারসভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় দয়ানন্দের প্রতিপক্ষ রূপে উপস্থিত থাকেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও তাঁহার ছাত্র কাশীরাজের সভাপণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন। বিচারে দয়ানন্দের পরাজয় ঘটে, এবং ইহার পর উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে তাঁহার নূতন মতবাদ আর বেশী বিস্তারিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই।

১৮৯০ সালের কুম্ভমেলায় যোগদান স্বামীজীর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধর্ম্মমেলায় যোগদান তো নয়, এ যেন এক বিজয় অভিযাত্রা। সন্ন্যাসী, ভক্ত ও শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের এক বিরাট বাহিনী মন্থরগতিতে অগ্রসর হয় বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে। চলার পথে যেখানেই যান, কাশীধামের এই বহুলখ্যাত মহাত্মার শিবিরের চারিপাশে দেখা যায় ভক্ত জনতার ভীড়। রাজরাজড়া ও শেঠের দল থাকেন স্বামীজী মহারাজের সেবায় সদা তৎপর।

মেলাক্ষেত্রে শাস্ত্রমূর্ত্তি, ব্রহ্মবিদ্ এই মহাপুরুষ প্রতিভাত হন এক দর্শনীয় পুরুষ রূপে। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু নরনারী সদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। আর্ত্ত ভক্তেরা সমাগত হয় দলে দলে। স্বামীজীর কৃপাপ্রসাদ লাভ করিয়া তাহারা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়।

মেলা হইতে ফিরিবার পথে কাশ্মীরের মহারাজা রণবীরসিংজীর অনুরোধে স্বামীজী শ্রীনগরে পদার্পণ করেন। এই কাশ্মীর যাত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামীজী সে-বার উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র নরনারীকে দর্শন দেন, সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করেন নূতনতর আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা।

অতঃপর আটবৎসর স্বামীজী মরদেহে অবস্থান করেন এবং এই

সময়ে কাশীধাম ত্যাগ করিয়া আর কোথাও তিনি গমন করেন নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মপীঠ ও বিদ্যাকেন্দ্রে সন্ন্যাসী সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিরাজিত থাকেন এক অত্যুজ্জ্বল আলোক স্তম্ভরূপে।

বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম প্রায় উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এখন শেষ লগ্নটির জন্য স্বামীজী প্রতীক্ষমান। শরীর প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল মঠের বাহিরে কোথাও তাঁহার যাওয়া হয় না, চিত্তবৃত্তি সদাই থাকে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছামত সন্ন্যাসী শিষ্যদের স্বাধ্যায়ে তিনি সহায়তা করেন।

গঙ্গাতীরে অহল্যাবাঈ ঘাটের উপরেই স্বামীজীর মঠ। মঠের দ্বিতলকক্ষে বসিয়া উদাস নেত্রে সেদিন গঙ্গার স্রোতধারার দিকে তাকাইয়া আছেন। এক নবীন সন্ন্যাসী শিষ্য একখণ্ড কঠোপনিষৎ নিয়া চরণতলে উপবেশন করেন। প্রসন্ন মধুর হাস্যে গ্রন্থটি হাতে তুলিয়া নিয়া স্বামীজী ধীরে ধীরে শুরু করেন তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যান। ক্রমে আসিয়া পড়ে সেই প্রসিদ্ধ কারিকাটি যাহাতে বলা আছে—সুষুম্না নাড়ীর কথা। দেহের শত শত নাড়ীর মধ্যে এই নাড়িটি মূর্দ্ধস্থলে গিয়া সংলগ্ন হয় এবং এই পথেই আপ্তকাম যোগীর প্রাণ উৎক্রমণ করে।

কারিকাটি ব্যাখ্যা করার সময় নবীন সন্ন্যাসী ছাত্রটি হঠাৎ একটু উনমনস্ক হইয়া পড়ে। বড় বিরক্তি বোধ করেন স্বামীজী মহারাজ। দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠেন, "এখন তো এ নাড়ীর কথায় কান দিচ্ছো না, দেখো অতি শীঘ্রই এই নাড়ী পথে হবে আমার দেহান্ত। তারপর এই নাড়ীর কথা আর হয়তো তোমার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না।"

নবীন সন্ন্যাসী বড় লজ্জিত হন, বার বার করজোড়ে গুরু মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন।

কয়েকদিন পরেই বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের প্রতীক্ষিত পরম লগ্নটি আসিয়া পড়ে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের চন্দন একাদশীর পুণ্যতিথি। সময় আসন্ন জানিয়া স্বামীজী শিষ্যদের আদেশ দেন, "আর কালবিলম্ব না ক'রে আমার দেহটি স্থাপন করো গঙ্গা বিধৌত ঐ বুরুজের ওপর। তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।"

শিষ্যেরা শোকবিহ্বল হইয়া পড়েন। মৃদু কণ্ঠে স্বামীজী তাঁদের আশ্বাস দেন, "শোক কেন বলতো? আত্মজ্ঞানীর জন্মই বা কই, মৃত্যুই বা কই? তোমরা চিত্তের স্থৈর্য্য অটুট রাখো।"

বুরুজের উপর নিয়া যাওয়া হইলে জরাজীর্ণ দেহটি নিয়া স্বামীজী ঋজু হইয়া উপবেশন করেন। তারপর সজ্ঞানে প্রাণবায়ুকে চালিত করেন সুষুম্নার মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের পথে।

তৎক্ষণাৎ চারিদিকে এ সংবাদ রটিয়া যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে সমবেত হয় সহস্র সহস্র ভক্ত ও দর্শনার্থী নরনারী। ব্রহ্মলীন মহাত্মার মরদেহটি পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া বিসর্জ্জন দেওয়া হয় পূতসলিলা ভাগীরথীর গর্ভে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভাগীরথীর দুই তীরে নামিয়া আসিয়াছে সন্ধ্যার অন্ধকার। আকাশের বুকে দুই চারিটি তারা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। নদীবক্ষ স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ, নোঙর-করা বজরাখানিতেও তেমনই অখণ্ড নীরবতা। একটি সুদর্শন যুবক ত্রস্তপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসেন, নিভৃত কক্ষের দ্বারে বার বার করেন করাঘাত।

সৌম্য, প্রশান্ত মূর্ত্তি এক বৃদ্ধ ধ্যান-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন, "কি বাবা, কি চাই তোমার ?"

যুবকের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "মশাই, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? আমায়ও কি দর্শন করাতে পারেন ?"

ধ্যানোত্থিত বৃদ্ধ তাপস সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম নেতা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গঙ্গার উপরে এই হাউস বোটে নিভৃত তপস্যায় কিছুদিন যাবৎ দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান মুমুক্ষু তরুণ—নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

যুবকের হৃদয়োচ্ছ্বাস ও ব্যাকুলতার মর্ম্ম বুঝিতে দেবেন্দ্রনাথের বিলম্ব হইল না। সস্নেহে নিকটে বসাইয়া তাহাকে শান্ত করিলেন, দিলেন নানা আশ্বাস ও উপদেশ। তারপর নিষ্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার চোখ দুটি ঠিক যোগীদের মত। একনিষ্ঠ হয়ে সাধন করো। তুমি সফলকাম হবে।"

নরেন্দ্রনাথ বজরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রবোধবাক্য তাঁহার উত্তেজনা হ্রাস করিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাণের অদম্য পিপাসা মিটিল কই ? মূল প্রশ্নের উত্তর তো তিনি সাধক দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাইলেন না।

নরেন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার আর এক চিত্র। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা তীরে দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ঝড়ের আলোড়ন তাঁহার অন্তরে। ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "মশাই আপনার কি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়েছে?"

বহু সাধু-পুরুষকে একথা বার বার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেহই তো এ পর্য্যন্ত 'হাঁ' বলেন নাই। ইনিও যদি আজ তাঁহাকে নিরাশ করেন?

সহজ কণ্ঠে, প্রত্যয়ের সুরে, অবিলম্বে রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "সে কি গো! দেখেছি বই কি? এই যেমন তোমাদের দেখছি— এমনি করেই তো রোজ দেখছি। শুধু তাই নয়, তোমাকেও দেখাতে পারি। কিন্তু আমার কথামত চলতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে স্মিতহাস্যে বটুয়া হইতে কিছুটা সুপারী তুলিয়া লইয়া ঠাকুর চিবাইতেছেন। নরেন্দ্রনাথ অপার বিস্ময়ে এই দেব-মানবের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া আছেন। বাক্য মনের অতীত ঈশ্বরকে এমন করিয়া পাওয়া যায়, এই দুঃসাহসের কথা এমন সহজ প্রত্যয় ভরা কণ্ঠে কেহ তো আজ অবধি বলে নাই।

যে প্রশ্ন তিনি আজ দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণের পদতলে বসিয়া করিলেন, তাহা শুধু তাঁহার নিজ জীবনেরই প্রশ্ন নয়, তাহা যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল বুদ্ধিজীবীদেরই সংশয় পীড়িত প্রশ্ন! যুক্তি, বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার জটিল গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও দর্শনের কামনা ইহাতে নিহিত।

দীর্ঘদিনের সেই প্রশ্নের উত্তর আজ মিলিয়াছে। সে উত্তর বাস্তব অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল, সহজ প্রত্যয়ে পূর্ণ। ঠাকুর অকুণ্ঠ কণ্ঠে দাবী করিতেছেন, তিনি তাঁহাকে ভগবৎ দর্শন করাইয়া দিবেন, যেমনটি নিজে দর্শন করিয়াছেন তেমন করিয়াই দিবেন।

এবার বলিবার পালা নরেনের। আত্মসমর্পণের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক, সে প্রস্তুতি আজ তাঁহার কোথায়? রামকৃষ্ণের তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে কই? এই অর্দ্ধোন্মাদ অর্দ্ধশিক্ষিত সাধকের পদে তাঁহার সমস্ত কিছু ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা উৎসর্গ করিতে পারিতেছেন কই?

কিন্তু নরেনকে পারিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে এই আত্মসমর্পণকে আমরা সম্ভব হইতে দেখি। এই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস ঠাকুরেরই করুণালীলার এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। দিনে দিনে পলে পলে সহজ স্বচ্ছন্দ ভালবাসার মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপটিকে, তাঁহার পরমতত্ত্বকে নরেন্দ্রনাথের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন। ঠাকুরের এই আত্মসাৎ-ক্রিয়াই নরেনের আত্মসমর্পণকে সহজতর করিয়া তোলে, অধ্যাত্মশিল্পী রামকৃষ্ণের মহান সৃষ্টি তাঁহারই মধ্যে ধীরে ধীরে রূপায়িত হইয়া উঠে। আচার্য্য বিবেকানন্দের ঘটে চমকপ্রদ অভ্যুদয়। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-জীবনে এ অভ্যুদয় ঘটায় কল্যাণকর উজ্জীবন, ত্বরান্বিত করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আত্মিক সেতুবন্ধন।

এক দুর্জ্জেয় ঐশীশক্তির আকর্ষণে যুবক নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই একই ঐশীশক্তির লীলা তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, স্রোত-ধারার গতিপথের মোড় ঘুরাইয়াছে বার বার—উত্তরণ ঘটাইয়াছে মুক্তির মহাসাগরে।

শিমুলিয়ার অভিজাত দত্ত-পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের রামমোহন দত্ত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠাবান উকিল। বিপুল বিত্তবিষয় তিনি রাখিয়া যান, কিন্তু পুত্র দুর্গাচরণ ইহাতে আকৃষ্ট হন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়সে পত্নী ও একমাত্র শিশু-পুত্র বিশ্বনাথের মায়া কাটাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই বিশ্বনাথ দত্তই স্বামী বিবেকানন্দের জনক।

বিশ্বনাথ কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্নী রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। ধনজনপূর্ণ বিশাল ভবনে রাজসিকতার সহিত বাস করিতে তিনি অভ্যস্ত হন। উদার ও আশ্রিত জনের পালক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। আর পত্নী ভুবনেশ্বরী ছিলেন এক ধর্ম্মপ্রাণা প্রাচীনপন্থী মহিলা। প্রতিদিন স্বহস্তে শিবপূজা না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। ইষ্টনিষ্ঠা, তেজস্বিতা ও কর্ম্মকুশলতায় তিনি ছিলেন অনন্য-সাধারণ।

একদিন ভুবনেশ্বরী শিবার্চ্চনায় বসিয়াছেন। সেদিন কি জানি কেন এক গভীর ধ্যানতন্ময়তা তাঁহাকে পাইয়া বসে। প্রায় সমস্ত দিনই ধ্যানাবেশে কাটিয়া যায়, তারপর রাত্রিতে ক্লান্ত দেহে পূজা-কক্ষেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন।

এই সময়ে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন। জটাজুটমণ্ডিত রজত-গিরিসন্নিভ মহেশ্বর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সন্তানরূপে ক্রোড়ে আসিতে চাহিতেছেন। 'শিব—শিব' উচ্চারণ করিতে করিতে ভুবনেশ্বরী নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন।

ইহার পরের বৎসর, ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভুবনেশ্বরী দেবীর অঙ্ক আলো করিয়া আসে এক সুদর্শন শিশু। সেদিন ছিল পৌষ-সংক্রান্তি, মকর-বাহিনী পূজার দিন। এই নবাগত শিশুপুত্রই নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের শক্তিধর সন্ন্যাসী,—স্বামী বিবেকানন্দ।

বাল্যকাল হইতেই নরেন দুরন্ত, প্রাণচঞ্চল। কি যেন এক অব্যক্ত অধীরতা নিয়া সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। আবার এই অশান্ত বালকের আধারে কখনো কখনো এক দুর্জ্জেয় ধ্যানের ধারা নামিয়া আসে, অকস্মাৎ কি করিয়া সে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

বালক তাহার সাথীদের সহিত একদিন পূজা-অর্চ্চনার খেলায় রত। চক্ষু মুদিয়া ধ্যানজপের অভিনয়ও বেশ শুরু হইয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে এক গোখ্‌রা সাপ ফণা নাচাইয়া আসিয়া উপস্থিত। খেলার সঙ্গীরা তো ভীত ত্রস্ত হইয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

নরেনের কিন্তু কোনই হুঁস নাই। দুই চক্ষু মুদিয়া অচঞ্চলভাবে উপবিষ্ট, সম্মুখে সাপটিও ফণা মেলিয়া স্থির হইয়া আছে। বালকের খেলার অভিনয় কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে ধ্যানের গভীরে তলাইয়া গিয়াছে কে জানে? বাড়ীর লোকে মহা সন্ত্রস্ত, পাছে বালকের অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সবাই চুপ করিয়া আছে। কিছুকাল পরে সাপটি ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল, আর আত্মীয়-স্বজনেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

নরেন পরে বলিয়াছেন, "বালক বয়সে একদিন ধ্যান করিতেছিলাম। ধ্যান শেষে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখিলাম—ঘরের দক্ষিণ দেয়াল ভেদ করিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান। মুণ্ডিত মস্তক, হাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু, নয়নে অপরূপ স্নিগ্ধতা। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন। অবাক হইয়া তাঁহার দিকে এতক্ষণ চাহিয়াছিলাম। হঠাৎ যেন ভয় হইল—দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।" কোন্ এক দিব্য পুরুষ যেন তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন।

বালক নরেনের নিদ্রার ভঙ্গিটিও বড় অদ্ভুত। উপুড় হইয়া তাঁহার শয়নের অভ্যাস। নিদ্রা আকর্ষণের সময়ে, বহির্জ্জগতের চেতনা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক অলৌকিক অনুভূতি। দেখেন, আলোকোজ্জ্বল পথ বাহিয়া একটি দিব্য বালক একটি গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড ঠেলিয়া নিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই জ্যোতি-গোলক ক্রমে তাঁহার ভ্রূমধ্যে আসিয়া স্থির হয়, তারপর জ্যোতির রাশি অজস্র ধারায় উহা হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে। এই দিব্য আলোক ধারায় তলাইয়া গিয়া অতঃপর ধীরে ধীরে সে নিদ্রায় ঢলিয়া পড়ে।

নরেনের নিজের কিন্তু ইহা বিস্ময়কর মনে হইত না। ভাবিতেন, এ তো সকলেরই নিদ্রার অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরকালে এই

অনুভূতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এটা যে ধ্যান-সিদ্ধের লক্ষণ গো!"[১]

নরেনের তখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, রায়পুরে পিতার সঙ্গে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছেন। একদিন একাকী গো-শকটে বিন্ধ্য পাহাড় দিয়া যাইতেছেন। এখানে হঠাৎ তাঁহার এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়। পাহাড়ের গায়ে তৈরী হইয়াছে একটি মৌমাছির চাক। সে দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই অন্তরে জাগিয়া উঠে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ। উত্তরকালে স্বামীজী নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা রাজ্যের আদি অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন জগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত উপলব্ধিতে এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের জন্য বাহ্য-সংজ্ঞার লোপ হইল। কতক্ষণ যে ঐভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।" প্রথম জীবনে নরেনের ধ্যানাবেশের ইহা এক অপূর্ব্ব নিদর্শন।

১৮৭৯ সালে নরেন্দ্রনাথ এনট্রান্স পাস করিয়া কলেজে ঢুকিলেন। ব্যক্তিত্ব, মেধা ও প্রাণশক্তি তাঁহার প্রচুর, তাই ক্লাসের ছেলেদের নেতা হইয়া উঠিতে দেরী হইল না। অধ্যাপকেরাও তাঁহাকে চিনিয়া নিলেন এক অসাধারণ ছাত্র বলিয়া। জেনারেল এসেম্বলীতে তখন প্রতিভাবান ছাত্রের অভাব ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও তখন এখানেই পড়িতেন, নরেন্দ্রনাথের এক ক্লাস উপরে। একবার এক বিতর্কসভায় নরেনের উপর খুসী হইয়া দর্শনবেত্তা অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেব বলেন, "এই তরুণ দর্শনশাস্ত্রের এক প্রতিভাধর ছাত্র। আমার মনে হয়, জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়েও এর মত একটি ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

---

১ প্রমথ বসু: স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড

নরেন তখনও এফ-এ পরীক্ষা দেন নাই। কিন্তু ডেকার্ট, হিউম ও বেন-এর সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব তিনি পড়িয়া ফেলিয়াছেন। ডারুইন ও স্পেন্সারের চিন্তাধারার সহিতও তাঁহার পরিচয় নিবিড়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যুক্তিবাদ ও বিচার বিতর্কের মধ্যে সত্যের প্রকৃত পথটি তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মত অবস্থা তাঁহার।

বাংলায় সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে প্রায় সাত বৎসর যাবৎ। রামমোহনের ধর্ম্ম দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের দ্বারা কিছুটা রূপান্তরিত। নৈতিক জীবনের দৃঢ় আদর্শ ও সমাজজীবনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে নরেনের প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে কই? অধ্যাত্ম-সাধনার রসে জীবনের শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্য দিয়া সাধকের প্রাণে আসে পরম শান্তি। কই সে শান্তি তো পাওয়া যাইতেছে না?

পাশ্চাত্য দর্শনের বিচার-বিশ্লেষণে নব্য শিক্ষিত নরেন দিশেহারা। ব্রাহ্মসমাজের ছায়াতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভাবিলেন, শাশ্বত সত্যের সন্ধান এবার হয়তো মিলিবে, কিন্তু কোথায় তাহা? সংশয় জাগে মনে, ঈশ্বর কি সত্যই আছেন? জীবন পথের শেষে অমৃত কুম্ভটি হাতে নিয়া যে জীবনপ্রভু প্রসন্ন মধুর হাসি হাসেন, তিনি কি শুধু কবির কল্পনা?

সন্দেহ সংশয় যাহা কিছু আসুক না কেন নরেন্দ্র কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা একই ভাবে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। বড় হইয়াও উচ্চতর প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ—ত্যাগী সাধকের জীবনই যাপন করিতেছেন।

সংশয় ও বিচার বুদ্ধির গহন অরণ্যে কিন্তু এক দিব্য অনুভূতি মাঝে মাঝে স্ফুরিত হইয়া উঠে। ধ্যান করিতে যখন বসেন, তখন তো কোন অবিশ্বাস অসন্তোষের ছায়াপাত অন্তরে হয় না? স্বচ্ছন্দ ধ্যানাবেশে তিনি অন্তর্লীন হইয়া যান।

প্রায়ই একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত হয় আর তাঁহার নয়ন সমক্ষে এক ত্রিভুজ যন্ত্রের অপরূপ ছবি রচনা করে। অজানা আনন্দে নরেন্দ্রনাথের হৃদয় রসায়িত হইয়া উঠে। ভাবেন, এ কোথাকার ইঙ্গিত? অতীন্দ্রিয়লোকের অন্তরালে তবে তো তাঁহার জীবন-প্রভু বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু কে তাঁহাকে এই পরমধন মিলাইয়া দিবে? অন্তর মথিত করিয়া প্রশ্ন উঠিতে থাকে, কোথায় সেই সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ যিনি ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, অভীপ্সিত পথে তাঁহাকে যিনি চালনা করিবেন?

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস। শিমুলিয়া পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। নরেনের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র পরম ভক্তিভরে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়া আসিয়াছেন। ভক্তি সঙ্গীত গাওয়া হইবে, তাই নরেনের ডাক পড়িল। নরেন যেমন নানা বৈঠকে ঘুরিয়া বেড়ান—তেমনই আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার কণ্ঠে গান শুনিয়া পরমহংসদেবের আনন্দের অবধি নাই। সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া এই প্রিয়দর্শন যুবকের দেহলক্ষণ মিলাইয়া দেখেন। পরিচয় গ্রহণের পর আমন্ত্রণ জানান, "দক্ষিণেশ্বরে একবার যেয়ো, কেমন?"

এফ, এ পরীক্ষার ব্যস্ততায় কয়েক মাস নরেন দক্ষিণেশ্বরের কথা ভুলিয়াই ছিলেন। আত্মীয় রাম দত্ত ও প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্ত। তাঁহাদের কথায় সেদিন ঠাকুরের কথা মনে পড়িল, কয়েকজন বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

উত্তরকালে রামকৃষ্ণ এই ঐতিহাসিক সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন —"দেখলাম, নরেনের নিজের দেহের দিকে কোনই লক্ষ্য নেই। মাথার চুল ও বেশভূষোর বাহার নেই। বাইরের কোন জিনিষেই ইতর সাধারণের মত আঁট নেই। সবই যেন আল্‌গা। চোখ দুটো

দেখে মনে হয়, ওর মনের অনেকটা কে যেন ভেতর থেকে টেনে রেখেছে। মনে হল, বিষয়ী লোকের জায়গা কলকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন উদাস সুরে গান ধরিলেন—

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে ?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলেছ আপন জনে ?

নিজের অজ্ঞাতসারে এ কি গান নরেন গাহিলেন ? যাহার কাছ হইতে আসিয়াছেন, যাহার কাছেই আবার ফিরিতে হইবে, এ যে সেই পরমাত্মীয় পরমাত্মার কথা।

সেই পরমাত্মারই আনন্দঘন ঠাকুর রামকৃষ্ণ এখানে বসিয়া আছেন। ঠাকুরকে নরেন সেদিন চিনেন নাই, কিন্তু ঠাকুর নরেনকে তখনি চিনিয়াছেন। মন প্রাণ ঢালিয়া নরেন গাহিলেন—আর ঠাকুর ততক্ষণে হইয়াছেন ভাবাবিষ্ট। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান তাঁহার তিরোহিত হইল।

নবপরিচিত রামকৃষ্ণ সেদিন 'আপনজনের' মতই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলেন। লৌকিক জীবনের চেনা-পরিচয়ের উর্দ্ধে, জন্ম-জন্মান্তরের যোগসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে এই আত্মীয়তার বোধ।

নরেনকে হাতছানি দিয়া ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় নিভৃত স্থানে নিয়া যান। দুই নয়নে দরবিগলিত প্রেমাশ্রুর ধারা। ঘনিষ্ঠ সুহৃদের মত বলিতে থাকেন "এত দিন পরে আসতে হয় ? আমি যে এতকাল অপেক্ষা করে আছি, তা ভাবতে নেই ? বিষয়ী লোকের

বাজে কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে যাচ্ছে। প্রাণের কথা বলতে না পেয়ে পেট ফুলে গেল!”

তারপর ঠাকুরের অবিশ্রান্ত কান্না। নরেন তো বিস্ময়ে হতবাক্। আবার এই উন্মাদ ব্রাহ্মণ হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে সাশ্রুনয়নে বলিতেছেন, “জানি, জানি প্রভু, তুমি সেই ঋষি, জীবের দুর্গতি দূর করতে তুমি এসেছ!”

বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ তরুণকে এই ব্রাহ্মণ কি বলিতে চাহিতেছেন? যেন কোন্ এক প্রচ্ছন্ন দেবতার উদ্বোধনের জন্য তাঁহার এই আকুতি। অথবা এটা কল্পনা বিলাস? নরেনের চিন্তাধারা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়!

ঠাকুর ক্ষণকাল পরেই নিজের ঘরে ছুটিয়া যান। কিছু মাখন মিছরি ও সন্দেশ আনিয়া নরেনকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে থাকেন। নরেন তাঁহার সঙ্গীদের সহিত এসব ভাগ করিয়া খাইতে উৎসুক— কিন্তু তাহা শুনে কে?

রামকৃষ্ণ স্নেহমাখা স্বরে বলেন, “ওরা খাবে এখন। তুমি আগে খেয়ে নাও।”

সবটা ভোজন করাইয়া ঠাকুর হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে থাকেন, “বল শিগ্‌গীর আর একদিন এখানে আসবে, একলাটি আমার কাছে আসবে!” নরেনকে কথা দিতেই হয়। তারপর সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়া গিয়া তিনি হাঁফ ছাড়েন।

নরেনের অন্তরে তখন চিন্তার ঝড় বহিতেছে। এই ব্রাহ্মণ কি উন্মাদ? আর তাই বা কি করিয়া হয়? ঈশ্বরের জন্যই তো সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছেন। উত্তরকালে তিনি বলিয়াছেন, “নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ত্যাগ জগতে খুব কম লোকই করিতে সক্ষম। উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐজন্য মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী। ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণ

বন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।”

নরেন চলিয়া গেলে ঠাকুরের কি অবস্থা? তাঁহার নিজের বর্ণনায়, “নরেন চলে গেলে, তাকে দেখবার জন্যে প্রাণের ভেতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হয়ে রইল যে বলবার নয়। সময় সময় এমন যন্ত্রণা হত যে মনে হত বুকের ভেতরটা যেন কে গামছা নিংড়ানোর মত জোর করে নিংড়াচ্ছে। নিজেকে তখন সামলাতে পারতুম না। ঝাউতলায় নির্জ্জনে গিয়ে ডাক্ ছেড়ে কাঁদতুম,—ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছিনা।”

এ আহ্বান আত্মার আত্মীয়ের। এ আহ্বান ঈশ্বরীয় কর্ম্মযজ্ঞের। এ অমোঘ আহ্বান নরেনকে চুম্বকের মত ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল।

মাসখানেক পরে নরেন আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। রামকৃষ্ণ একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। নরেনকে দেখিয়াই তিনি আনন্দে অধীর। পরম স্নেহে শয্যার এক পাশে তাঁহাকে বসাইলেন। ইহার পরই একেবারে ভাবাবিষ্ট। কিছুক্ষণ অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে নরেনের কাছে আসিয়া দক্ষিণ পদ দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল নরেনের দিব্য ভাবান্তর।

তিনি নিজেই ইহা বিবৃত করিয়াছেন, “আমার এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্ব্ব-গ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে, অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, ‘ওগো তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন! অদ্ভুত পাগল আমার ঐকথা শুনিয়া

খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তদ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "তবে এখন থাক্। একবারে কাজ নেই, কালে হবে!"[১]

ইহার পরই নরেন্দ্র আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পান। স্থির হইয়া তিনি ভাবিতে থাকেন, এই উন্মাদ ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ বিরাট শক্তি বিরাজিত? নরেনের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যবাদী, দৃঢ়চেতা, বিচারশীল যুবকের ইচ্ছাশক্তিকে অবলীলায় ইনি চূর্ণ করতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, একতাল কাদার মত উহাকে ছানিয়া স্বেচ্ছামত রূপ দান করিতেও তিনি সক্ষম। দিব্যশক্তিসম্পন্ন এমন মানুষকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াই বা যায় কি করিয়া?

আর এক দিনের অলৌকিক অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। দক্ষিণেশ্বরে যদু মল্লিকের বাগানে ঠাকুর ও নরেন সেদিন বেড়াইতেছেন। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর ধ্যানবিষ্ট হইয়া পড়েন। তারপর অকস্মাৎ নরেন্দ্রকে স্পর্শ করামাত্র তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায়।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরেন দেখেন, রামকৃষ্ণ তাঁহার বক্ষে মৃদুভাবে হাত বুলাইতেছেন, আননখানি তাঁহার দিব্য আনন্দের আভায় সমুজ্জ্বল।

এই দিনকার বাহ্যজ্ঞান লোপের অবস্থায় নরেনের সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের এক অলৌকিক প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের এ কথোপকথনের সারমর্ম্ম ঠাকুর উত্তরকালে ভক্তদের কাছে নিজেই বর্ণনা করিয়াছিলেন।

বিলুপ্ত-সংজ্ঞা নরেনকে সেদিন তিনি তাঁহার স্বরূপ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কোথা হইতে, কেন সে আসিয়াছে এবং কোন্ কর্ম্মসাধনের দায়িত্ব তাঁহার, এই প্রশ্নও তাহাকে করা হয়। নরেন ঠাকুরকে যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। ঠাকুর বলিতেন, "এ থেকেই জেনেছিলাম, নরেন যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন আর

১ স্বামী সারদানন্দ: লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড

ইহলোকে থাকবে না। দৃঢ়সঙ্কল্প সহায়ে যোগমার্গে সে তার দেহ ত্যাগ করে চলে যাবে। নরেন যে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ!”

ঠাকুরের দিব্য দেহের এতটুকু স্পর্শ, তার ফলেই একি বিচিত্র অধ্যাত্ম-অনুভূতি! নরেন ভাবিতে থাকেন, তবে কি এই মহা-সাধকের করুণা সম্পাতে অসম্ভবও সম্ভব হয়? মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কাররাশি হয় অপসৃত? তাঁহার নিজ দেহের গবেষণা-গারেই যে ইহার কিছুটা সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সঙ্গে যুক্তিবাদী মনের নানা সন্দেহও দেখা দেয়। এই দিব্যকান্তি ব্রাহ্মণ কোন সম্মোহন বিদ্যা আয়ত্ত করে নাই তো? নরেনের আত্মবিশ্বাসের মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। স্থির করেন,—বেশ কিছুদিন খুঁটিয়া খুঁটিয়া না দেখিয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না চালাইয়া রামকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করিবেন না।

ঠাকুর কিন্তু দিব্যদৃষ্টি বলে জানিয়া বসিয়া আছেন, নরেন তাঁহারই বাণীবাহ, তাঁহার ঐশী নির্দ্দিষ্ট লীলার সে প্রধান পরিকর। নরেন যে তাঁহার চোখে এক সহস্রদল কমল—কবে এটি ফুটিয়া উঠিবে রঙে রসে সৌগন্ধে, এ জন্যই যে তিনি প্রতীক্ষমান। একথা মাঝে মাঝে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াও বসেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া রামকৃষ্ণ ধর্ম্মকথা কহিতেছেন। সহসা ভাবাবিষ্ট হইয়া কেশব, বিজয় ও নরেনের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কি যেন তিনি ইহাদের মধ্যে খুঁজিতেছেন।

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে কহিলেন, “দেখলাম, কেশবের ভেতরে একটা শক্তি, যার ফলে সে জগৎ বিখ্যাত হয়েছে। আর নরেনের ভেতর সেরকম আঠারোটা শক্তি বর্ত্তমান। আবার দেখলাম, কেশব ও বিজয়ের হৃদয়ে প্রদীপের মত জ্ঞানালোক জ্বলছে, কিন্তু

নরেনের দিকে চেয়ে দেখি—তার ভেতরে জ্ঞান সূর্য্য উদিত হয়ে রয়েছে। মায়া মোহের লেশ পর্য্যন্ত নেই।"

নরেন চমকিয়া উঠেন। প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "মশাই কি সব বলছেন ? লোকে যে আপনাকে উন্মাদ বলবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয়কৃষ্ণ, আর কোথায় আমার মত এক নগণ্য ছোঁড়া !"

ঠাকুর অসহায়ের মত উত্তর দেন, "কি করবো রে, তুই কি ভাবিস যে আমি এসব বলেছি। মা যে আমাকে সমস্ত দেখালেন, তাই তো বল্লুম। মা তো আমাকে সত্য বই মিথ্যা কখনো দেখাননি, তাই তো আমি একথা বলেছি।"

তেজস্বী, তর্কবিশারদ নরেন সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিয়া বসেন, "ওসব অতীন্দ্রিয় রূপ-টুপ, মা কালীর দর্শন, নির্দ্দেশ, আপনার নিজের মাথার খেয়াল। দেহ-বিজ্ঞান বলছে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিকার অনেক সময় আমাদের প্রতারিত করে।"

ঠাকুর যেন ছোট বালকটি, ভীত হইয়া ভাবেন—তাই তো ! সত্যনিষ্ঠ নরেন তাঁহাকে ভুল বুঝাইতে যাইবে কেন ?

মা জগদম্বার নিকট সব কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তিনি আশ্বস্ত হন। বলিতে থাকেন, "মা আমাকে বলে দিলেন, ওর (নরেনের) কথা শুনিস কেন ? কিছুদিন পরে ও সব কথাই সত্য বলে মানবে।"

তরুণ ভক্তদের কথা উঠিলেই রামকৃষ্ণ নরেনের প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ। বলেন, "নরেনের মত একটি ছেলেও দেখতে পেলুম না। যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বল্‌তে-কইতে, আবার তেমনি ধর্ম্ম বিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস থাকে না !—আমার নরেনের ভেতর এতটুকু মেকি নেই। বাজিয়ে দেখ টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনও রকমে দু-তিনটে পাস করছে, ব্যস্‌, এই পর্য্যন্ত। ঐ করতেই যেন তাদের সব শক্তি

বেরিয়ে গেছে। নরেনের কিন্তু তা নয়—হেসে খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্ম সমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের মতন নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতি দর্শন হয়। সাধে কি তাকে ভালবাসি!"

নরেনের সম্বন্ধে ঠাকুরের বড় সহজ প্রত্যয়। প্রায়ই বলেন,—"ও খাপ খোলা তলোয়ার, ও অখণ্ডের ঘর, ধ্যানসিদ্ধ ঋষি।"

নিজের আচার-ব্যবহারেও এই তরুণ ভক্তের অসামান্যতাকে সকলের সামনে ফুটাইয়া তুলেন। দক্ষিণেশ্বরের বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ভক্ত যাওয়া-আসা করিত, ঠাকুরের জন্য নিয়া যাইত ফলমূল মিষ্টি। এই সব সকাম নিবেদনের বস্তু ঠাকুর নরেনকেই খাইতে দিতেন। বলিতেন, "ওর কোন হানি হবে না।"

নরেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, বাহ্বাস্ফোট তাঁহার বড় কম ছিল না। একদিন ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দর্পভরে বলেন, "মশায়, আজ হোটেলে, সাধারণে যাকে অখাদ্য বলে তাই খেয়ে এসেছি।" ঠাকুর এ কথায় গুরুত্ব না দিয়া উত্তর দেন, "ওরে তোর ওতে দোষ লাগবে না। শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে, তা হবিষান্নের তুল্য, আর শাকপাতা খেয়ে যদি কেউ বিষয় বাসনায় ডুবে থাকে তবে তা শোর গরু খাওয়ারই সমান।"

সমাগত ভক্তদের দিকে চাহিয়া বলিতেন, "নরেনের ব্যতিক্রমে দোষ নেই। ওর ভেতরে জ্ঞানাগ্নি সব সময়ে জ্বলছে, আহারের সব রকম দোষকে ভস্ম করে দিচ্ছে। এসব অনাচারে ওর মন কলুষিত হবে না।"

তার পর সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ঠাকুর এই চিহ্নিত ভক্ত সম্বন্ধে বলেন, "ও জ্ঞান-খড়্গ সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে। মহামায়া তাই তো ওকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারছে না!"

নরেন কিন্তু মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মতবিরোধ সবকিছু সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার তীব্র শ্লেষে, যুক্তি আর বাক্যবাণে সকলে জর্জ্জরিত হন।

নরেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য, নিয়মিত প্রার্থনায় সেখানে যোগ দেন। ঠাকুরের সাকার আরাধনা, তাঁহার অদ্বৈত উপলব্ধির কথা, স্বেচ্ছামত হাসিয়া উড়াইয়া দেন। রামকৃষ্ণের কিন্তু তাঁহার এই ভাবী উত্তরসাধকের উপর স্থির বিশ্বাস। এই রাজকীয় শিকারকে, লক্ষ্যবস্তু এই সিংহকে, আয়ত্তে আনার সুযোগের প্রতীক্ষা তিনি করিতেছেন।

শীঘ্রই এক আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার ও নরেনের সম্পর্ক নিকটতর হইল। নরেন ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

নরেন কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন না। ঠাকুর তাঁহার অদর্শনে অধীর। তাই এক রবিবার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য সোজা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া তিনি উপস্থিত। রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া কেশব, বিজয়, চিরঞ্জীব, প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতাদের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।[১] শিবনাথ প্রভৃতি একদল ব্রাহ্ম আচার্য্য তাই তাঁহার সংশ্রব তেমন পছন্দ করিতেছেন না। তাঁহার সংস্পর্শ যথা-সম্ভব এড়াইয়া চলিতেই তাঁহারা চান। কিন্তু আগ্রহাকুল রামকৃষ্ণের এতকিছু ভাবিবার অবসর কোথায়? নরেনের খোঁজে, বৎসহারা গাভীর মত সেদিন তিনি সমাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত।

সমাজ মন্দিরে ঢুকিয়াই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। দেহ রোমাঞ্চিত, পা দুটি টলিতেছে। এই অবস্থায় বেদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্র প্রতি রবিবারে সমাজ-গৃহে আসেন। সেদিনও উপস্থিত। ঠাকুর কেন আসিয়াছেন, বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

১ মাক্‌স্ মূলের: রামকৃষ্ণ—হিজ্ লাইফ্ এণ্ড সেইংস্

বেদীর আচার্য্য বা আর কোন ব্রাহ্ম নেতাই কিন্তু ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানাইলেন না। শিষ্টাচার বর্জ্জিত এক বিরূপ পরিবেশ। ঠাকুরের কিন্তু কোন হুঁসই নাই, অচিরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কৌতূহলী জনতার ভীড় এড়ানোর জন্য মন্দিরের গ্যাসের আলোক নিভাইয়া দেওয়া হইল। অতিকষ্টে ঠাকুরকে নিয়া নরেন মন্দির হইতে নিক্রান্ত হইলেন, উপনীত হইলেন দক্ষিণেশ্বরে।

তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্যই ঠাকুরের এই অপমান বরণ! নরেনের মর্ম্মে এ ঘটনাটি তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ হইল। ভালবাসা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও কম হয় নাই। রামকৃষ্ণের এই দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। তারপর ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "মশাই, শেষটায় এই মায়ার জন্য আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। পুরাণে আছে, ভরত রাজা হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে—হরিণ হয়ে যান, আপনারও ভাগ্যে আছে তেমনি পরিণাম!

রামকৃষ্ণ যেন জগদম্বার বালক পুত্রটি। বিষণ্ণ মনে তখনই মায়ের নিকট ছুটিয়া যান। আবার তাঁহার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া যখন ফিরিয়া আসেন, আননখানি আনন্দের আভায় উজ্জ্বল। স্মিত হাস্যে নরেনকে বলিতে থাকেন, "যা শালা! আমি তোর কথা শুনবো না। মা বলে দিলেন,—তুই যে ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস। তাই এত ভালোবাসিস। যেদিন ওর ভেতর সেই নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।"

এই দেব-শিশুর কাছে, জগন্মাতার চরণে সমর্পিত-প্রাণ সন্তানের কাছে, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন হার মানিতে হইয়াছিল।

নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই ঠাকুরের আনন্দ উথলিয়া উঠে। মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া এমন উদ্দীপনা হয় যে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

সামনেই বি-এ পরীক্ষা। পড়া তৈরী করার জন্য নরেন কিছুদিন

যাবৎ ব্যস্ত, দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারিতেছেন না। ঠাকুর তাঁহার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। একদিন নরেনের সহিত সাক্ষাতের জন্য নিজেই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। পড়াশুনা ও ধ্যান-ধারণার সুবিধার জন্য নরেন্দ্র তখন তাঁহার মাতামহীর বাসাবাড়ীর এক নিভৃত কক্ষে বাস করিতেছেন। দোতলার এই ক্ষুদ্র ঘরটির নামকরণ করিয়াছেন "টং।" একটি ক্ষুদ্র তক্তাপোষের উপর মাদুর পাতা, চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে বইখাতা। মেজের একদিকে স্তূপ করা তামাকুর গুল ও ছাই। অপর দিকে তানপুরা ও বাঁয়া-তবলা। ঘরের মালিকের অশান্ত মনেরই এ যেন এক হুবহু প্রতিচ্ছবি।

ঠাকুর নীচ হইতে 'নরেন, নরেন' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। নরেন ছুটিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে নিয়া যান। সাশ্রুনয়নে, গদ্‌গদ স্বরে ঠাকুর বলিতেছেন, "তুই এতদিন যাসনি কেন রে? তুই এতদিন যাসনি কেন?"

প্রেমলীলার শেষ এখানেই নয়। দক্ষিণেশ্বর হইতে গামছায় বাঁধিয়া নরেনের জন্য সন্দেশ আনিয়াছেন। ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিয়া বলিলেন, "ধর খা, খা।"

স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "একটা গান শোনা দেখি, অনেকদিন তোর কণ্ঠ শুনিনি।"

বড় অযাচিত এ আগমন আর বড় অহেতুক এ কৃপা। নরেন অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। তানপুরা লইয়া ধীর কণ্ঠে সঙ্গীত শুরু করিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী।
(তুমি) নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা
আধার-পদ্ম-বাসিনী।

ঠাকুরের মন তখন ধীরে ধীরে উর্দ্ধতর চেতনায় উঠিয়া যাইতেছে। ক্রমে সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

নরেন ঠাকুরের ধরণ-ধারণ আজকাল কিছুটা বুঝিয়া নিয়াছেন। ভজন গানের মাধ্যমেই ঠাকুরকে বাহ্য-জ্ঞানের ভূমিতে অবতরণ করাইতে হইবে। তাই গাহিতে লাগিলেন, 'একবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে নাচ মা শ্যামা।'

ধীরে ধীরে ঠাকুর সহজ অবস্থায় আসেন। তারপর আদরের ধন নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়া গিয়া তবে শান্ত হন।

স্বার্থগন্ধহীন এই অপার্থিব প্রেমের বন্যা দিনের পর দিন যেন নরেনের জীবনের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিতেছে। ইহারই উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, "ঠাকুরের এই ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে।"

দিব্য প্রেমের চুম্বকাকর্ষণে নরেন ধীরে ধীরে ঠাকুরের অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া যাইতেছেন। কিন্তু ইহার পরই আসে ঠাকুরের আর এক রকম পরীক্ষা। কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি নরেনের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন না। অহেতুক কৃপার ধারাটি যেন প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছেন। নরেন্দ্রকে দেখা মাত্র আগে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। এখন আর সেরূপটি দেখা যায় না। ডাকিয়া একবার একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। নরেন্দ্রনাথেরও যেন এই তাচ্ছিল্যে আজকাল তেমন আর কিছু যায় আসে না। পূর্ব্ববৎ নিয়মিত ভাবে ঠাকুরকে গিয়া তিনি দর্শন করেন। তারপর ভক্তদের সহিত বাক্যালাপ করিয়াই ফিরিয়া আসেন নিজগৃহে।

এই অবহেলা ও ঔদাসীন্যের পালা প্রায় একমাস চলিল। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমি তো তোকে ডেকে

আজকাল একটা কথাও বলি না। তবে তুই এখানে কি করতে আসিস্ বল্ দেখি ?"

নরেন্দ্র অবলীলায় উত্তর দিলেন, "আপনার কথা শুনতে তো আসি না। আপনাকে ভালবাসি, সব সময়ে দেখতে ইচ্ছে করে—তাই আসি।"

দুর্দ্ধর্ষ সিংহ এইবার ধরা পড়িয়াছে শিকারীর জাল বেষ্টনীতে। নরেনের এই অকপট স্বীকারোক্তিতে ঠাকুরের তাই আনন্দের অবধি নাই। স্মিত হাস্যে বলিলেন, "আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা করে) দেখছিলাম—আদর-যত্ন না পেলে তুই পালিয়ে যাস্ কিনা ; তোর মত আধারই এতটা তাচ্ছিল্য সহ্য করতে পারে।"

রামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নরেনকে অদ্বৈত তত্ত্বের মর্ম্ম-কথা বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। নরেন ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা প্রভাবিত, এমন কট্টর অদ্বৈতবাদের কথায় তাঁহার মন সায় দেয় না। মন্দির চত্বরের এক পাশে প্রতাপ হাজরা থাকেন। নরেন সেখানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্পগুজব করেন, তামাক খান। কথা প্রসঙ্গে নরেন হাজরার সম্মুখে বসিয়া সেদিন বলিতেছেন, "আচ্ছা মশাই, একি কখনো হতে পারে ? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দু'চোখে দেখছি সকলই ঈশ্বর !"

হাজরাও এ কথার উপর ব্যঙ্গ করিয়া এক মন্তব্য করেন। উভয়ের মধ্যে হাসির রোল উঠে। ঠাকুর তাঁহার কক্ষে ভাবাবিষ্ট। নরেনের হাস্যরব কানে যাইতেই বাহিরে চলিয়া আসেন। নয়ন আধ-নিমীলিত, পরনের কাপড়খানি বালকের মত বগলে ধরা। নিকটে আসিয়া স্মিত হাস্যে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তোরা কি বলছিস রে ?" তারপর একটু কাছে ঘেঁষিয়া নরেনকে স্পর্শ করিতেই ঘটে এক অদ্ভুত কাণ্ড ! নরেন সমাধিমগ্ন হইয়া যান।

এ যেন ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শ! হাস্য-পরিহাসরত নরেনের সত্তায় বিপ্লব ঘটিয়া গেল! মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত চেতনার, সমস্ত অস্তিত্বের যেন এক বিরাট রূপান্তর সাধিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নরেনের উপলব্ধি হইল, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুরই কোন অস্তিত্ব নাই। এই অপূর্ব্ব দিব্য অনুভূতি জাগ্রত রহিল সারাদিন ব্যাপিয়া।

তারপর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেও দেখা গেল এই চৈতন্যময় অবস্থা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আহারে বসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অন্ন, থালা, পরিবেশনকারী, সব কিছুই সেই এক পরম ব্রহ্মেরই রূপায়ণ। রাস্তা-ঘাটে, কলেজে সেই একই অভিজ্ঞতা। শুধু তুই একদিন নয়, কয়েকদিন এই চিন্ময় অনুভূতি সর্ব্বসত্তায় ওতপ্রোত রহিল।

স্বামীজী বলিয়াছেন, "যখন আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমে যেত তখন জগৎটাকে মনে হত স্বপ্ন। হেদুয়া পুকুরে বেড়াতে গিয়ে তার চারদিকের লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকে দেখতাম, যা সব দেখছি তা স্বপ্নময় না বাস্তব। হাত পা'র অসাড়তার জন্য মনে হত, পক্ষাঘাত হবে না তো? বেশ কিছুকাল এই ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাই নি। যখন প্রকৃতিস্থ হলাম তখন ভাবলাম —এই হচ্ছে অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস। তবে তো শাস্ত্রে যা লেখা আছে, তা মিথ্যে নয়। সেই অবধি অদ্বৈততত্ত্বের ওপর আর সন্দেহ জাগে নি।"

শুদ্ধতম প্রেমের দুর্ভেদ্য বেড়াজালে ঠাকুর নরেনকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। এইবার বাস্তব অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে চৈতন্যের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত করিয়া দিলেন। পরিহাস ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী নরেন তাঁহার অনুসন্ধান শুরু করিয়াছিলেন। পূর্ণ প্রত্যয়ের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আজ তাহারই ঘটিল আত্মপ্রকাশ।

সিংহ এবার এক লম্ফে লক্ষ্যবস্তুর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—রামকৃষ্ণতত্ত্ব প্রবিষ্ট হইয়াছে নরেনের সর্ব্বসত্তায়।

নরেনের স্বীকৃতি ও শরণাগতির এক অপূর্ব্ব চিত্র শরৎ মহারাজ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৪ সালের শীতকাল। শরৎ ও শশীর সহিত হেদুয়ায় বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন তাঁহার প্রত্যয়ভরা মর্ম্ম-কথা উদ্‌ঘাটন করিলেন। রামকৃষ্ণের ঐশী নির্দিষ্ট কর্ম্মলীলার আভাস তখন তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার কৃপাবলে কত শরণাগত ভক্তের কত সংস্কার বন্ধন কাটিতেছে, দিব্য আনন্দের অধিকারী তাঁহারা হইতেছেন, ইহার অপূর্ব্ব বর্ণনা দিলেন। প্রত্যক্ষ অনুভূতি-লাভে তিনি নিজেও যে আজ ধন্য। তারপর সজল নয়নে প্রেম গদ্‌গদ স্বরে নরেন গান ধরিলেন—

প্রেমধন বিলায় গোরা রায়,
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়,
(তোরা কে নিবিরে আয়!)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে
তবু না ফুরায়!

তরুণ সাধকের হৃদয়ের কপাটখানি সেদিন উন্মুক্ত। আপন মনে অস্ফুট স্বরে তিনি কহিয়া যাইতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, সত্য সত্যই তিনি বিলাচ্ছেন। যা কিছু শ্রেয়, প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাকে যা ইচ্ছে তাকে যেন তাই বিলাচ্ছেন। কি অদ্ভুত শক্তি!—রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছি, সহসা আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন—শরীরের ভেতরে যেটা আছে সেইটাকে। তারপর কত কথা কত উপদেশের পর আবার ফিরতে দিলেন। সব করতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সত্যিই সব করতে পারেন।"

অতীন্দ্রিয়লোকের অভ্যন্তরে, পরম চেতনা ও শক্তির মর্ম্মকেন্দ্রে মহাসাধক রামকৃষ্ণ সমাসীন। তাঁহার সহিত নরেন্দ্রনাথের পরিচয়

এইবার সাধিত হইতেছে। সেই নিগূঢ় অধ্যাত্মলোকের চমকপ্রদ বার্ত্তারই আভাস তাঁহার সেদিনকার কথায় ফুটিয়া উঠে।

সাধনপথের দিগ্‌নির্ণয় হইয়াছে—নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার জীবনপ্রভুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাই বুঝি এবার ঠাকুর শুরু করিলেন নরেনের পরীক্ষা ও জীবনমন্থন। দারিদ্র্যের পীড়ন আসে বার বার। তারপর ঘটে পিতার আকস্মিক মৃত্যু। এই দুর্দ্দৈবময় অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে। ইহার কিছুকাল আগে নরেন বি, এ, পরীক্ষা দিয়া উঠিয়াছেন।

পিতা বিশিষ্ট এটর্নী হইলেও তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী। সঞ্চয় দূরের কথা ঋণের বোঝা-ই কিছুটা রাখিয়া গিয়াছেন। আর সেই সঙ্গে রহিয়াছে মা ও কয়েকটি ভাইবোনের খাওয়া পরার দায়িত্ব। মাতা ও পুত্র সাহসের সহিত এই সংগ্রামে রত হইয়াছেন। যে সংসারের মাসিক ব্যয় হাজার টাকা, আজ তাহা ত্রিশ টাকায় চালাইতে হইতেছে। কিন্তু এই টাকারই বা সংস্থান কোথায়?

এই সময়কার সঙ্কটের বাস্তব চিত্রটি উত্তরকালে বিবেকানন্দের নিজের ভাষায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে, "মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকুরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অফিস হইতে অফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখের দুঃখী হইয়া সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিফল হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে আমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্ব্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দুইদিন পূর্ব্বেও যাহারা আমাকে সাহায্য করিতে পারিলে ধন্য হইত, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছেন।...যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে'

বলিয়া বাহির হইতাম এবং সামান্য কিছু খাইয়া, কোনদিন বা অনশনে, কাটাইয়া দিতাম।”

এত কিছু দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের উপর ছিল জ্ঞাতিদের শত্রুতা। বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করার জন্য তাহারা জোর মামলা শুরু করিয়া দিয়াছেন।

এই সব উৎপীড়নের সঙ্গে আছে আর এক ধরণের উৎপাত। এক ধনী মহিলার দৃষ্টি আগে হইতেই সুদর্শন তরুণ নরেনের উপর পড়ে। সুযোগ বুঝিয়া এবার তিনি লোভ দেখাইতে থাকেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিলে নরেন অচিরে এই অর্থকষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। নরেন্দ্র কিন্তু ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

এক ধনী বন্ধু আমোদ-প্রমোদের জন্য এই সময়ে নরেনকে তাঁহার বাগান বাড়ীতে নিয়া যায়। নরেন গিয়া দেখেন, সুরা এবং বারাঙ্গনারও ব্যবস্থা সেখানে রহিয়াছে। সকলে যুক্তি করিয়া স্ত্রীলোকটিকে হঠাৎ নরেনের বিশ্রাম-কক্ষে প্রেরণ করে। যুবতীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া তেজস্বী নরেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে থাকেন,—কেন সে এই পাপের পথে নামিয়াছে? সত্যকারের সুখ তাঁহার জীবনে কখনো মিলিয়াছে কি?

তারপর তীক্ষ্ণ পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, “বাছা, এই ছাইভস্ম দেহটার তৃপ্তির জন্য তো কত কিছু করলে। কিন্তু মৃত্যু কি তোমায় ছাড়বে? সে তো ক্রমেই এগিয়ে আসছে। পারের সম্বল কিছু করেছ কি? এসব ছেড়ে, ভগবানকে ডাকো।”

রমণী লজ্জিতা ও অনুতপ্তা হয়, ফিরিয়া আসিয়া অনুযোগের সুরে বলে, “ছিঃ এমন লোকের কাছেও কি আমায় পাঠাতে হয়।”

সাহস ও অকপটতা নরেনের আজন্ম বৈশিষ্ট্য। বাগানবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সবাইকে বলিতে থাকেন, “জানো, আজ বাগানে গিয়া কত আমোদ-প্রমোদ করে এসেছি। তাছাড়া, মদ, মেয়েমানুষ সবই সেখানে ছিল।”

এ সব কথা পল্লবিত হইয়া পরমহংসদেবের কানে পৌঁছিল। নরেন অধঃপাতে গিয়াছে! রামকৃষ্ণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "চুপ কর, শালারা! মা বলেছেন, সে কখনো অমন হতে পারে না। যোষিৎ-সংসর্গ ওর হবে না। আর কখনো আমাকে ওসব কথা বললে আমি তোদের মুখ দেখবো না।"

নরেনের জীবনপ্রভু তাঁহার জ্যোতিঃনিষ্যন্দী তৃতীয় নয়নটি যে সতত তাঁহার দিকেই নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। সে নয়নের দৃষ্টি-সীমা এড়াইয়া চলার উপায় তাঁহার কই?

কখনো অভিমানে, কখনো বা দারিদ্র্যের পেষণে নরেন তাঁহার উষ্মা প্রকাশ করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ জানান। কিন্তু ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন, যে অপ্রাকৃত দর্শন তাঁহার হইয়াছে, তাহা তো বিস্মৃত হইবার নয়। অন্তঃসঞ্চারী আলোকস্রোত ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনের গভীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপার উৎস হইতেই যে সে প্রবাহ নামিয়া আসিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কই?

নরেন্দ্রনাথ তখন বেকার। সেদিন ভগ্ন হৃদয়ে অবসন্ন দেহে গৃহে ফিরিতেছেন। শেষটায় রাস্তার পাশে বারান্দায় শুইয়া পড়িতে বাধ্য হন। চেতনা তখন বিলুপ্ত প্রায়। এই সময়ে জাগিয়া উঠে এক বিস্ময়কর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। উত্তরকালে নিজেই তিনি ইহা বিবৃত করিয়াছেন,—"সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন্ এক দৈবশক্তি প্রভাবে একের পর অন্য—এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দ্দা যেন উত্তোলিত হইল। তখন শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য কোথায়—এই শ্রেণীর যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন

নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ; এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।"

ইহার পর অন্তরে শুরু হয় এক নূতনতর আলোড়ন। তীব্র বৈরাগ্যের ঝড় বহিতে থাকে। জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, নিন্দা-প্রশংসায় তাঁহার কি আসে যায়? জাগিয়া উঠে দৃঢ় প্রত্যয়,—সংসারের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। মুক্তির আস্বাদ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। স্থির করিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া নিবেন সন্ন্যাস জীবন।

কয়েকদিন পরে রামকৃষ্ণ কলিকাতায় এক ভক্তগৃহে আসিয়াছেন। নরেনকে সেদিন এক রকম জোর করিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়া গেলেন। ঘরের মধ্যে বহু ভক্তের সমাগম। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ নরেনের নিকটে আসিয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। তারপর সজল চক্ষে গুন্‌গুন্ স্বরে গান ধরেন,—

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই!

এ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিতে নরেনের দেরী হইল না। সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা তাঁহার এই গানের পদে লুকানো।

নরেনের মনের রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ যেন মুহূর্ত্তে অর্গলমুক্ত হইয়া গেল। ঠাকুরের মত তাঁহার চোখ দুটিও অশ্রু ছলছল।

উভয়ের এই রহস্যময় আচরণে বিস্মিত হইয়া সবাই নীরবে

বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্যে তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমাদের ভেতর একটা ব্যাপার হয়ে গেল।"

সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে নরেনকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ গোপনে বলিলেন, "ওরে আমি জানি, তুই মায়ের কাজের জন্যই এসেছিস্। সংসারে থাকা তোর হবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি, আমার জন্য থাক্।" কথা কয়টি নরেন্দ্রনাথের জীবনে যেন আলোক-সঙ্কেত। সরাসরি মর্ম্মমূলে গিয়া এগুলি বিদ্ধ হইল। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল ঠাকুরের ছলছল দুটি আয়ত নয়ন আর অন্তরের প্রেম-প্রবাহ। এ প্রবাহ নরেন্দ্রনাথের মত ঐরাবতকেও ভাসাইয়া নিবার পক্ষে যথেষ্ট।

বাড়ীর মামলা ক্রমে আরো জটিল হয়। জ্ঞাতিরা উৎখাতের মামলায় তাঁহাকে কাবু করিতে চাহিতেছে। পুস্তক প্রকাশক ও এটর্ণীর অফিসে চূড়ান্ত পরিশ্রম করিয়া এই সময়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে মা ও ভাই-বোনদের অন্ন-সংস্থান হয় না। তদুপরি মোকদ্দমার ব্যয়। অর্থাভাব ক্রমে চরমে উঠিল।

আত্ম-পরিজনের অন্নকষ্ট আর সহ্য হয় না। নরেন একদিন ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। স্থির করিলেন, যে ঠাকুরের উপর জীবনের সমস্ত ভার চাপাইয়া তিনি বসিয়া আছেন, আজ মা ও ভাই-বোনের অন্নসংস্থানের জন্য তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা মাগিয়া নিবেন। সর্ব্ব অন্তর খুঁজিয়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল। ঐহিক পারত্রিক যাহা কিছু চাহিবার, তাঁহার নিকট ছাড়া আর কাহার কাছে চাহিবেন? আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক দুই জীবনেরই বোঝা আজ তিনি ঠাকুরের পদে সমর্পণ করিতে পারিলে বাঁচেন। আত্মবিশ্বাস তাঁহার চিরতরে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

তখনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন,

"মশায়, সংসারের ভাবনা আর আমি ভাববো না। আপনি মাকে বলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

"ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই নিজে মাকে জানাস্ না কেন? মাকে যে মানিস না, তাই এত বিপদ হচ্ছে। কালীঘরে গিয়ে মায়ের কাছে আজ তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন। মা যে আমার চিন্ময়ী, ব্রহ্মশক্তি। ইচ্ছেমাত্র সবকিছু করতে পারেন। তুই যা না তাঁর কাছে।"

গভীর রাত। নরেন ধীর পদে ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়া বসেন। নিবিড় ভাবের ঘোরে তিনি আবিষ্ট। সেদিনকার অনুভূতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পরে বলিয়াছেন, "যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল। মাকে সত্য সত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব—এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া অত্যন্ত একাগ্র ও তন্ময় হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য সত্যই তিনি জীবিতা এবং অসীম প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণরূপিণী। ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি, এইরূপ করে দাও।' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন।"

পাষাণ প্রতিমায় ঘটিয়াছে চিন্ময়ী জগজ্জননীর দিব্য আবির্ভাব। নরেনের সমগ্র সত্তার মূলে জাগিয়াছে প্রচণ্ড আলোড়ন। অন্নবস্ত্রের নগণ্য সমস্যা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই মায়ের কাছে তাহা জানাইতে পারেন নাই। ঠাকুরের নির্দ্দেশে তিন তিন বার মন্দিরে গিয়া বসিলেন। কিন্তু সে প্রশ্ন আর উঠাইতে পারিলেন কই?

বার বারই ভাবেন, কোন্ লজ্জায় এই তুচ্ছ কথা জগজ্জননী আদ্যাশক্তিকে তিনি জানাইতে যাইবেন? ঠাকুরের মূল্যবান কথাটি অমনি তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন, "রাজার প্রসন্নতা লাভ করে তাঁর কাছে তুচ্ছ লাউ-কুমড়ো চাওয়া—সে যে নির্ব্বোধের কাজ রে।"

মায়ের কাছে সেদিন শুধু জ্ঞানভক্তি প্রার্থনা করিয়াই নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন।

সহসা এই ঘটনার অর্থ তাঁহার নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল। বুঝিলেন, ইহা ঠাকুরেরই এক রহস্যময় লীলা। নতুবা যে সমস্যার কথা বলিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে এমন ভুল বার বার হইবে কেন?

বাড়ীর অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এবার তাই ঠাকুরকেই ধরিয়া বসিলেন। উপায়ান্তর অভাবে রামকৃষ্ণকেই সেদিন বলিতে হয়, "আচ্ছা, যা মোটা ভাত-কাপড়ের কষ্ট কখনো হবে না।"

সব কিছু ভালমন্দ ঠাকুরের পায়ে নরেন ইতিপূর্ব্বে বিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মা ভাই-বোনের কর্ত্তব্যের বোঝাকেও সেখানে নামানোর কথা তো কখনো ভাবেন নাই? রামকৃষ্ণ আজ যেন নিজেই কৃপা করিয়া এ বোঝা কাড়িয়া নিলেন। দায়িত্ববোধ ও আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে একটা সূক্ষ্ম অহংবোধ। তাও ঠাকুর নরেনের জীবন হইতে বুঝি মুছিয়া ফেলিতে চাহিলেন।

চিন্ময়ী জননীর অপরূপ দর্শন! এ দর্শন নরেনের অন্তরে সেদিন অবিরাম আনন্দের প্রস্রবণ বহাইয়া দেয়। ঠাকুরকে ধরিয়া তখনই জগজ্জননীর এক স্তুতি-গান শিখিয়া নেন। আনন্দাবেশে সারা রাত তাঁহার ঘুম হয় না, গানের কলি কেবলই কণ্ঠে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে থাকে—

তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী,
(আমার) মা ত্বংহি তারা।

তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।"

নরেন ব্রহ্মময়ীকে দেখিয়াছেন, ব্রহ্মের সাকার রূপ মানিয়া নিয়াছেন, তাই রামকৃষ্ণের আজ আনন্দের অবধি নাই। বালকের মত তিনি হাস্যমুখর। সবাইকে ডাকিয়া বার বার বলিতেছেন, জানো, "নরেন মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—না?"

পরদিন নরেন কলিকাতায় ফিরিবেন। প্রণাম করিতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। ছোট ছেলেটির মত নরেনের কোলে উঠিয়া বসেন, ভাবজড়িত কণ্ঠে কহেন, "দেখছি কি—এটা (নিজের দেহ) আমি, আবার ওটাও (নরেনের দেহ) আমি। সত্য বলছি, কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিছু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। —তা, মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?"

অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর এবার তামাক খাইতে শুরু করিলেন। তারপর কল্‌কেটি নরেনের মুখের সামনে নিয়া কহিতে লাগিলেন, "খা, আমার হাতেই খা।" নরেন সসঙ্কোচে মুখ ফিরাইয়া নেন, কিন্তু ছাড়া পাইবার উপায় নাই। ঠাকুরের হস্তে তাঁহাকে এই তামাক খাইতেই হইল।

কিন্তু কল্‌কেটি ঠাকুর যেই নিজ মুখে লাগাইতে যাইবেন নরেন শিহরিয়া উঠিলেন, হাত চাপিয়া ধরিলেন। খাবারের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে ঠাকুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিতেন না। এখন যেন সবই বিপরীত।

ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দূর শালা! তোর বড় ভেদ বুদ্ধি। তুই আর আমি কি আলাদা?"

ঠাকুরের এই আচরণ গুরু ও শিষ্যের একাত্মকতা ও অভেদত্ব যেমন বুঝাইতে চাহিতেছে, তেমনি সামনে তুলিয়া ধরিতেছে অদ্বৈত-অনুভূতির আদর্শ।

আর একদিনের কথা। রামকৃষ্ণ সেদিন নিভৃতে নরেনকে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ডাকিয়া নিয়া যান, তারপর স্নেহ-পূর্ণ স্বরে কহেন, "ত্যাখ্, তপস্যার ফলে আমার ভেতর অনেক কাল হল অণিমাদি বিভূতি সব এসে গেছে। কিন্তু আমি তা দিয়ে কি করবো? যার পরনের কাপড় ঠিক থাকে না, এসব সে কি করে কাজে লাগাবে? কিন্তু মা তো বলেছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হবে। তোর ভেতরে শক্তি সঞ্চার করে ওগুলো এবার দিয়ে দি, তুই কাজে লাগাতে পারবি। কি বলিস?"

ঈশ্বর লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প তখন নরেনের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। যোগ বিভূতির ঐশ্বর্য্য প্রলোভন তাঁহাকে টলাইতে পারিবে কেন? উত্তর দিলেন, "কিন্তু মশায়, এসব তো আমার ঈশ্বর দর্শনে সাহায্য করবে না! তবে এতে আমার কি লাভ? আগে ভগবৎ-দর্শনরূপ আসল কাজটি হয়ে যাক্, তারপর এর কথা ভাবা যাবে।

প্রিয় ভক্তের এই নিস্পৃহতায় ঠাকুরের চোখে-মুখে সেদিন ফুটিয়া উঠে অপার প্রসন্নতার দীপ্তি।

ভক্তজন পরিবৃত রামকৃষ্ণ একদিন স্বীয় কক্ষে বসিয়া ধর্ম্মকথা কহিতেছেন! 'সর্ব্বজীবে দয়া' কথাটি বলিতে বলিতেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তারপর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আবেশজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই—জীবে দয়া কি করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে সেবা!"

নরেন সকলের সঙ্গে বসিয়া ঠাকুরের অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে

ছিলেন। এক মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তর্লোক হইতে একটা পর্দ্দা যেন উঠিয়া গেল। ঠাকুরের প্রজ্ঞানঘন বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিল সেবা-ধর্ম্মের মহিমা।

বিবেকানন্দ উত্তরকালে মুমুক্ষু গুরুভ্রাতাদের কহিয়াছিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই সেদিন ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই তিনি প্রদর্শন করিলেন। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঠাকুর আজ যাহা ভাবাবেশে বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেরও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়,

ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্ব্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকার্য্য হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা আশু লক্ষ্যে পৌঁছাইবে, একথা আর বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো আজ যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্ব্বত্র প্রচার করিব,—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"[১]

ঠাকুরের কথাগুলি নরেনের জীবনে সেদিন উপস্থিত হয় নূতন দিগ্‌দর্শনরূপে। উত্তরকালে এই দিগ্‌দর্শন তিনি কাজে লাগাইয়াছিলেন।

ভক্ত শিষ্যদের ঠাকুর প্রধানতঃ ভক্তি-শাস্ত্র পড়িতে বলিতেন। কিন্তু নরেনের জন্য অন্য ব্যবস্থা। জানিতেন, নরেন উত্তরকালে চিহ্নিত হইবেন এক বিশ্বখ্যাত আচার্য্যরূপে, বিশ্বজনীন অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাতা রূপে। তাই অদ্বৈতভাবের উদ্দীপক শাস্ত্রাদি যখন নরেন পড়িতে বসিতেন, ঠাকুর বরং আনন্দিতই হইতেন। নরেনকে এ সময়ে প্রায়ই উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে দেখা যাইত।

সহজাত জ্ঞান-বৈরাগ্যের অধিকারী ছিলেন নরেন, কিন্তু তাঁহার সত্তার গভীরে লুকানো ছিল প্রেমভক্তির এক বিপুল উৎস। ঠাকুর তাই বলিতেন, "এ রকম চোখ কি শুষ্কজ্ঞানীর কখনো থাকে রে?

১ স্বামী সারদানন্দ: লীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড

জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির ভাবও যে তোর ভেতরে বয়ে যাচ্ছে।" বাহিরে জ্ঞানমার্গী হইলে কি হয়, ঠাকুর যখন কীর্ত্তনানন্দে মাতিতেন, দেখা যাইত—নরেনও সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ভাবাবেগে নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ জানিতেন, নরেন নিত্যসিদ্ধ, মুক্তপুরুষ, সর্ব্ব মায়ামোহের উর্দ্ধে সে অবস্থিত। তাই কেবলি তাঁহার ভয় হইত--মায়ার প্রভাব নরেনের উপর কিছুটা না থাকিলে ঐশী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম তো সে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। নিজের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে দেহটি ছাড়িয়া দিবে, চলিয়া যাইবে স্বস্থানে। সজল নয়নে ঠাকুর তাই জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা জানান, "মাগো, ওর ভেতর তুই একটুখানি মায়া প্রবেশ করিয়ে দে, নতুবা কোন কাজই তো করতে পারবে না।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নরেন ও অন্যান্য ভক্তদের জীবনে আসে চরম দুর্দ্দৈব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের আক্রমণ ঘটে। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কিছুদিন কলিকাতায় রাখা হয়, তারপর নিয়া যাওয়া হয় কাশীপুরের বাগানে।

ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষা ও সান্নিধ্যকে কেন্দ্র করিয়াই এই সময়ে ভক্তমণ্ডলীর পরম প্রস্তুতিটি গড়িয়া উঠিতে থাকে। তরুণ সাধকদল নরেনের নেতৃত্বে ঠাকুরের সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আর গুরুর অধ্যাত্ম-শক্তি ধীরে ধীরে তাঁহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। বীজাকারে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সূচনা এইখানে।

যুবক ভক্তেরা পালাক্রমে ঠাকুরের সেবা করেন আর অবসর পাইলেই জপ, ধ্যান ও কীর্ত্তনে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। নরেন এই সময়ে ঈশ্বর লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল। পরমহংসদেবের অনুমতি নিয়া এ সময়ে পঞ্চবটীতলে প্রায়ই তিনি সাধন করিতেন।

বিল্ববৃক্ষতলে রাতের পর রাত ধুনি জ্বালানো থাকিত। আর নরেন উহার সম্মুখে নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিতেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। এ সময়ে ধ্যান করিতে করিতে তিনি প্রায়ই দর্শন করিতেন একটা ত্রিকোণাকৃতি জ্যোতি। ঠাকুরকে এই দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সংক্ষেপে উত্তর দেন, "ওরে, ওটা ব্রহ্মযোনী।"

এক একদিন নরেনের ধুনির ধারে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অপূর্ব্ব দর্শন সব ঘটিতে থাকে। চিন্ময়লোকের দেবদেবীরা অনেকে সেখানে আবির্ভূত হন। এই সময়কার সাধনকালে সাধক নরেনের প্রাণে বিরাজিত ছিল অপূর্ব্ব শান্তি ও স্থৈর্য্য। শক্তির প্রকাশও মাঝে মাঝে দেখা যাইত।

একদিন কালী তপস্বী (স্বামী অভেদানন্দ) ও তিনি পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। হঠাৎ নরেনের ইচ্ছা হইল, কালীকে তিনি স্পর্শ করিবেন। এ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড। স্পর্শ করা মাত্রই গুরুভ্রাতার দেহে বৈদ্যুতিক তেজের মত এক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া গেল, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া দিব্য চেতনায় তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

সদা সজাগ দৃষ্টি রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথকে ডাকাইলেন। তাঁহাকে সতর্ক করার জন্য সহাস্যে কহিলেন,—"কি কচ্ছিস্ রে! এ যে দেখ্ছি, না জমাতেই খরচ ?"

কাশীপুরে ও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে নরেনের সাধন চলিয়াছে। ধীরে ধীরে তিনি ধ্যানলোকের গভীর স্তরে ডুবিয়া যাইতেছেন। এক এক দিন বিচিত্র অনুভূতি ও অপ্রাকৃত দর্শনাদিও হইতেছে। ধ্যানাবস্থার পর একদিন দেখিলেন, তাঁহারই এক অবিকল প্রতিমূর্ত্তি চিন্ময় দেহে সম্মুখে আবির্ভূত। এই অপ্রাকৃত মূর্ত্তি প্রায়ই বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিত। তাঁহারই হাবভাব ও কথা-বার্ত্তা অনুকরণ করিয়া যাইত। রামকৃষ্ণ ইহা শুনিলেন। নরেনকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "এতো ধ্যানের উচ্চাবস্থার লক্ষণ রে!"

এই সময়ে একদিন নরেনের মন গৌতম বুদ্ধের তপস্যাক্ষেত্র, বুদ্ধগয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। স্থির করেন, সেখানে গিয়া কয়েকদিন সাধনা করিবেন। গুরুভাই তারক ও কালী সহ তিনি হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিলেন, কাহাকেও কিছু বলিয়াও গেলেন না। ব্যস্ত হইয়া সকলে ঠাকুরকে এ সংবাদ জানাইলেন। স্মিতহাস্যে তিনি উত্তর দিলেন, "তোরা ভাবিস নি, নরেন কোথাও যাবে না, তাকে এখানে আসতেই হবে।—এদিক ওদিক এখন যাচ্ছে বটে, কিন্তু এখানে যে রস পেয়েছে সে রস ছেড়ে যাবে কোথায় ?"

বুদ্ধগয়ার পবিত্র পরিবেশে ধ্যান করার সময় নরেন এক দিব্য অনুভূতি লাভ করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মন সেখানে টিঁকে নাই। অল্প কিছুদিন পরেই পরমহংসদেবের জন্য ব্যাকুল হইয়া নবীন সাধকেরা দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

ঠাকুরের ভক্ত বুড়োগোপাল নানা তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অভিলাষ, এই উপলক্ষে সাধুদিগকে ভোজন করান ও কিছু দান করেন। রামকৃষ্ণের কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় আর সাধু খুঁজে খুঁজে বেড়াবি, বল্‌তো ? এই সব ছেলেদের খাইয়ে দে। তাতেই তোর কাজ হবে।"

নির্দ্দেশ মত ব্যবস্থাদি করা হইল। প্রত্যেক তরুণ ভক্তকে এই উপলক্ষে ঠাকুর নিজ হাতে একটি করিয়া গৈরিক বস্ত্র, বহির্ব্বাস, মালা ও কমণ্ডলু দান করিলেন। আনুষ্ঠানিক কৃত্যে ঠাকুর সেদিন যান নাই, কিন্তু এই গৈরিক দানের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সূচনা করিলেন তাঁহার গৈরিকধারী সাধক-বাহিনীর।

সমাধির গভীরে ডুব দিবার জন্য নরেন এবার ব্যাকুল হইয়া

উঠিয়াছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধির জন্য বার বার ঠাকুরকে এসময়ে তিনি ধরিয়া বসেন, উত্ত্যক্ত করিতে থাকেন।

পরমহংসদেব একদিন আশ্বাস দিলেন, "ওরে আমি ভাল হয়ে উঠলে, তুই যা চাইবি তাই দেব।"

নরেন্দ্রনাথ তখন পরম প্রাপ্তির আগ্রহে অধীর চঞ্চল। অবুঝ বালকের মত বলিয়া বসেন, "কিন্তু, আপনি যদি আর ভাল না হন, তবে আমার দশা কি হবে?"

অস্ফুটস্বরে ঠাকুর মন্তব্য করেন, "শালা বলে কি?"

দেহী বা বিদেহী যে কোন অবস্থায়ই থাকুন, ঠাকুর তাঁহার আশ্বাসবাণীকে রূপায়িত করিবেন, এই সহজ প্রত্যয় থাকাই তো নরেনের পক্ষে স্বাভাবিক! নরেনের কথায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। ঠাকুর বুঝিলেন, শিষ্যের ব্যগ্রতা সীমা ছাড়াইয়া যাইতে বসিয়াছে। ধীর প্রশান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ঠিক করে বল দেখি তুই কি চাস্?"

নরেন্দ্রনাথ এবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।"

রামকৃষ্ণ এইবার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসেন। তিরস্কারের সুরে নরেনকে বলেন, "ছি! ছি! তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলুম, বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস্! এতো তুচ্ছ কথা, অতি হীন কথা রে! না না অত ছোট নজর করিস্‌নি। আমি বাপু সব ভালবাসি—মাছ খাবো তো ভাজাও খাবো, সিদ্ধও খাবো, ঝোল অম্বলও খাবো। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নির্গুণভাবে উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্ত্তির ভেতর ঐহিক সম্বন্ধের বোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে

ভাল লাগে না—তুইও তাই কর। একাধারে জ্ঞানী আর ভক্ত তুই-ই হ।"

কিন্তু এই তিরস্কারের কয়েক দিন পরে পুরস্কারের ব্যবস্থাও ঠাকুর করিয়াছিলেন। নরেন এক রাত্রিতে কাশীপুরের নিভৃত কক্ষে বসিয়া ধ্যানমগ্ন। সঙ্গে অপর এক বয়স্ক ভক্তও সাধন নিরত—ইঁহাকে নরেন গোপালদা বলিয়া ডাকেন। নিবিড় ধ্যানে আবিষ্ট নরেন হঠাৎ এক সময় চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, "গোপালদা, ও গোপালদা! আমার শরীর কোথায় গেল ?"

গোপালদা বার বার তাঁহার অঙ্গে করাঘাত করিতেছেন, কিন্তু দেহে চেতনার কোন লক্ষণই নাই। ক্রমে অন্য গুরুভ্রাতারাও সেখানে উপস্থিত হইলেন।

এই সংবাদটি শুনার পর পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইল, "বেশ হয়েছে, থাক্ খানিকক্ষণ ঐরকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।"

গভীর রাত্রে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে, নরেন ধীরপদে ঠাকুরের শয্যাপাশে গিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর বলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে—যখন আমার এই কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আবার চাবি খুলবো।"

নরেন নির্নিমেষে দিব্যলোকের এই ঐন্দ্রজালিকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর অসীম শ্রদ্ধায় শক্তিধর গুরুর চরণে নিবেদন করিলেন তাঁহার প্রণতি ও আত্মসমর্পণ।

উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "সেদিন দেহাদি বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয়েছিল। প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি! একটু 'অহং' ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর ব্রহ্মের ভেদ চলে যায়—সব এক

হয়ে যায়। যেন মহাসমুদ্রে জল, জল ছাড়া আর কিছুই নেই। ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।”

সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর সেদিন নরেনের মনে হইতেছিল— যেন মস্তক ব্যতীত তাঁহার দেহের আর সমস্ত কিছুরই অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তারপরই অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে উপবিষ্ট গোপালদাকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন।

আর একদিনের কথা। গিরিশ ঘোষের সহিত নরেন এক বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিয়াছেন। মশার দংশনে গিরিশচন্দ্র তো অতিষ্ঠ। খানিক বাদেই তিনি আসন ত্যাগ করিলেন। ততক্ষণে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া গিয়াছেন। শরীরে এত মশা বসিয়াছে যে মনে হয়, দেহখানি কালো কম্বলে আবৃত। গিরিশ উচ্চ স্বরে নরেনকে ডাকিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার দেহে চেতনার কোনই লক্ষণ নাই। অবশেষে আসন ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া ফেলা হইল। দেখা গেল, দেহ একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন—মৃতবৎ কঠিন। বহুক্ষণ পরে সেদিন নরেনের জ্ঞান সঞ্চার হয়।

সাধন ভজন ও ধ্যানের মধ্য দিয়া নরেন গুরুকৃপার বহুতর নিদর্শন পাইতেছেন। দিব্য আনন্দে হইতেছেন ভরপুর। এই সঙ্গে মনে জাগিতেছে প্রবল আশঙ্কা। পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ যে আর বেশীদিন এই নরদেহে থাকিবেন না, এই দুশ্চিন্তা এবার তাঁহাকে পাইয়া বসে।

একদিন মনে এক দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কালরোগের কবল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্ধার করিতে পারে এমন এক ঐশী শক্তির আবাহন তিনি করিতে চান। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রাত্রি তিনি উন্মাদের মত ‘রাম’ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে

বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তখন তিরোহিতপ্রায়।

উন্মত্ত অধীর নরেনের 'রাম রাম' শব্দ ক্রমশঃ উচ্চতর হইতেছে। গভীর রাতে ঠাকুরের কানে পশিল এই নামের ধ্বনি। তাঁহার আদেশে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় নরেনকে ধরিয়া আনা হইল। স্নেহমধুর কণ্ঠে পরমহংসদেব কহিলেন, "ওরে, কেন তুই এসব করে এত কষ্ট পাচ্ছিস? তোর মত এমন উন্মত্ত যে আমি বারো বছর ছিলাম! এক রাত্তিরে তুই আর কতটা করবি, বাপু?"

ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্য ও প্রশান্ত মুখচ্ছবি নরেনের হৃদয়ে সান্ত্বনার স্নেহ-প্রলেপ বুলাইয়া দেয়, তিনি শান্ত হন।

দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রতি সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ নরেনের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতেন। গুরু-শিষ্যের এই মিলন ছিল বড় রহস্যময়। অপর ভক্তগণ তখন ঠাকুরের নির্দ্দেশে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, আর রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ দুই তিন ঘণ্টা কাল নিমজ্জিত থাকিতেন অধ্যাত্ম-চেতনার গভীরে।

শেষের দিনটি আসন্ন। ঠাকুর সেদিন নরেনকে আহ্বান করিয়া সম্মুখে বসাইয়াছেন। নিষ্পলক দৃষ্টিটি নরেনের দিকে স্থির নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেনের সত্তার গভীরে চলিয়াছে অবিরাম মন্থন। উপলব্ধি করিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর হইতে তড়িৎ কম্পনের মত একটা সূক্ষ্ম তেজ-রশ্মি তাহার দেহের ভিতরে সঞ্চালিত হইতেছে।

নরেন ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। চৈতন্য লাভের পর তিনি দেখেন, নীরবে উপবিষ্ট ঠাকুরের চোখে অশ্রুধারা।

"একি রহস্য, কিছুই যে আমি বুঝতে পারছিনে।" প্রশ্ন করেন নরেন্দ্রনাথ।

ঠাকুর ধীর কণ্ঠে কহেন, "ওরে, আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে

ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে তারপর ফিরে যাবি।”

নরেনের দুই চোখও অশ্রু ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। জীবন-প্রভুর দিকে তাকাইয়া অসহায় বালকের মত তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নরলীলা সংবরণের দুইদিন পূর্ব্বেকার কথা। ঠাকুর সেদিন ব্যগ্রভাবে নরেনকে নিজের কক্ষে আহ্বান করিলেন। কহিলেন, “দ্যাখ্ নরেন, তোর হাতে আমি এদের সবাইকে দিয়ে যাচ্ছি। তুই সবার চাইতে বুদ্ধিমান, শক্তিধর। এদের ভালবাসা দিয়ে বেঁধে রাখবি। যাতে এরা ঘরে ফিরে না গিয়ে সাধনভজন নিয়ে পড়ে থাকে, তার ব্যবস্থা কিন্তু তোকেই কত্তে হবে।”

নরেন্দ্রনাথ নত মস্তকে স্তব্ধ হইয়া ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছেন। বুঝিলেন, ঠাকুরের দেহত্যাগের দিনটি প্রায় সমাগত। যে ঐশী কর্ম্মের আভাস ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁহাকে দিতেন, আজ কি তাহাই করিলেন স্পষ্টতর? অনেক কিছুর দায়িত্বভার কি তাঁহাকে দিয়া গেলেন? নরেনের মনে পড়ে, কিছুদিন আগেকার কথা। ঠাকুরের সামনে বসিয়া ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নরেনের প্রশংসা করিতেছিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ সোৎসাহে বলিয়া উঠেন, “ওগো, কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন— সেই রকম নরেনের জন্যেই তো সব গো। ওর জন্যই এবার আমার আসা।”

ঠাকুর শুইয়া আছেন। দর্শনার্থী ও ভক্তেরা মাঝে মাঝে তাঁহার কক্ষে আসা-যাওয়া করিতেছে। হঠাৎ ঠাকুরের কি খেয়াল হইল, এক টুকরা কাগজ চাহিয়া নিয়া ধীরে ধীরে লিখিলেন—“নরেন লোকশিক্ষা দিবে।”

আধ্যাত্মিক মণ্ডলীর নায়করূপে প্রিয়তম শিষ্যকে তিনি নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়া গেলেন, ভক্তদের মধ্যে এ তথ্যটিই কি তিনি সেদিন

জানাইয়া দিলেন ? কিন্তু নরেনের অন্তরের সম্মতি ইহাতে মিলিতেছে কই ? তিনি বলিয়া উঠেন, “আমি কিন্তু ওসব পারবো না।”

দৃঢ়কণ্ঠে রামকৃষ্ণের আদেশ উচ্চারিত হইল, “তোকে কত্তেই হবে, তোর ঘাড় করবে !”

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন। ভক্তদল চরম মুহূর্ত্তটির কথা চিন্তা করিয়া মুহ্যমান। এই সঙ্কটে নরেন বিষাদখিন্ন হৃদয়ে চুপচাপ বসিয়া আছেন। হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ-ঝলকের মত খেলিয়া গেল একটা বড় প্রশ্ন। ঠাকুর তাঁহার ভগবৎ-সত্তা সম্বন্ধে নানা ধরণের ইঙ্গিত এযাবৎ জানাইয়াছেন। কিন্তু নরলীলা অবসানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপটি কি স্পষ্টরূপে জানাইয়া যাইবেন না ? এই ভক্তদল যাঁহার সহিত নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ, শেষের দিনে সেই দেবমানবের পরিচয় তাঁহারই শ্রীমুখে ধ্বনিত হইয়া উঠুক, ইহাই নরেনের অন্তরের আকুল প্রার্থনা।

সর্ব্বজ্ঞ সদ্‌গুরু সমস্তই বুঝিয়াছেন। রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া তিনি নরেনের দিকে মুখ ফিরাইলেন। অনুচ্চ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, “ওরে এখনও তোর জ্ঞান হলো না ? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয় !”

নরেন তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্। ভাবাবেগে তাঁহার নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া আসিল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখোচ্চারিত এই কথা কয়টিই উত্তরকালের মহান আচার্য্য, স্বামী বিবেকানন্দকে জোগায় দিব্য প্রেরণা, উদ্বুদ্ধ করে তাঁহাকে বিশ্বব্যাপী কর্ম্মসাধনায়।

ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। শিষ্যদের তাপিত হৃদয় তখন শুধু মরু প্রান্তরের মত খাঁ খাঁ করিতেছে। জীবনের পরমাশ্রয় দূরে সরিয়া

গিয়াছে ; আশা, আনন্দ ও উৎসাহের লেশমাত্র কাহারো জীবনে অবশিষ্ট নাই।

নরেন ও তাঁহার এক গুরুভাই সেদিন শোকাকুল হৃদয়ে কাশীপুরের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হৃদয়ে তাঁহাদের প্রচণ্ড শূন্যতা। ভাবিতেছেন, ঠাকুর মরদেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের এ কোন্ নিরালম্ব অবস্থায় রাখিয়া গেলেন? এমন সময় অদূরে ভাসিয়া উঠে এক অভাবনীয় দৃশ্য? নরেন দেখেন, গুরুদেবের দিব্যদেহ অদূরে দণ্ডায়মান। সর্ব্বশরীর তাঁহার অব্যক্ত আনন্দে শিহরিয়া উঠে। তবে কি মহাপ্রয়াণের পরেও ঠাকুর তাঁহার ভক্তদের উপর পূর্ববৎ কৃপাদৃষ্টি রাখিতেছেন! চিন্ময় দেহে আবির্ভূত হইয়া দিতেছেন পরম আশ্বাস!

হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমন করিয়া নরেন মৌন হইয়া আছেন। মনে আশঙ্কাও কম নাই। ওই অলৌকিক দর্শন তাঁহার নিজের দুর্ব্বল মনের ভ্রান্তি নয় তো?

সর্ব্ব সন্দেহের নিরসন করিয়া সঙ্গীয় গুরুভাই এবার চীৎকার করিয়া উঠেন, "নরেন, ঐ ছাখো, ঐ ছাখো!"

জ্যোতির্ম্ময় দেহে ঠাকুরের এই আবির্ভাব! অধ্যাত্ম-সন্তানদের এ আবির্ভাবের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দিলেন—শিষ্যেরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন তাঁহাদের সদ্‌গুরু। আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহারা অপর গুরুভাইদের ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অলৌকিক মূর্ত্তি ততক্ষণে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এবার তরুণ সন্ন্যাসীদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই হইবে কোথায়?

ঠাকুরের পরমভক্ত সুরেন মিত্র এ দুঃসময়ে আগাইয়া আসেন।

কহেন, "একটা বাড়ী ভাড়া করে একত্রে থাকো, ঠাকুরের স্মৃতি বুকে নিয়ে সাধনভজন করো। এর মাসিক ভাড়া আমি চালিয়ে যাবো।" নরেন প্রভৃতি যুবক-ভক্তেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

বরাহনগরে গঙ্গার ধারে যৎসামান্য ভাড়ায় একটি বাড়ী নেওয়া হয়। জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ীটি পুরাতন এবং দীর্ঘদিন মনুষ্য পরিত্যক্ত। ইহাই বরাহনগরের মঠ।

এইবার নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের পালা। ভক্তদের কেহ কেহ তখন পরীক্ষার পড়া তৈরীর জন্য স্বগৃহে বাস করিতেছিলেন। নরেন এক একদিন ঝড়ের মত তাঁহাদের উপর নিপতিত হন, তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, "তোরা এই অমূল্য জীবনটা কি একজামিন দিয়েই কাটাবি, ঠিক করেছিস? এই কি ঠাকুরের উপদেশ পালন করা? এ জন্যই তিনি জগতে এসে এত কষ্ট করে গেলেন? তোরা সন্ন্যাসী, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত—তবু একজামিন পাস করে সংসারের উন্নতি কামনা করিস? ত্যাগ আর ভোগ-বাসনা কি এক সঙ্গে থাকতে পারে? ধিক্ ধিক্ তোদের! শিগগীর ও সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে মঠে চল্।"

নরেনের সাহস, প্রেরণা ও বৈরাগ্যের আহ্বান তরুণদলকে প্রভাবিত করে। একে একে তাঁহারা মঠে যোগ দিতে থাকেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই ভক্তদল নিয়া যে নবগঠিত সঙ্ঘ আত্মপ্রকাশ করিল, নরেন হইলেন তাহার অধিনায়ক।

এই গুরুভ্রাতাগণ অতি সহজেই নরেনের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিল। কারণ, তাঁহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত—নরেন ঠাকুরেরই প্রতিনিধি, তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া চলা, তাঁহাকে আনুগত্য দেওয়া মানেই ঠাকুরের সন্তুষ্টি বিধান করা।

ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল ভক্তদল এবার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন। একান্ত নিষ্ঠায়, দুশ্চর সাধন-পথ অতিক্রম করিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প। এই পথের কোন বাধা কোন দুঃখদহনই তাঁহারা আমল দিতে চায় না।

বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, "বরাহনগরে এমন কত দিন গিয়েছে যে খাবার কিছুই নেই, ভাত জোটে তো নুন জোটে না। দিন কয়েক হয়তো নুন-ভাত চললো, কিন্তু কাহারও গ্রাহ্য নাই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতাসিদ্ধ ও নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলছে। আহা, সেসব কি দিনই গেছে! সে দিনের কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত।"

কৌপীন-সম্বল এই ভক্তদের একযোগে ঘরের বাহিরে যাইবারও উপায় ছিল না। দেওয়ালে একখানা মাত্র কাপড় টাঙানো থাকিত, যে যখন মঠবাড়ীর বাহিরে যাইত, এই কাপড়খানিই থাকিত তাহার কোমরে জড়ানো।

এই চরম দুরবস্থার মধ্যেই কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনার বা দর্শনের কূটতর্কের বিরাম ছিল না। কঠোর সাধনায় রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত। তপস্যার অগ্নিতে প্রদীপ্ত এক এক জনের চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বর্ষিত হইত। মঠে দেখা করিতে গিয়া ঈশ্বরোন্মাদ এই তরুণদল ও তাঁহাদের দলপতিকে দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

এই সময়ে এক একদিন রামকৃষ্ণের স্মৃতিতে উদ্দীপিত হইয়া নরেন কহিতেন, "সত্যের প্রচার কার্য্যে অনেকেই ব্যস্ত হয় কিন্তু তারা না জেনেই তা করে। আমি সেটা জেনে—তারপর করবো।"

ইহার অব্যবহিত পরেই নরেনের জীবনে দেখা যায় এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত। সারা ভারত পর্য্যটন ও তীর্থ পরিক্রমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাইয়া বসে। পরিধানে গৈরিকবাস, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী সেদিন মঠের বাহির হইয়া পড়েন।

কখনো 'নারায়ণ হরি' বলিয়া গৃহস্থদের দ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ান, কখনো বা করেন আকাশবৃত্তি। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বৈচিত্র্যে এই পরিব্রাজন ভরপুর হইয়া উঠে।

সে-বার নরেন্দ্রনাথ বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে দেহ অবসন্ন। পথপার্শ্বে বসিয়া এক দরিদ্র, নীচ জাতীয় ব্যক্তি ধূমপান করিতেছে। নরেন তাহার নিকট কলিকাটি চাহিলে সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "মহারাজ, মঁ্যয় ভাঙ্গী হুঁ।"

উত্তর শুনিয়া সন্ন্যাসীবর নিরস্ত হন, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই ভাবিতে থাকেন, 'নাঃ এতো ঠিক নয়। ঠাকুরের এত আশীর্ব্বাদ, অদ্বৈত-বাদের এত বিচার-বিশ্লেষণ—ইহার পরও দেখ্‌ছি আমার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় নি? জাতিভেদের সংস্কার যে মনের অন্তস্তলে আজও তেমনি উদগ্র হয়ে আছে।' তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরিয়া আসেন। সেই মেথরের হাত হইতে কলিকাটি টানিয়া নিয়া ধূমপান করেন। তারপর তাঁহার হৃদয় শান্ত হয়।

স্বামীজী বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের তীরে কৌপীনটি রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া তিনি স্নানে নামিলেন। জল হইতে উঠিয়া দেখেন, একটি বানর এটি টানিয়া নিয়া দূরে পলাইয়া গেল। বহু চেষ্টার পর ইহা পুনরুদ্ধার করা গেল বটে, কিন্তু তখন কৌপীনটি একেবারে ছিন্নভিন্ন। লজ্জা নিবারণের কোনই উপায় নাই। বড় অভিমান জাগে এবার স্বামীজীর মনে। কুণ্ডেশ্বরী রাধা-রাণীর নিকট সঙ্কল্প জানান, লোকালয়ে আর না আসিয়া বনাঞ্চলেই তিনি বাস করিবেন। দেখা যাক্ তাঁহার জন্য কোন সুব্যবস্থা হয় কিনা।

অরণ্যে প্রবেশ করা মাত্র ঘটে এক অদ্ভুত কাণ্ড। স্বামীজী দেখেন—এক ব্যক্তি তাঁহাকে পিছন দিক হইতে ডাকিতেছে, ছুটিয়া আসিতেছে দ্রুতবেগে। উলঙ্গ স্বামীজীও ধাবিত হইয়াছেন সম্মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পরে কোনক্রমে নিকটস্থ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে

লোকটি নিবেদন করিল, "মহারাজ, এই বনের পাশেই আমার ঘর। কৃপা করে আপনি সেখানে পদার্পণ করুন, আপনাকে নববস্ত্র ও ভোজ্য নিবেদন করে আমরা কৃতার্থ হই।"

বলা বাহুল্য স্বামীজী সানন্দে স্বীকৃত হইলেন, ভোজন ও নববস্ত্র পরিধানের পর বাহির হইলেন লোকালয়ে।

আর একবার গাজীপুরের অপর পারে তিনি এক স্টেশনে বসিয়া আছেন। পথশ্রমে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর, দেহভার আর যেন বহিতে পারিতেছেন না। নিকটস্থ বৃক্ষছায়ায় বসিয়া এক শেঠজী সোৎসাহে প্রচুর পুরী-কচুরী-হালুয়া উদরস্থ করিতেছে। ভোজন শেষে লোকটি বিদ্রূপ শুরু করে, সংসার-ত্যাগী মহারাজ কপর্দ্দকহীন, আর তাহার মত সংসারীরা খাইয়া-দাইয়া কেমন পরম সুখে দিনযাপন করিতেছে।

হঠাৎ কিন্তু এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিল। এক ব্যক্তি ত্রস্তব্যস্তে পুঁটলীতে বাঁধিয়া কিছু মিষ্টদ্রব্য ও এক কুঁজো জল নিয়া স্বামীজীর সম্মুখে উপস্থিত। সশ্রদ্ধভাবে খাদ্যাদি নিবেদন করিয়া সে তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিতে বসিয়া যায়। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে জানায়, নিকটেই তাহার একটি খাবারের দোকান রহিয়াছে—জাতিতে সে হালুইকর। আজই প্রত্যূষে সে দেখে এক বিচিত্র স্বপ্ন। এক সন্ন্যাসীবাবা তাঁহাকে কহিতেছেন—স্টেশনের একপ্রান্তে এক সাধু অনাহারে রহিয়াছেন অবিলম্বে সে যেন তাঁহার সেবা নির্ব্বাহ করে। প্রথমবারের স্বপ্ন-দর্শনকে হালুইকর তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। তারপর শয্যায় শুইয়া আরও দুইবার সে একই রকমের স্বপ্নাদেশ পায়। তাই এমন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

স্বামীজীর দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে। পরমাশ্রয়দাতা ঠাকুরের কৃপার ধারা মরজগতের পরপার হইতেও তাঁহার জন্য এমনিভাবে বহিয়া আসিতেছে!

গাজীপুরে উপনীত হইয়া স্বামীজী পওহারীবাবার সান্নিধ্যে আসেন। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি। তা ছাড়া, পওহারীবাবার গুহায় শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে দেখিয়া তিনি এই সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

স্বামীজী এই সময়ে অজীর্ণ ও কোমরের বাতরোগে ভুগিতে ছিলেন। ভাবিলেন, পওহারীবাবার নিকট হঠযোগ ও রাজযোগের শিক্ষা কিছুটা গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? এই মহাত্মার কাছে দীক্ষা নিবেন বলিয়াও তিনি স্থির করিলেন। পওহারীবাবা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং অনুষ্ঠানের দিনক্ষণও স্থির হইয়া গেল।

দীক্ষার পূর্ব্বদিন রাত্রে কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মজীবনে এ ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বামীজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। অকস্মাৎ লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার কক্ষটি দিব্যলোকের শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আর উহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তি। ঠাকুরের কারুণ্যভরা নয়ন দুইটি স্বামীজীর দিকে নিবদ্ধ, অপরিমেয় স্নেহ মমতা উহা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

গুরুদেবের এই অলৌকিক আবির্ভাব তাঁহার সমগ্র সত্তার মূলে জাগাইয়া তোলে প্রচণ্ড আলোড়ন। আত্মগ্লানির আগুনে হৃদয় জ্বলিতে থাকে। এ তিনি কি করিতে যাইতেছেন? ঠাকুরের প্রতি যে অচলা ভক্তি, যে আত্মসমর্পণ এতকাল ছিল তাহা কি লোপ পাইয়াছে? তিনি কি গুরুদেবের অবিশ্বাসী শিষ্য? উত্তেজনায় তাঁহার শরীর কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে। তারপর স্বামীজী উচ্চ স্বরে স্বগতোক্তি করিয়া উঠেন, "না, না, কখনোই তা হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ এ হৃদয়ে ঠাঁই পাবে না। প্রভু, এ দাস যে চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত। জয় রামকৃষ্ণ!"

ইহার পরেও কয়েকদিন ধরিয়া ঠাকুরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। সবিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, সত্যিই তো, বিদেহী রামকৃষ্ণের সদাজাগ্রত

চক্ষু দুইটি আজিও তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত! স্বামীজী শিহরিয়া উঠেন, ঠাকুরের করুণার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া দুই নয়নে ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু।

ইহার পর নৈনিতালের নিকটে, হিমালয় ক্রোড়ে স্বামীজীর এক দুর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ হয়। সঙ্গী গঙ্গাধর মহারাজকে ডাকিয়া সেদিন তিনি আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "গঙ্গাধর, আজ এই অশ্বত্থবৃক্ষের তলে আমার জীবনের এক অমূল্য ক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল। এর ফলে আমার জীবনের একটা প্রধান সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।"

তখনকার দিনলিপিতে স্বামীজী তাঁহার নিগূঢ় সাধন-অনুভূতির কথা লিখিয়াছিলেন—আমি আজ ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড আর বিরাট মহা-সৃষ্টির একাত্মকতা অনুভব করেছি। বিশ্বের যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যেই রয়েছে। উপলব্ধি করলাম, প্রতি পরমাণুর মধ্যেই বিশ্ব-সংসার রয়েছে বিরাজমান।

হৃষিকেশের বিখ্যাত সাধু ধনরাজ-গিরির আশ্রমে স্বামীজী কিছুদিন ছিলেন। কয়েকজন গুরুভ্রাতাও এই সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। হিমালয়ে বসিয়া কঠোর তপস্যায় কিছুদিন কাটাইবেন বলিয়া স্বামীজী মনে মনে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু কোথা হইতে এক আকস্মিক দুর্দ্দৈব আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি এক দুশ্চিকিৎস্য ধরণের জ্বরে আক্রান্ত হন। একদিন অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যায়, সর্ব্বশরীর হিম হইয়াছে, নাড়ীর গতি স্তব্ধপ্রায়। অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া গুরুভ্রাতারা শোকে মুহ্যমান, কেহ কেহ ইষ্টনামও স্মরণ করিতেছেন।

হঠাৎ তাঁহার কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়ান জটা-জুটমণ্ডিত এক বৃদ্ধ সাধু। তরুণ সন্ন্যাসীদের এই সঙ্কটের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। গৃহমধ্যে ঢুকিয়া মৃতকল্প স্বামীজীকে তিনি কিছুটা মধু ও পিপুল চূর্ণ খাওয়াইয়া দিলেন। অতি সাধারণ একটি ওষুধ

কিন্তু তাঁহার ক্রিয়া যেন অমোঘ মন্ত্রৌষধির মত। রোগী ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ সাধুটি পাহাড়িয়া পথে নামিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

সুস্থ হইয়া উঠিয়া স্বামীজী গুরুভাইদের কাছে ডাকিলেন, কহিলেন, "বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে থাকবার সময় কি দেখেছিলাম জানিস? দেখলাম, আমি যেন জগতে বিধাতার এক বৃহৎ কাজের ভার নিয়ে এসেছি। সে ঐশী কাজ যতদিন শেষ না হবে, আমার যেন বিশ্রাম নেই—শান্তি নেই।"

এখন হইতে গুরুভাইরা স্বামীজীর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনে আসে নূতনতর উৎসাহ, প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা, আর অধ্যাত্মজীবন হইয়া উঠে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা স্পষ্টতই বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যুর দ্বারে গিয়াও নরেন এক অদৃশ্য কল্যাণময় শক্তির ইঙ্গিতে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন সেই অদৃশ্য নিয়ন্তা-শক্তিরই দূত। স্বামীজীর জীবনে ঐ ঘটনাটির মধ্য দিয়া এক নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

ইহার পর হইতে স্বামীজী একাকী সমগ্র ভারত পরিব্রাজন করিতে থাকেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া কয়েক বৎসর তিনি গুরুভ্রাতাদের হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন, নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, "গুরুভাইদের মায়াও মায়া—বরং তা আরও প্রবল। এ মায়ার পাকে পড়লে সাধনার পথে বিঘ্ন ঘটে। আমি আর কোন মায়ার বেড়া-ই রাখতে চাইনে।"

ত্যাগী দণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশে স্বামীজী ভারতবর্ষের দিক্‌দিগন্তে

ঘুরিয়া বেড়ান। এ দেশের অগণিত পল্লী ও জনপদে—ভাঙ্গী, দোসাদ ও দিনমজুরের গৃহ হইতে নৃপতির রাজপ্রাসাদে, ভারত-আত্মার সন্ধানে তাঁহার এই অভিযান! ভারতের মৃত্তিকার বুকে কান পাতিয়া শুনিলেন তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে মুখে রূপায়িত দেখিলেন পরমাত্মার ছায়া। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর মুক্তির সঙ্গীতে আসিল নূতন স্পন্দন, নূতন গতিবেগ।

এই ভারত পরিক্রমা স্বামীজীর অধ্যাত্মজীবনের এক বড় প্রস্তুতি। বেদান্তবাদের নব প্রচারক, সন্ন্যাসী-সৈনিক বিবেকানন্দের যোদ্ধ-জীবনের পাথেয় এই সময়েই সঞ্চিত হইয়া উঠে।

আলোয়ার, খেতড়ি, পোরবন্দর, রামনাদ প্রভৃতি রাজাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তিনি এই সময়ে প্রাপ্ত হন। এই নিস্পৃহ, তেজস্বী সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে এই রাজন্যদের শির সেদিন লুটাইয়া পড়ে।

স্বামীজী সে সময়ে খেতড়ির মহারাজের সম্মানীয় অতিথি। একদিন মহারাজার জয়পুরস্থিত রাজ-উদ্যানে বসিয়া নানা ধর্ম্মকথা হইতেছে। এমন সময় এক সুকণ্ঠী বাঈজীকে আহ্বান করিয়া আনা হইল, রাজ-অতিথির সম্মুখে সে ভজন সঙ্গীত গাহিবে।

স্বামীজী কিন্তু এই রমণীকে দেখিয়াই স্থান ত্যাগের জন্য উঠিয়া দাঁড়ান। তরুণী সঙ্গীত-ব্যবসায়িনীর সম্মুখে বসিয়া গান শুনিতে তাঁহার সংস্কারে বাধিল। খেতড়ির নৃপতি সানুনয়ে বলেন, "স্বামীজী, এ কিন্তু চমৎকার ভজন গায়, এর গান শুনে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। আপনি দয়া করে একটু শুনুন।"

ঐ নারীর কণ্ঠে বৈষ্ণব-সাধক সুরদাসের প্রার্থনা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে—

প্রভু মেরা অওগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তুমহারো।
এক লোহা পূজামে রহত হ্যায়।

এক রহে ব্যাধ ঘর পর
পরশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়
দুঁহু এক কাঞ্চন করো।

সুর-মূর্চ্ছনা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া একই তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত করিতে চাহিতেছে আর বলিতেছে—"অজ্ঞানোসে ভেদ হ্যায়, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো!"

স্বামীজী উচ্চকিত হইয়া উঠেন! মুহূর্ত্তে চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটি পর্দ্দা সরিয়া যায়। সংস্কার হয় বিদূরিত। সত্যিই তো! সমদর্শী তিনি কায়মনোবাক্যে হইতে পারেন নাই। ভেদবুদ্ধি ও সংস্কারের মূল অন্তস্তল হইতে উৎপাটিত আজিও হয় নাই। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতির জন্য, পরম উপলব্ধির জন্য, তপস্যা শুরু করিয়াছেন। কিন্তু সে তপস্যার মূলেই যে আপন ভেদবুদ্ধি দিয়া কুঠারাঘাত হানিয়া বসিয়াছেন। এই বাঈজীর ভজন গানের মধ্য দিয়া তাই কি ঠাকুর তাঁহার জীবনে অভেদজ্ঞানের সাড়া নূতন করিয়া আজ জাগাইয়া তুলিলেন?

তখনি গায়িকা নারীর কাছে অগ্রসর হইয়া কহিলেন. "মা, আমি তোমার নিকট ঘোর অপরাধ করেছি। তোমাকে ঘৃণা করে আমি এস্থান ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার এই গানের মধ্য দিয়ে তুমি আমার চৈতন্যকে জাগ্রত করেছো।"

দেশীয় রাজ-রাজড়া ও অমাত্য যখনই যিনি স্বামীজীর দর্শনে আসিতেন, তিনি তাঁহার সম্মুখে নিজের নবাবিষ্কৃত ভারতকেই তুলিয়া ধরিতেন।

স্বদেশের পরিচয় তাঁহার নিকট দুইরূপে পরিস্ফুট হয়। একটি তাহার শাশ্বতরূপ—প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক সম্পদের গরিমায় ভাস্বর। আর একটি তাহার বর্ত্তমানের রূপ—যাহা দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও নিপীড়িত আত্মার হাহাকারে ভরা।

ভারতের আত্মিক পরিচয়ের মধ্য দিয়াই দেশাত্মবোধ ও আত্ম-

মর্য্যাদাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, ঋষিদের শিক্ষাদীক্ষার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইবে, দেশীয় রাজসভাগুলির নিকট ইহাই ছিল তাঁহার বক্তব্যের নির্য্যাস। আরো কহিতেন, "ধর্ম্ম ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ নয়, ধর্ম্মের অভাবই দায়ী এই দুর্দ্দশার জন্য। ধর্ম্মের শক্তি তখনই বাড়ে যখন তা মানুষের কর্ম্মজীবনে হয় রূপায়িত।"

দেশীয় রাজাদের অনেকে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়াছেন কেহ কেহ গুরুজ্ঞানে পদসেবাও করিয়াছেন। কিন্তু কখনো এই রাজসেবার আকর্ষণ বা মোহে তিনি পড়েন নাই। এই তেজস্বী অপ্রতিগ্রাহী রাজ-সন্ন্যাসীর পদে রাজাদের শির বার বার লুন্ঠিত হইয়াছে, স্বামীজীর অকুতোভয়তা ও বৈরাগ্য তাঁহাদের বিস্মিত করিয়াছে।

একবার মহীশূররাজ স্বামীজীকে একটি উপহার গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। সন্ন্যাসীকে মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই বলিয়া স্বামীজী এড়াইতে চান, কিন্তু মহারাজও ছাড়িবেন না। অগত্যা স্বামীজী সকলকে বিস্মিত করিয়া সামান্য একটি হুঁকা চাহিয়া বসিলেন। সর্ত্ত থাকিল—উহাতে কোন ধাতুর সংস্রব থাকিবে না। মহারাজ অবিলম্বে দেশীয় শিল্পীদের কারুকার্য্যে খচিত একটি সুদৃশ্য হুঁকা তাঁহাকে উপহার দিলেন। মাদ্রাজে পৌঁছিবার পরই কিন্তু এই হুঁকার সদ্‌গতি হইয়া গেল। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে স্বামীজী আশ্রয় নিয়াছেন। লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ এই হুঁকাটির দিকে বার বার লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। স্বামীজী এই হুঁকাটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া দিলেন। মহারাজের উপহারের মূল্য তাঁহার নিকট যেন এক কানাকড়িও নয়।

গুজরাটের পোরবন্দর রাজসভায় স্বামীজী উপস্থিত হইয়াছেন। শঙ্কর পাণ্ডুরাং সেখানকার এক প্রখ্যাত পণ্ডিত। তিনি তখন বেদের অনুবাদ করিতেছিলেন। স্বামীজী নয় মাস কাল সেখানে থাকিয়া

তাঁহার কাজের সহায়তা করেন এবং বেদ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য এই সময়েই পাণ্ডুরাং-এর সাহায্যে তিনি আয়ত্ত করিয়া নেন।

নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতশিরোমণি পাণ্ডুরাং বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী, আমার মতে আপনার মনীষা ও প্রতিভার উপযুক্ত মর্য্যাদা শুধু পাশ্চাত্য দেশেই হতে পারে। আপনি সেখানে আমাদের সনাতন সভ্যতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশেরই কল্যাণ হবে।"

পাশ্চাত্য দেশ পর্য্যটনের চিন্তা বীজাকারে স্বামীজীর অন্তরে এই সময় হইতেই প্রবেশ করে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী—জীবরূপী শিবের সেবা—বার বার তাঁহার মনে পড়ে। ভাবেন, মাতৃভূমি ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষকে অন্ন জোগাইতে হইবে—আধ্যাত্মিক চেতনায় তাহাদিগকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন জনগণের দারিদ্র্য ও তামসিকতা দূর করা।

কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল করিবার উপকরণ কই? মনে তাই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—পাশ্চাত্যদেশে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। ভোগসর্ব্বস্ব, উদ্‌ভ্রান্ত জড়বাদের কেন্দ্রে তিনি ভারতের অধ্যাত্মবাণী প্রচার করিবেন আর ইহার পরিবর্ত্তে আনিবেন সে দেশের সাহায্য, যাহা দ্বারা এ দেশ হইবে সমৃদ্ধতর।

ঐশী নির্দ্দিষ্ট ব্রতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই উদ্যোগপর্ব্ব যেন এই সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি। এই সময়ে গুরুভাই অভেদানন্দজীর সহিত বোম্বাইতে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর অন্তরলোকের প্রস্তুতির কথাটি স্বামী অভেদানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন—"এই সময়ে স্বামীজীর হৃদয়টি যেন অগ্নিকুণ্ডের মত হইয়াছিল। আর কোন চিন্তা নাই। কেবল কি করিয়া ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়—অহর্নিশ তাহাই ভাবিতেন।...স্বামীজীকে তখন দেখিলে মনে হইত

যেন একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত! আমাকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন— ভ্যাখ্ কালী, আমার ভেতর এমন একটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।”

এই সময়ে মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রকাণ্ড এক ভক্তদল জুটিয়া গেল। ইহাদের উৎসাহে ও নিজ অন্তরের প্রেরণায় তিনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন। সিকাগোতে বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সেখানে তাঁহাকে প্রেরণের জন্য সকলেই অত্যন্ত ব্যগ্র।

স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রভৃতির চেষ্টায় জনসাধারণ হইতে চাঁদাও কিছু উঠিল। মাদ্রাজী শিষ্যদের কাছে স্বামীজী নিজের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিলেন,—“এখন হিন্দুধর্ম্মকে জগৎবাসীর কাছে প্রচার করার সময় এসে গিয়েছে। ঋষিদের এই মহান ধর্ম্মকে আর সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না, জগৎময় একে ছড়িয়ে দিতে হবে। সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন দুর্গ জীর্ণ হয়েছে, শুধু বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তাকে কোন রকমে রক্ষা করে জড়ের মত বসে থাকলে চলবে না। এর পুনঃসংস্কার করে জগতের সমক্ষে বার হতে হবে, পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে চারদিকে প্রচার করতে হবে এর মহিমা।”

আমেরিকায় যাওয়ার জন্য চাঁদা তোলা হয়। কিন্তু স্বামীজী পতিত হন মহা সমস্যায়। অন্তরে প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি বিদেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন? দেশের কাজে? ধর্ম্মের কাজে? না নিজের প্রচ্ছন্ন অহংবোধ তাঁহাকে এদিকে ঠেলিয়া নিতেছে?

ভগবানের নিগূঢ় উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা জানিবার উপায় কই? এযাবৎ কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ তো তিনি পান নাই। এক্ষেত্রে বিদেশ গমনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই সমীচীন। ভক্ত ও বন্ধুবান্ধবদের এ সিদ্ধান্ত তখনি জানাইয়া দিলেন। সংগৃহীত চাঁদার অর্থ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু মাদ্রাজের ভক্ত শিষ্যেরা দমিবার পাত্র নন। কিছুদিন পরেই তাঁহাদের উদ্যম ও হৈ-চৈ আবার শুরু হয়। তাঁহাদের উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া স্বামীজীও আবার ভাবিতে বসেন। ঠাকুর সশরীরে নাই, তাঁহার নির্দ্দেশ পাইবার আশা আর কোথায়? কিন্তু শ্রীমা তো রহিয়াছেন। তিনি তো তাঁহারই অংশস্বরূপিণী। মায়ের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়? স্থির করিলেন, তাঁহার নির্দ্দেশ চাহিয়া এখনি পত্র দিবেন। ইতিমধ্যে সেদিন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

স্বামীজী রাত্রে শয়ন করিয়া আছেন, ঘুম আসিতেছে না। এমন সময়ে হঠাৎ এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয় তাঁহার নয়ন সমক্ষে। দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতিঘন দিব্যমূর্ত্তি ভারত সাগরের তীর হইতে দেশান্তর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। সোজাসুজি সমুদ্রের উপর দিয়া ঠাকুর অপর পারে চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকেও আদেশ দিতেছেন তাঁহাকে অনুসরণ করার জন্য। বিস্মিত স্বামীজী শয্যায় উঠিয়া বসিলেন! তবে কি এটাই ঠাকুরের অভিপ্রেত? ঠাকুরের অস্ফুট ধ্বনি তখনও তাঁহার কানে বাজিয়া চলিয়াছে—"আয়, আয়।" তবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ আর কোথায়?

অবিলম্বে স্বামীজী সারদা দেবীকেও একখানা পত্র লিখিলেন। তখন আর মতামত চাওয়া নয়, ঠাকুরের নির্দ্দেশে সঙ্কল্প তিনি স্থিরই করিয়াছেন। এবার মাতা ঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদটি তাঁহার চাই।

লিখিলেন, "মাগো, মহাবীর যেমন রামনাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে চলিলাম।"

নরেন অনেকদিন হয় একলা নানা স্থান ঘুরিতেছেন, সারদামণি বেশ কিছুদিন তাঁহার সংবাদ পান নাই। পত্র পাইয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন তাঁহার দৃষ্টিতে শুধু ঠাকুরের প্রধান শিষ্যই নয়—এই শিষ্যের মাধ্যমে ঠাকুর একটা বড় ঐশীকাজ সম্পন্ন

করিবেন ইহাও সারদা দেবী মনে প্রাণে জানেন। ঠাকুরের মরদেহ ত্যাগ করার পর অলৌকিক অনুভূতির মধ্য দিয়া এ তত্ত্বটি তাঁহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন—ঠাকুরের জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম দেহ ধীরে ধীরে নরেনের দেহে প্রবেশ করিতেছে। ঠাকুর একদিন নরেনের দেহের মাধ্যমেই তাঁহার মহা-লীলার বিস্তার সাধন করিবেন, এ বিশ্বাস এখনো তাঁহার আছে।

আজ সেই নরেন ঠাকুরের কর্ম্মযজ্ঞের ঋত্বিক রূপে পাশ্চাত্যদেশে যাইতে অনুমতি চাহিতেছে। আর এই সম্বন্ধে প্রত্যাদেশও যে ইতিমধ্যে শ্রীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন! তিনিও ধ্যানবেশে দেখিয়াছেন,—সমুদ্র তরঙ্গের উপর দিয়া ঠাকুর অগ্রসরমান, আর নরেন্দ্র তাঁহার অনুগামী। নরেনকে তাঁহার নিজের এই অলৌকিক দর্শনের কথা জানাইয়া তিনিও তখনই পত্র দিলেন। জানাইলেন অন্তরের পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

স্বামীজী তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের আহ্বান করিলেন, সানন্দে কহিলেন, "আমেরিকায় যেতে এবার আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। মার আশীর্ব্বাদ আমি পেয়ে গেছি!"

মাদ্রাজের ভক্তদের উৎসাহ এবং স্বামীজীর শিষ্য খেতড়ি-রাজের অর্থানুকূল্যে স্বামীজীর যাত্রার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইল।[১]

১৮৯৩ সালের ৩১শে মে তারিখ। বোম্বাই হইতে জাহাজে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন। পরিধানে রঙীন রেশমী আংরাখা ও উষ্ণীষ। পরিচয়ের জন্য থাকিল নূতন একটি নাম—স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর শিষ্যেরা আঁটপুরে বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস নেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের নাম হয় বিবিদিষানন্দ। হিমালয়ে ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পরিব্রাজন কালে স্বামীজী মহারাজ নানা সময়ে নানা নাম গ্রহণ করিতেন। এবার বিদেশে

১ বেণীশঙ্কর শর্ম্মা : স্বামী বিবেকানন্দ—জীবনের বিস্মৃত অধ্যায়

যাওয়ার প্রাক্কালে কি নাম নিবেন ভাবিতেছিলেন। প্রিয় শিষ্য খেতড়ি-রাজ বলিলেন, "স্বামীজী আপনি জগতের বিবেক উন্মেষ করার জন্য তৈরী হচ্ছেন—আপনার এবারকার নাম হোক, বিবেকানন্দ।"[১]

সিকাগোতে তখন বিশ্ব-মেলার অবিবেশন বসিয়াছে। এইখানেই বিশ্ব-ধর্ম্মসভা বসিবার কথা। সেখানে পৌঁছিয়া খবরাখবর করার পর তো স্বামীজীর চক্ষুস্থির। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের শেষ তারিখ গত হইয়াছে। তাছাড়া, তখন জুলাই মাস—সেপ্টেম্বরের আগে ধর্ম্মসভার অধিবেশনও বসিবে না। তিনি নিজে বা তাঁহার উৎসাহী ভক্তেরা কেহই আগে হইতে এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আগামী কয়েক মাসের ব্যয় নির্ব্বাহ কি করিয়া হইবে তাহাই এক বড় সমস্যা।

আমেরিকায় পদার্পণ করিবার সময় তাঁহার নিকট মাত্র ১৭৯ পাউণ্ড অবশিষ্ট ছিল। সামান্য পুঁজি, আর দেশটিও ব্যয়বহুল। অর্থ যা কিছু ছিল তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া আসিতেছে। সম্মুখে মার্কিন দেশের নিদারুণ শীত। পর্য্যাপ্ত শীতবস্ত্রও তিনি সঙ্গে আনেন নাই। এই দেশ ভারত নয়, জড়বাদী ডলার পূজারীদের দেশ। এখানে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা মিলে না—স্বামীজী বিষম বিপদে পড়িলেন।

কিন্তু এ অবস্থায় হাল ছাড়িবার পাত্রও তিনি নহেন। খরচ কমানোর জন্য কিছুদিন সিকাগো ছাড়িয়া বোস্টন শহরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়েই আকস্মিকভাবে হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক মিঃ রাইটের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। স্বামীজীর লোকোত্তর প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা দর্শনে অধ্যাপক তো বিমুগ্ধ। সোৎসাহে তখনি তাঁহাকে ধর্ম্মসভায় গ্রহণ করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন।

১ রমঁ্যা রলঁ্যা—লাইফ অব বিবেকানন্দ

হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিত্ব করার কোন নিদর্শনপত্র স্বামীজীর কাছে নাই, একথা রাইট সাহেবকে তিনি জানাইলেন। সুবিজ্ঞ অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "স্বামীজী, আপনার কাছে এই নিদর্শন চাওয়া, আর সূর্য্যকে তার কিরণ দেবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা —একই কথা।"

ধর্ম্মসভার প্রতিনিধি যে সংস্থা নির্ব্বাচন করেন তার সভাপতি ছিলেন মিঃ রাইটের বন্ধু। স্বামীজীর পরিচয়পত্রে তিনি সেই বন্ধুকে লিখিলেন, "ইনি এমনি একজন মনীষী যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সব ক'টি বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করলেও তা এঁর পাণ্ডিত্যের সমতুল হয় না।"

স্বামীজীর অর্থাভাব রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সহৃদয় অধ্যাপক তাঁহাকে সিকাগো স্টেশনের একখানি টিকেট আর মেলা অভ্যর্থনা কমিটির নামে একটি পরিচয়পত্র দিয়া রওনা করিয়া দেন।

কিন্তু স্বামীজীর পরীক্ষার যেন আর শেষ নাই। সিকাগো শহরে পেঁাছিয়া দেখেন, মেলা স্থানের ঠিকানাটি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শীতের রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে, এ অপরিচিত স্থানে আশ্রয় পাইবারও কোন সম্ভাবনা নাই।

ধনী লোকের দরজায় গেলেই পরিচারকেরা তাঁহাকে নিগ্রো ভাবিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেছে। রাত্রির জন্য মাথা গুঁজিবার একটা স্থানও মিলিতেছে না। অনন্যোপায় হইয়া সে রাত্রির মত স্টেশনের এক খালি প্যাকিং বাক্সের ভিতরে আশ্রয় নিতে হয়। পরদিন প্রভাতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দুই এক স্থানে ভিক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে দেশে ভিক্ষা দিবার রীতি নাই। শ্রান্ত ক্লান্ত মলিন বেশধারী এই বিদেশীকে বহু ধনী গৃহস্থই তাড়াইয়া দেয়। এক বর্ষীয়সী মহিলা ঘরের জানালা দিয়া দেখিতে পান নিরাশ্রয় বিদেশী তরুণ অর্থের জন্য ঘোরাঘুরি করিতেছেন, কিন্তু কোথাও কিছু মিলিতেছে না। মনে তাঁহার জাগিয়া উঠিল সহানুভূতি। তখনি নীচে নামিয়া

আসিয়া স্বামীজীকে দোর খুলিয়া দিলেন—দিলেন আহার ও আশ্রয়। এই মহিলার নাম মিসেস হেইল্।

স্বামীজী সুস্থ হইলে এই সহৃদয়া মহিলা তাঁহাকে ধর্ম্মমেলায় পৌঁছাইয়া দিলেন। পরম কারুণিক ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনেকবারের মত এবারও স্বামীজী এই ঘটনায় তাহা উপলব্ধি করিলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। সিকাগোর আর্ট ইনষ্টিটিউটের প্রাসাদোপম ভবনে সাড়ম্বরে বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কার্ডিন্যাল গিবন্‌সকে কেন্দ্র করিয়া সারা পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রতিনিধিরা উপস্থিত। শ্রোতাদের মধ্যে রহিয়াছেন ইউরোপ আমেরিকার বহু মনীষী, অধ্যাপক ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক।

তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট। গৈরিক রঙে রঞ্জিত রেশমী আংরাখা ও উষ্ণীষে ভূষিত এই হিন্দু প্রতিনিধির আকর্ষণ যেন সবাইকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুন্দর সুঠাম দেহ, চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি। আভিজাত্য ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা এই সন্ন্যাসী যেন এক স্বতন্ত্র পুরুষ। দৃপ্তভঙ্গী ও তেজ দেখিয়া মনে হয়, আদর্শবাদ ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ইনি যেন এক দুর্দ্ধর্ষ ক্লান্তিহীন যোদ্ধা—চিহ্নিত অধিনায়ক।

স্বামীজীকে তাঁহার জীবনে এমন গুরুগম্ভীর, এমন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা মঞ্চে কখনও দাঁড়াইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ধর্ম্ম-নেতাগণ ইহাতে ভাষণ দিতেছেন। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদ তাঁহারা অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার সহিত বিশ্লেষণ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দকেও তাঁহার ধর্ম্মের তত্ত্ব, পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ধর্ম্মের তত্ত্ব জানাইতে হইবে—এবং এখনই তাহা জানাইতে হইবে। অন্যান্য প্রতিনিধিদের মত পূর্ব্ব

হইতে কোন কিছু লিখিয়া বা তৈরী হইয়াও তিনি আসেন নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিবেশনের সভামঞ্চে বসিয়া এই ত্রিশ বৎসর বয়স্ক দুঃসাহসী যুবকের হৃদয় আজ যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

এবার স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের পালা। সভাপতি আহ্বান জানাইলেন তাঁহাকে। স্বামীজী কিন্তু এড়াইয়া গেলেন, কহিলেন, ইহার পরে তিনি বক্তৃতা করিবেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁহার ডাক পড়ে, ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাকে ডাকা হয়। কিন্তু এবারও বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন—এখন নয়। সভাপতি আর তাঁহাকে এড়াইতে দিতে রাজী নন। দৃঢ়স্বরে বলিয়া বসিলেন, ইহাই এই প্রতিনিধির বক্তৃতা প্রদানের শেষ সুযোগ। কি আর করা যায়, স্বামীজীকে এইবার উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়।

ইষ্টনাম গ্রহণ করিয়া সমবেত নরনারীকে তিনি আহ্বান জানাইলেন, "আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতৃবৃন্দ!" মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন এক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়। এই আহ্বানের আন্তরিকতা অভিভূত করিয়া ফেলে সভার প্রতিনিধি ও দর্শকদের। যুবক সন্ন্যাসীর অভিনন্দন আর শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি যেন থামিতে চাহে না। শত শত লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া জানায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামীজীর আত্মবিস্মৃতি কাটিয়া গেল। বুঝিলেন, এই অভিনন্দন ও এই স্বীকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায়। জগজ্জননী আদ্যাশক্তির এ এক নিগূঢ় লীলা। এ লীলারই ক্রীড়নক হিসাবে আজ তিনি এখানে দণ্ডায়মান। স্বভাবসিদ্ধ সাহস ও নেতৃত্ব ফিরিয়া পাইতে স্বামীজীর বিলম্ব হইল না। অতঃপর হৃদয়ের অনর্গল উৎস হইতে বহিতে থাকে তাঁহার চাঞ্চল্যকর ভাষণ।

অমোঘ শক্তিমত্তায় মণ্ডিত হইয়া স্বামীজী সেদিন ধর্ম্ম-সভার চিত্ত জয় করিলেন। সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রচারক ও দার্শনিকদের সমক্ষে ইহা যেন এক চাঞ্চল্যকর বিস্ফোরণ! শ্রোতাদের মধ্যে মার্কিন সমাজের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই অধিক। ইহাদেরই স্বীকৃতির

মধ্য দিয়া মার্কিন দেশের সম্মুখে সেদিন ফুটিয়া উঠিল বিবেকানন্দের ভাস্বর মূর্ত্তি। বেদান্তধৃত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সংবাহকরূপে পাশ্চাত্য দেশের প্রাণ-কেন্দ্রে ঘটিল তাঁহার অভ্যুদয়। এক বিরাট সম্ভাবনা সূচিত হইল ইহার মাধ্যমে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের লীলা-জীবনে সেদিনকার এই ঘটনাটি ছিল বড়ই তাৎপর্য্যপূর্ণ। রামকৃষ্ণ ছিলেন সচ্চিদানন্দ সাগরবিহারী এক রাজহংস। ধ্যানময় প্রশান্ত মহাকারণে তাঁহার সত্তা সদা ভাসমান। আর বিবেকানন্দ সেই রাজহংসেরই পক্ষ-বিধুনন। ধর্ম্ম-মহাসভার সেদিনকার এই আলোড়ন—গতি-চঞ্চলতা কি এই পক্ষ বিধুননেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া ?[১]

বিবেকানন্দ তাঁহার আনন্দচঞ্চল শ্রোতাদের নিকট ঘোষণা করিলেন, "পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসীসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমি আজ আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। সর্ব্বধর্ম্মের জননী-স্বরূপা সনাতন ধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে, সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ থেকে আপনারা গ্রহণ করুন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।"

সনাতন ধর্ম্মের সমন্বয়কারী রূপটি উদ্‌ঘাটন করিয়া তিনি আরও বলেন, "যে ধর্ম্ম সমগ্র জগৎকে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সকল মতের সর্ব্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত বলে গৌরব করে থাকি। আমরা কেবল সর্ব্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতায়ই বিশ্বাসী নই, আমরা সকল ধর্ম্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সর্ব্বদেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থীদের জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে আশ্রয় দিয়েছে, আমি সেই জাতির অন্যতম মানুষ বলে মনে মনে গর্ব্বিত। আমি আপনাদের গর্ব্বের সঙ্গে বলবো, যে বৎসর রোমানরা ইহুদীদের পবিত্র দেবালয়গুলো ধ্বংস করে ফেলে, সেই বৎসর হতাবশিষ্ট ইস্‌রাইল বংশীয়দের আমরাই দক্ষিণ ভারতবর্ষে

১ রমঁ্যা রলঁ্যা: লাইফ অব বিবেকানন্দ।

স্থান দিয়েছিলাম। যে ধর্ম্ম জরথুষ্ট্রপন্থী মহান পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়েছে, অদ্যাবধি লালন-পালন করছে, আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত বলে গৌরব বোধ করছি।"

ধর্ম্ম-মহাসভার বিরাট কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বামীজীর উদাত্তকণ্ঠে নির্গত হইল সেই পবিত্র শ্লোক। অগণিত ভারতবাসী শৈশবকাল হইতে যাহা আবৃত্তি করে—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল
নানাপথ জুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্তমসি
পয়সামর্ণব ইব॥

—নদ-নদী সকল যেমন নানা ধারায় নানা পথে সাগর অভিমুখে বহিয়া যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতু, সরল ও কুটিল নানা পথগামী মানব-ধারার, হে প্রভো, তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল।

গীতা-প্রচারিত মহান সত্যের কথাও তিনি শুনাইলেন। পুরুষোত্তম বলিয়া গিয়াছেন,—যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাহার নিকট সেই ভাবেই প্রকাশিত হই। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

ভারতধর্ম্মের মূল সুরটি ব্যাখ্যা করার পর ধর্ম্মসভার সম্মুখে অপূর্ব্ব আশার বাণীও তিনি ধ্বনিত করিলেন—"সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামী ও ধর্ম্মান্ধতার মৃত্যুকাল আসন্ন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভরসা করি, এই মহাসমিতির উদ্বোধনে আজ প্রভাতে যে ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠলো তা ধর্ম্মোন্মত্ততার মৃত্যুবার্ত্তা জগতে ঘোষণা করুক। একই চরম লক্ষ্যে মানব জাতি আজ এগিয়ে চলেছে, এবার তার ভেতরকার পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হোক, তরবারি বা লেখনীর দ্বারা পরপীড়নের দুর্ম্মতির ঘটুক অবসান।"

মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যার ভাষায়- সম্মেলনের অপর বক্তারাও প্রত্যেকেই ভগবানের কথাই বলিয়াছিলেন—কিন্তু সে ভগবান

ছিলেন তাঁহাদের স্ব-সম্প্রদায়ের ভগবান। কিন্তু বিবেকানন্দ—একা বিবেকানন্দ সকলের ভগবানের কথা বলিলেন, সকলের ভগবানকে বিশ্বসত্তায় মিলাইয়া দিলেন। ইহা ছিল রামকৃষ্ণেরই উষ্ণ নিশ্বাস, যাহা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যের মাধ্যমে উদ্‌গত হইল। আর বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলন এই তরুণ সন্ন্যাসীকে জ্ঞাপন করিল তাহার স্বতোৎসারিত অভিনন্দন।

ইহার পর স্বামীজীকে প্রায় দশ বারটি বক্তৃতা এই সম্মেলনে দিতে হয়। মুক্তি, প্রেরণা এবং আদর্শবাদিতার শক্তিতে তাহা অমোঘরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সম্মেলনের সদস্যদের ডিঙাইয়া তাঁহার প্রচারিত শাশ্বত সত্যের মহাবার্ত্তা অবিলম্বে জনচিত্ত আলোড়িত করিয়া তুলে। বিশ্বধর্ম্ম মহাসভার প্রখ্যাত মনীষী ও জনসাধারণ, একযোগে উভয়ের চিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ অবলীলায় অধিকার করিয়া বসেন। এই বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁহারই শিষ্য যিনি ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ধারই ধারিতেন না, নিজনাম দস্তখত করিতে গিয়া লিখিতেন 'রামকেষ্ট।' স্বামীজীর সর্ব্বকর্ম্মের প্রচ্ছন্ন নিয়ামক সেই শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণেরই তিনি যেন এক ক্ষুদ্র জাদুদণ্ড। জাদুদণ্ডধারী ঠাকুর সেদিন বুঝি বা সবার অলক্ষ্যে মিটি মিটি হাসিতে ছিলেন।

মার্কিন সংবাদপত্রগুলি স্বীকার করিয়া নেয়, স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্ম্মমেলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নিউইয়র্ক হেরাল্ড এই সময়ে লিখে, "ইহার বক্তৃতা শুনিবার পর মনে হইবে, ভারতবর্ষের ন্যায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যমণ্ডিত দেশে আমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ।"[১]

মার্কিন দেশের মনীষী, সমাজনেতা ও ধনকুবেরগণ স্বামীজীর প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার এই

১ ডঃ আর, সি, মজুমদার : বিবেকানন্দ ইন্ আমেরিকা।

জনপ্রিয়তাকে ধর্ম্মসম্মেলনের সভাপতিও তাঁহার কাজে লাগাইতে ছাড়িতেন না। নীরস তত্ত্বালোচনার আসরে যখন শ্রোতাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে থাকিত তিনি তখন ঘোষণা করিতেন, অধিবেশনের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভাষণ দিবেন। জনমণ্ডলী অমনি আগ্রহী হইয়া উঠিত, স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার আকর্ষণে ধৈর্য্য ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিত।

স্বামীজীর ভক্ত ও অনুরাগী পাশ্চাত্য দেশীয় চরিতকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন, "সিকাগোর বিরাট ধর্ম্ম-মহাসভায় স্বামীজী যে মহাসত্য প্রচার করেন, যে বিস্ময়কর আশার বাণী শ্রবণ করান, খ্রীষ্টের পর আর কোন প্রাচ্যবাসীর মুখ থেকে পাশ্চাত্য দেশ তেমন কথা শ্রবণ করে নাই। তাঁর ভাবরাশি চিরদিন পাশ্চাত্যের ধর্ম্মোন্নতি ও ধর্ম্ম বিস্তারের সহায়করূপে গণ্য হবে, গৃহীত হবে জগতের ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান অবলম্বনরূপে।"[১]

শুধু মাত্র কয়েকটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা এবং ব্যক্তিত্বের বলে জন-মানসের এমন দিগ্বিজয় পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গিয়াছে।

এই অপ্রত্যাশিত সম্মান ও খ্যাতির প্লাবন স্বামীজীর অন্তরে সেদিন কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলির স্তম্ভে স্তম্ভে তখন তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসীর বিজয়গাথা। এই জয়গৌরব কিন্তু স্বামীজীর হৃদয়কে ভিতরে ভিতরে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। ভাবিতে থাকেন, খ্যাতির একি বিড়ম্বনা আজ শুরু হইয়াছে তাঁহার জীবনে? ত্যাগী এবং একান্তচারী সন্ন্যাসী জীবনে মুক্ত বিহঙ্গের মত তিনি ছিলেন স্বাধীন, স্বতন্ত্র। সে জীবন কি আর ফিরিয়া পাইবেন না? তপস্যাময় জীবন, ঈশ্বরধৃত জীবন—তাহারও ঘটিতেছে অবসান। আশঙ্কা আসে অন্তরে। আমেরিকায় আসিয়া এ যাবৎ পদে পদে দারিদ্র্য ও প্রত্যাখ্যানের সহিত তাঁহাকে যুঝিতে হইয়াছে—এইবার বুঝি ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য তাঁহাকে গ্রাস করিতে চায়।

১ ইস্টার্ন এণ্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপল্‌স: স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজী রাতারাতি সমগ্র মার্কিন দেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কোটিপতি গুণগ্রাহিগণ তাঁহার যে কোন আজ্ঞা নিমেষে পালন করিতে সমুৎসুক। এক রাত্রে এক ধনীর প্রাসাদে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। চারিদিকে বিলাসের প্রাচুর্য্য। রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যদ্রব্যের অবধি নাই। ভোজন ও আপ্যায়ন শেষে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না। এই বিলাস বৈভবের পরিবেশে তাঁহার দুঃখিনী জন্মভূমির স্মৃতি বৃশ্চিকের মত দংশন করিয়া উঠিল। নিরন্ন শিক্ষা-দীক্ষাহীন কোটি কোটি দেশবাসীর দুঃখে তিনি মুহ্যমান হইলেন। সমস্ত রাত্রি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন, নিদ্রা আসিল না।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতা তখন সম্মোহনের কাজ করিতেছে। এই সময়ে এক গুণগ্রাহিনী ধনাঢ্য তরুণী স্বামীজীকে নিবেদন করিতে চায় তাঁহার বিত্ত-বিষয় ও রূপযৌবন। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দেন, "আমার কাছে এমনতর প্রস্তাব করতে নেই। আমি যে সন্ন্যাসী! নিখিল বিশ্বের সমস্ত নারীই যে আমার—মা।"

আমেরিকার বক্তৃতা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া স্বামীজী যেন ঝটিকাবেগে বিভিন্ন অঞ্চলে নিপতিত হইতে থাকেন। বেদান্ত ও মানবধর্ম্মের শাশ্বতরূপ ফুটিয়া উঠে তাঁহার শক্তিদৃপ্ত ভাষণে। সংবাদ-পত্রে তাঁহাকে অভিহিত করা হয় 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে।

গৌতম বুদ্ধের আড়াই হাজার বৎসর পরে ভারত বহির্দেশে এই তাহার প্রথম প্রচারক ও বাণীবাহককে প্রেরণ করিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত মার্কিনদেশে তাঁহার সেই বাণী এবার কান পাতিয়া শুনিল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাহার সত্যাবিষ্কারের অপূর্ব্ব উপহার লইয়া আজ পশ্চিমের দ্বারে উপস্থিত!

আর সেই বিবেকানন্দ হইতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান—শ্রীরামকৃষ্ণেরই অধ্যাত্মসত্তার তিনি প্রাণময় প্রকাশ। এই শক্তিধর দূতকে সহসা ফিরাইয়া দিবার উপায় কই?

প্রতীচ্য সভ্যতার মর্ম্মকেন্দ্র, আমেরিকা তাই বিবেকানন্দকে গ্রহণ করিল। শুধু তাঁহার বাগ্মিতার মধ্য দিয়া নয়—ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগধৃত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিল।

ইহার জন্য কিছুটা প্রাথমিক প্রস্তুতিও মার্কিন দেশের ছিল, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। বিবেকানন্দ উনবিংশ শতকের শেষ দশকে আমেরিকায় উপস্থিত হন। মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন যে মানসিকতা বর্ত্তমান, তাহা তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের পক্ষে কিছুটা অনুকূলই ছিল। মনীষী এমার্সন এবং থোরো ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের রচনায় ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সমর্থন জানাইয়া গিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স-এর সমর্থকেরা ও কবি হুইটম্যানের আধ্যাত্মিকতাও যেন এজন্য কিছুটা ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কবি হুইটম্যানের কবিতায় বুঝি ভারতদূত বিবেকানন্দেরই আসন্ন পদধ্বনির ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছিল ঃ

হে মোর নগরী……
ঐ ছ্যাখো, আমাদেরই দ্বারে
আস্‌ছে ঐ আদি-মাতা।
ভাষার প্রথম কাকলী
শোনা গিয়েছিলো তাঁর নীড়ে,
আর, সমস্ত কাব্যের ছিল সে উৎস-মুখ
সুপ্রাচীন তাঁর বংশধারা……
ঐ শোন, আসছে সে,
—ব্রহ্মের সন্ততি!”

আবার অপর দিকে দেখি, মার্কিন সমাজে সাধারণ মানুষ ভোগ-সর্ব্বস্ব জীবনের পিছনে ছুটিয়া হইতেছে দিশাহারা, মানসিক ভারসাম্য সে হারাইয়া বসিয়াছে। এই উদ্‌ভ্রান্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষদের সামনে স্বামীজী তুলিয়া ধরিলেন আত্মিক জীবনের আদর্শ, প্রচার করিলেন ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম-শক্তির স্পন্দনে তাহা প্রাণবন্ত, বিবেকানন্দের নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির প্রত্যয়ে তাহা প্রোজ্জ্বল—মন্ত্রচৈতন্যময় !

স্বামীজী তখন প্রচারের উৎসাহে মত্ত। প্রতি সপ্তাহে বার চৌদ্দটি করিয়া বক্তৃতা তাঁহাকে দিতে হয়। এক এক দিন শরীর ও মন ক্লান্তিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। নূতন বক্তব্যও অনেক সময় যেন খুঁজিয়া পান না। ভয় হয়, তবে কি তাহার জ্ঞানের পুঁজি নিঃশেষিত ? আবার এই সংশয় ও নৈরাশ্যের মুহূর্ত্তে হঠাৎ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অলৌকিক অনুভূতি, প্রত্যয় ও প্রাণের আবেগে উচ্ছল হইয়া উঠেন। এক এক দিন রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পান পরবর্ত্তী দিনের ভাষণটি কে যেন তাঁহার কানের কাছে পরিষ্কাররূপে বলিয়া যাইতেছে। পরের দিনের বক্তৃতায় এই অলৌকিক ভাষণের স্মৃতিই তাঁহাকে সাহায্য করিত।

বিবেকানন্দের চতুর্দ্দিকে এবার আরো ভীড় জমিয়া উঠে। এ ভীড় মুমুক্ষু, অধ্যাত্মপন্থী, সংশয়বাদী, আর অজস্র হুজুগ-প্রিয় নরনারীর। সত্যানুরাগী তেজদৃপ্ত সন্ন্যাসীর নিকট রবাহুত জন-সংঘট্ট ভাল লাগে না। জনসভায় দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করেন, 'খৃষ্টান বলে তোমরা পরিচয় দাও, কিন্তু খৃষ্টের আত্মার কি সম্মান তোমরা দিয়েছো ? যীশু আবার যদি আসেন তাঁর শয়নের জন্য একখণ্ড প্রস্তরও কি আজ তাঁর জুটবে ?

তীব্র কষাঘাতে পাদ্রীদল ক্ষেপিয়া যায়। শ্রোতাদের কাহারো কাহারো চৈতন্য সত্য সত্যই জাগিয়া উঠে, স্বামীজীর কাছে তাহারা করে আত্মসমর্পণ।

স্বাধীনচেতা স্বামীজী কিছুদিনের ভিতর বক্তৃতা-প্রতিষ্ঠানদের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া নিলেন। ইহার ফলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্‌পাত করিলেন না। ধনী বন্ধুরা তাঁহার কাজের জন্য এই সময়ে অজস্র অর্থ দিতে চান, কিন্তু সর্ত্ত—তাঁহাদের অনুমোদিত সমাজ ছাড়া স্বামীজী অপর স্থানে মিশিতে পারিবেন না। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, "শিব! শিব! কখনো দেখেছো কি, পৃথিবীর কোনও বিরাট কাজ ধনীরা করতে সক্ষম হয়েছে? হৃদয় আর মস্তিষ্কই সৃষ্টি করে—টাকার থলির সে ক্ষমতা নেই।"

গঠনমূলক কাজ এখন হইতে শুরু হয়। স্থির করেন, সত্যিকার মুক্তিকামী নরনারী যাঁহারা, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিবেন তত্ত্ব উপদেশ। কয়েকজন দরিদ্র ভক্তের আর্থিক সহায়তা নিয়া কাজ আরম্ভ হয়।[১] নিউইয়র্কের এক সাধারণ অঞ্চলে গুটিকয়েক ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। আসবাবপত্র-হীন কক্ষে পাশ্চাত্য ভক্তগণ পা মুড়িয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকেন। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বহু লোক সিঁড়িতে বসিয়াও শোনেন তাঁহার ভাষণ ও ব্যাখ্যা। কিছুদিন পরে, বেদান্ত শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশস্ততর ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

এই সময়ে ধীরে ধীরে স্বামীজীর চারিদিকে আসিয়া জুটেন একদল বিশ্বস্ত ভক্ত ও কর্ম্মী। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ম্যাডাম মেরী লুইস (স্বামী অভয়ানন্দ), ডাঃ স্যাণ্ডস্‌বার্গ (স্বামী কৃপানন্দ), মিসেস ওলি বুল, মিস ওয়াল্ডো, গুডউইন, মিঃ লিগেট, মিস মেরী ফিলিপ, মিসেস আর্থার স্মিথ, মিসেস গুডইয়ার, প্রভৃতি।

ইঁহাদের উপলক্ষ করিয়া স্বামীজী যে ভাষণ দেন তাহা হইতে সঙ্কলিত হয় তাঁহার রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই গ্রন্থ কয়টি প্রকাশের পর পাশ্চাত্য সমাজে আলোড়ন পড়িয়া যায়।

১ মেরী লুই বার্ক: স্বামী বিবেকানন্দ ইন্ আমেরিকা

শিষ্য ও শিষ্যাদের শুধু প্রেরণা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। আধ্যাত্মিক সাধনের পথে ইঁহাদের তিনি সতর্কভাবে পরিচালিত করিতেন। এই সময়ে বিবেকানন্দের জীবনে ঐশী শক্তির নানা প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। সিস্টার ক্রিষ্টিনের স্মৃতিকথায় ইহার কিছু কিছু উল্লেখ রহিয়াছে। স্বামীজীর বিশ্বস্ত শিষ্য ও লিপিকার গুডউইন সম্পর্কিত এক ঘটনাতে ইহার প্রমাণ মিলে। একদিন গুডউইন জড়বাদের সমর্থন করিয়া স্বামীজীর সহিত তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। কিছুতেই বিতণ্ডার অবসান হইতেছে না। হঠাৎ স্বামীজীর মনশ্চক্ষে গুডউইনের অতীত জীবনের চিত্রগুলি একের পর এক ভাসিয়া উঠিতে থাকে। স্বামীজী সেই ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া দৃঢ়স্বরে গুডউইনকে বলেন, "তুমি তো এই ধরণের জীবনই যাপন করে এসেছো ? তোমার বুদ্ধিতে আর কত ধরবে, বল ?",[১]

অতীন্দ্রিয় শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খাইলেন গুডউইন। জড়বাদ সমর্থন করিয়া যে গলাবাজী করিতেছিলেন, তখনি তাহা নীরব হইয়া পড়িল।

নিউইয়র্কে স্বামীজী তাঁহার স্থায়ী সংগঠন 'বেদান্ত সমিতি' স্থাপন করিলেন। বিশ্বস্ত কয়েকটি শিষ্য-শিষ্যার উপর কর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া অতঃপর তিনি প্রচার কার্য্যের জন্য উপনীত হন ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ড সতর্ক ও রক্ষণশীল দেশ। কিন্তু এখানেও স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে। বহু ইংরেজ সাধক স্বামীজীর উপদেশ নিয়া অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হন।

স্বনামখ্যাত রাজনীতিক নেতা ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার এক চিঠিতে সেখানকার সমাজে বিবেকানন্দের কর্ম্মসাফল্যের পরিচয় রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে 'দি ডেড পুলপিট' নামক প্রবন্ধ থেকে 'বিবেকানন্দ-ইজম' সম্বন্ধে যে অংশটি উদ্ধৃত

১ সিস্টার ক্রিষ্টিন : আন্‌পাব্‌লিশ্‌ড রেমিনিসেন্স

করেছি, তা থেকেই আপনি অবগত হয়েছেন যে, বিবেকানন্দের প্রচারিত মতবাদের প্রসারহেতু বহুশত ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টান চার্চের বন্ধন ছিন্ন করেছেন।...এছাড়া, আমি বহু শিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখেছি যাঁরা ভারতকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন এবং ভারতীয় ধর্ম্মমত ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শ্রবণ করবার জন্য সততই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।”

ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর এবং জার্ম্মানীতে দার্শনিক পল ডয়সনের সহিত স্বামীজীর গভীর সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু স্বামীজীর ইউরোপ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ ফল হইতেছে তাঁহার একদল একনিষ্ঠ ভক্তের আত্ম-নিবেদন। মিস মূলার, মিস নোবল (ভগ্নি নিবেদিতা) মিঃ স্টার্ডি ও সেভিয়ার দম্পতি ইঁহাদের অন্যতম। এই শিষ্য-শিষ্যাগণ স্বামীজী ও ভারতবর্ষের জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হন।

আমেরিকার রামকৃষ্ণ মিশন ও শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ তখন দিন দিন বাড়িতেছে। প্রধান ভক্তেরা গুরুর পতাকা একান্ত নিষ্ঠায় বহন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের সম্মুখে যেন নূতনতর জীবনের দৃশ্যপট খুলিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের জন্য, বিদেশ হইতে সাহায্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকায় তাঁহার আগমন। কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁহার তো সফল হয় নাই। দেশে তাই ফিরিতে তিনি এবার ইচ্ছুক। ভারতে বসিয়াই যে ভারতকে আজ বাঁচাইতে হইবে! রোগীর সঞ্জীবনী শক্তি রহিয়াছে তাহার অন্তঃসঞ্চারী প্রাণধারায়, সেই শক্তি দিয়াই তাহাকে উজ্জীবিত করিতে হইবে। বিবেকানন্দ এবার ভারত-ভূমির দিকেই দৃষ্টি ফিরাইলেন। কিন্তু সেই স্বভাব-যোদ্ধার অন্তর্লোকে আজ যেন নূতনতর, নিগূঢ়তর জীবনের আস্বাদ!

১৮৯৬ সালের ৬ই জুলাই তারিখে স্বামীজী তাঁহার ভক্ত মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে এক পত্র লিখেন। তাঁহার জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ

পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।—"প্রেমময় ভগবান লীলাময়; আমি তাঁহার লীলার সঙ্গী। তাঁহার এই জগতের না আছে যুক্তি, না আছে ছন্দ। আর কোন্ যুক্তিই বা তাঁহাকে বাঁধিতে পারে? তিনি লীলাময়, তাঁহার খেলার আগাগোড়াই হাসি-কান্নার খেলা। কি মজা, কি আনন্দ! ··এই পৃথিবীর খেলার মাঠে স্কুলের ছেলেমেয়েদের যেন তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাহাকে প্রশংসা করিবে, কাহাকে তিরস্কার করিবে? তাঁহাদের না আছে মাথা, না আছে বুদ্ধি। তিনি আমাদের মাথায় একটু বুদ্ধি ঢুকাইয়া দিয়া আমাদিগকে লইয়া তামাসা করিতেছেন। এবার কিন্তু আর তামাসা চলিবে না।···দুই একটা জিনিষ আমি এবার শিখিয়াছি। জ্ঞান ও যুক্তি তর্কের উপরে আছে, 'অনুভূতি, 'প্রেম', আর 'প্রেমময়'। সেই প্রেমে রসে পাত্র পূর্ণ করিতে পারিলে আমরা আনন্দে ভরপুর হইব, পাগল হইব।"

বিবেকানন্দ নিজ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" পাশ্চাত্যের শিক্ষিতমহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার পর বীর সন্ন্যাসী ভারতের নিস্তরঙ্গ জীবনে তুলিলেন এক প্রচণ্ড আলোড়ন। সুপ্তিমগ্ন জাতির উপর পড়িল ঝটিকার আঘাত। আত্মবিস্মৃত, পরনির্ভর ভারতবর্ষের সম্মুখে সেদিনকার স্বামী বিবেকানন্দ যেন এক পরম বিস্ময়! এই দেশেরই মধ্যে সেদিন এমন এক বিরাট পুরুষ অভ্যুত্থিত হইয়াছেন, যাঁহার কণ্ঠ-নির্ঘোষ সমগ্র পাশ্চাত্য দেশকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে, যাঁহার চরণ-ধূলি নিবার জন্য আধুনিক সভ্যতা-গর্ব্বী মানুষের দল ভীড় করিয়া দাঁড়াইতেছে। জয়গৌরবদীপ্ত এই সন্ন্যাসীর ললাটে রহিয়াছে ভারতবর্ষেরই আত্মপরিচয়ের তিলকচিহ্ন। ভারতেরই অধ্যাত্মচেতনার মহিমায় তাহা সমুজ্জ্বল। ত্যাগী সন্ন্যাসী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনে জীবন লাভ করিয়া সমগ্র দেশ সেদিন জাগিয়া উঠিল।

ঐন্দ্রজালিক রামকৃষ্ণের জাদুদণ্ড দেশে ও বিদেশে নূতন নূতন দৃশ্যপট উন্মোচন করিয়া চলিয়াছে।

অগণিত দেশবাসী বিবেকানন্দের সম্বর্দ্ধনায় সেদিন উন্মত্ত। স্কুল কলেজের ছাত্র আর দেশীয় রাজ-রাজড়া সবাই হাত মিলাইয়াছে, একযোগে টানিতেছে তাঁহার শোভাযাত্রার গাড়ী। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ধনী-নির্ধন রাজা প্রজা সকলেরই মধ্যে দেখা দিয়াছে স্বতস্ফূর্ত্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস। এই সন্ন্যাসী প্রতিনিধির জয়-গৌরবের পট-ভূমিকায় ভারতবাসী তাহার নিজের রূপ, নিজের পরিচয়, যেন নূতন করিয়া দেখিয়া নিতে চাহিতেছে। জাতীয় উল্লাস ও গর্ব্বে যে বিস্ফোরণ সেদিন ঘটিয়া গেল, তাহার মধ্য দিয়া আমাদের নব-জাগৃতির ইতিহাসে দেখা দিল এক নূতন পদক্ষেপ।

এই রাজোচিত সম্মান ও সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বিবেকানন্দ কহিলেন, "এ সম্বর্দ্ধনা আমার নয়, আমার মধ্য দিয়া দেশবাসী আজ সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছে ভারতের সন্ন্যাস-ধর্ম্মকে, ত্যাগপূত জীবনকে, আর নিজের অধ্যাত্মশক্তিকে।

রুগ্ন-ক্লান্ত দেহে তিনি স্বদেশে ফিরিয়াছেন—দীর্ঘ অবকাশ ও বিশ্রাম এবার তাঁহার প্রয়োজন। কিন্তু যোদ্ধা সন্ন্যাসীর সত্যকার অবসর কোথায়? জীর্ণ অপটু দেহ নিয়াই কর্ম্মস্রোতে তাঁহাকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল। তাঁহার দেশই যে তাঁহার ঐশীব্রত উদ্‌যাপনের প্রধান ক্ষেত্র।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, আমেরিকায় গিয়া ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদ সেখানে বিলাইবেন, পাশ্চাত্যের ভোগ সর্ব্বস্ব জীবনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন আত্মিক জীবনের বার্ত্তা। আর ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক জীবনে দক্ষ, বিত্তবান মার্কিন সমাজ হইতে এদেশের জন্য আনিবেন আর্থিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। নিরন্ন মৃতকল্প জনগণকে বাঁচাইয়া তুলিবেন অন্নবস্ত্র ও প্রাণ-প্রাচুর্য্য দিয়া। সে উদ্দেশ্য তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকাণ্ড জয়-গৌরব নিয়া তিনি দেশে

ফিরিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে অধ্যাত্ম-ভারতের জয়পতাকা তিনি প্রোথিত করিয়া আসিয়াছেন। ফলে জাতির লাভ হইয়াছে—দুইটি বিরাট বস্তু। একটি, নিদ্রিত ভারতের জাগরণ—অপরটি, ধর্ম্ম-মহাসভার বিজয় ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের মধ্য দিয়া আধুনিক ভারতের জনসমাজে বিবেকানন্দের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের জয়মাল্য লাভের ফলে দেশের জনমানসের অধিকার অবলীলায় তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে। জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত হইতে চাহিতেছে। আর এই কেন্দ্রস্থল হইতেই স্বামীজী তাঁহার অধ্যাত্মশক্তির উষ্ণ ধারাস্রোত সমগ্র সমাজ দেহে সঞ্চালিত করিলেন।

দেশকে জাগাইয়া তুলিতে, তাহার প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিতে যে প্রয়াস এতদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি এবার সার্থক হইবে? মহান হিমগিরির তুষার স্তূপ এবার তবে কি গলিয়া ঝরিয়া পড়িবে?

দেশবাসী উৎকর্ণ হইয়া বিবেকানন্দের বাণী শুনিল। এ বাণী ভারতাত্মার বাণী, রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সন্তানের বাণী—পাশ্চাত্যের ধর্ম্মযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ইহা সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রতি ধূলি-কণার প্রতি শ্রদ্ধায় ইহা ভরপুর, আধ্যাত্মিক ভারতের চেতনায় ইহা মহিমময়। আধুনিক ভারত এমন শক্তি-দৃপ্ত এমন উদ্দীপনাময় ভাষণ আর কখনও শুনে নাই।

স্বামীজী আহ্বান জানাইলেন, "হে আমার ভারত! জাগ্রত হও! কোথায় তোমার জীবনী শক্তি? সে শক্তি যে তোমারই আত্মায়।"…প্রত্যেক ব্যক্তির মতই প্রত্যেক জাতির জীবনেও একটি করিয়া মূল সুর বর্ত্তমান থাকে। ইহাই তাহার প্রধান ও কেন্দ্রীয় সুর, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে তাহার মহান জীবনের একতান। ভারতবর্ষের এই মূল সুর রহিয়াছে তাঁহার অধ্যাত্ম-সত্তায়। ইহাকেই ধারণ করিয়া জাতির পুনরুজ্জীবন সাধনের নির্দ্দেশ

তিনি দিলেন। কহিলেন, "তোমার ধর্ম্মের প্রাণশক্তির মধ্য দিয়েই সমাজ সংস্কার আর রাজনীতির কথা প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের পথটি বেছে নিতে হয়, তেমনি প্রত্যেক জাতিও তার নিজের পথ গ্রহণ করে। আমরা ভারতবাসী, আমাদের পথ অনেক আগেই বেছে নিয়েছি। সে পথ হলো—অবিনশ্বর আত্মার প্রতি বিশ্বাস।"

ভাষণ শুনিয়া মনে হয় জাতির চৈতন্য উদ্বোধনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ডুব দিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের আত্মার গভীরে। সেখান হইতে প্রাণরস আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নব জাগ্রত ভারত-বাসীর মানসক্ষেত্রে ভারতধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছেন।

ভারতের এই আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ শুধু তাহার নিজের জাগরণের জন্য, নিজের ঋদ্ধি সিদ্ধির জন্য নয়। সারা পাশ্চাত্য জগৎও রহিয়াছে ইহারই প্রতীক্ষায়। এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বামীজী ডাক দিলেন, "তোমার হাতে যে শক্তি আছে তা ব্যবহার কর। সে শক্তি এত বিরাট যে, যদি তুমি শুধু তাহা মনে-প্রাণে উপলব্ধি কর ও নিজেকে তার যোগ্য করে তোল, তবে তুমি বিশ্বের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারবে। কারণ, ভারতবর্ষ হচ্ছে—বিশ্বজগতের মানস-গঙ্গা।"

এদেশের সমাজজীবনে তখন সংস্কার আন্দোলন প্রবল বেগে চলিতেছে। কিন্তু এ আন্দোলন ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা হইতে উদ্ভুত। স্বামীজী মনেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন, এ সংস্কার আন্দোলন জাতির মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ভারতের ঐতিহাসিক ধারা এবং সনাতন ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সংস্কারকামীরা বুঝিতে পারেন নাই। তাই ইঁহাদের সহিত পার্থক্য জানাইয়া নিজ আদর্শ তিনি ঘোষণা করিলেন—"সমাজকে ভেঙে-চুরে সংস্কারকেরা উন্নয়নের যে পথ দেখালেন তা সাফল্যের পথ নয়। এই সংস্কারকদের আমি বলতে চাই, তাদের চাইতে আমি আরও বড় সংস্কারক। তাঁরা

এক-আধটুকু সংস্কার চান—আর সেস্থলে আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য সংস্কারের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে। তাঁদের প্রণালী ভেঙে-চুরে ফেলা—আমার প্রণালী সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক এবং মূলগত উন্নতিতে বিশ্বাসী।"

এই ধ্বংসমূলক সংস্কার আর যুক্তিহীন রক্ষণশীলতা—এই দুইটি হইতেই বিবেকানন্দ নিজেকে পৃথক করিয়া নিলেন। বেদান্তের তত্ত্বকে সমাজের সর্ব্বস্তরে ছড়াইয়া দিয়া এক অখণ্ড অধ্যাত্মসমাজ তিনি গড়িয়া তুলিতে চান। তামসিক জড়বুদ্ধি ও সামাজিক ভেদ-বৈষম্য এই দেশে এক চরম বিপর্য্যয় আনিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে স্বামীজী ঘোষণা করিলেন বৈদান্তিক অভেদ-তত্ত্ব। সর্ব্বজীবের অভ্যন্তরে অনুস্যূত রহিয়াছেন শিব। এই শিবের পূজায় জানাইলেন আহ্বান —"যিনি তোমার অন্তরে বাহিরে, তুমি যাঁহার স্থূলদেহ ও যিনি 'সর্ব্বত পাণিপাদৌ', শুধু সেই বিরাট আত্মার পূজা কর।" জাতি সংগঠনের জন্য চাই বৈরাগ্যবান তেজস্বী কর্ম্মীদল। এ জন্যও তিনি সেদিন জানান তাঁহার উদাত্ত আহ্বান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-তত্ত্বে শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনেরই সমন্বয় রহিয়াছে। সর্ব্ব মত ও পথকেও ঠাকুর মিলাইয়া নিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যেন তাহার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। বিবেকানন্দ তাঁহার পরম প্রিয় অধ্যাত্ম-সন্তান। অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক নিষ্ঠা যেন একদেশদর্শিতার পরিচয় দিতেছে। ঠাকুরের সমন্বয়ের বাণীর মূলকথা কি তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য ভুলিয়া বসিয়াছেন ?

স্বামীজীর 'বেদান্তের আদর্শ' নামক বক্তৃতায় এ প্রশ্নেরই উত্তর সেদিন পাওয়া গেল : "আমি অভিযোগ শুনেছি যে, আমি অদ্বৈত-বাদের কথা খুব বেশী করে বলি আর দ্বৈতবাদের কথা খুব কম বলি। হ্যাঁ, আমি খুব ভাল করেই জানি, দ্বৈতবাদের মধ্যে কি অপরিমেয় ভাব রসের উন্মাদনা, কি অসীম আনন্দোচ্ছ্বাস রয়েছে। সমস্তই

আমি জানি। কিন্তু এখন আমাদের কাঁদবার সময় নয়—এখন কোমল হবার সময়ও নয়। এই কোমলতা এদেশে যুগ যুগ যাবৎ বর্ত্তমান—আর আমরা যেন তুলার মতই নরম হয়ে গিয়েছি। আজ আমাদের দেশ যা চায়, তা হলো লৌহের পেশী, ইস্পাতের স্নায়ু, বিপুল ইচ্ছাশক্তি, যা অপ্রতিরোধ্য, যা অমোঘ। এতে যদি সমুদ্রের অতল গভীরে নামতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। তাই আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন দৃঢ়তা। এ দেশকে গড়ে তুলবার জন্য, শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, আবশ্যক অদ্বৈতবাদের আদর্শকে উপলব্ধি করা—ঐক্যের আদর্শকে উপলব্ধি করা, আয়ত্ত করা। আমাদের চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস—প্রবল আত্মবিশ্বাস।”

১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বামীজী বলরামবাবুর ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সাধু ভক্তদের এক সভা আহ্বান করিলেন। সকলের অনুমোদনক্রমে স্থাপন করা হইল 'রামকৃষ্ণ মিশন'। বিবেকানন্দ হইলেন ইহার মূল সভাপতি আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি।

মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু গুরুভাইদের অনেকে প্রথমটায় স্বামীজীর আদর্শ ও কর্ম্মসূচী সোৎসাহে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কাহারও কাহারও মনে নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব আসে, প্রশ্ন জাগে—'জীব-সেবা, লোকশিক্ষা, সভা-সমিতি এসব কি শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল? নিজের কথা-বার্ত্তায়, উপদেশে, আচরণে ঠাকুর কি ঈশ্বর উপলব্ধির উপরই সর্ব্বদা জোর দিতেন না? স্বামীজীর পথে চলতে গিয়ে ঠাকুরের পথ থেকে কি তারা দূরে সরে যাচ্ছেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের নূতন ভাষ্য করিতেছেন বিবেকানন্দ। কেউ কেউ এ ভাষ্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন।

স্বামীজী উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, “অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস্?

তা হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পূজা প্রচার করতে বলেন নি। ধ্যান ধারণা আর ধর্ম্মের যে সব উঁচু তত্ত্ব আমাদের শিখিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে। মনে করিসনি, আমি আর একটা নূতন দল স্থাপন করতে বসেছি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা সবাই ধন্য হয়েছি। এবার ত্রিজগতের লোকের কাছে তাঁর ভাব বিতরণ করতে হবে। একাজের জন্যই যে আমাদের জন্ম!"

ইহার পর স্বামীজী দৃঢ় কণ্ঠে যাহা বলিলেন, তাহা আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ, আর ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রেরণায় সমুজ্জ্বল। বলিলেন, "ছাখ্‌, প্রভুর দয়ার বহু নিদর্শন আমি এ জীবনে পেয়েছি। বেশ অনুভব করেছি, তিনি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে আমি গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন বাঁধবার কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না, যখন এক পয়সাও সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুরবো মনে করেছি, তখনও দেখেছি তাঁর দয়ায় যেখানে আমি গিয়েছি, সেখানেই সাহায্য পেয়েছি। আবার যখন বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য সিকাগোর রাস্তায় মেয়ে মদ্দর গাঁদি লেগে যেত তখনও তাঁরই দয়ায় তত মানসম্ভ্রম—যার শতাংশের একাংশ পেলেও সাধারণ লোক একেবারে ক্ষেপে যায়—অনায়াসে হজম করেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গেছি, বিজয় লাভ করেছি। এখন চাই এই দেশের জন্য কিছু করতে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর্‌, দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সকলেরই কল্যাণ হবে।"

আর একদিনের বাদানুবাদেও স্বামীজী গর্জ্জিয়া উঠিয়া ধ্যান ভজন-পরায়ণ, ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল গুরুভাইদের বলেন, "মনে করেছিস্‌ এতেই তোদের মুক্তি আসছে হাতের মুঠোয়? আর শেষের দিনে রামকৃষ্ণঠাকুর এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গোলোকে টেনে নিয়ে যাবেন! আর জ্ঞানের চর্চ্চা, লোকশিক্ষা এবং আর্ত্ত অনাথের

সেবা, এ সব মায়া—কেননা পরমহংসদেব ওসব করেননি। আর কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, 'আগে ভগবান লাভ কর্—তারপর আর সব। পরের উপকার করতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা'—যেন ভগবান লাভ করা মুখের কথা। ভগবান একটা খেল্না কিনা যে, খুঁজলেই মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে!"

বিবেকানন্দ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐশী কর্ম্মের মহানায়ক। ঠাকুরের করুণাঘন রূপটিই তাঁহার অন্তরে চির-ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। তাই তাঁহার শ্রীমুখের বাণী—শিবজ্ঞান জীবের সেবা—স্মরণ রাখিয়াই ব্যাকুল হইয়াছেন সেবাধর্ম্ম অনুসরণের জন্য, কর্ম্মযোগের একটা ভিত্তিভূমির জন্য। করুণাঘন ঠাকুরের জীব-প্রেমের ভিত্তিতে স্বামীজী তাঁহার সেবাধর্ম্মের নব ব্যাখ্যা—কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের নব পরিকল্পনা স্থির করিলেন।

গুরুভ্রাতারা বিশ্বাস করিতেন, ঠাকুর তাঁহার প্রিয়তম সন্তান স্বামীজীর মধ্য দিয়াই তাঁহার লীলা প্রকটিত করিতেছেন। অপার স্নেহ ভালবাসায় ও নেতৃত্ব শক্তিতে স্বামীজীও তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তবুও সন্দেহের যে ছায়াপাত মাঝে মাঝে হয়, আজ তাহা দূরীভূত হইল।

ইহার পর দেখা যায়—দৃশ্যপট একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। যে রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগ ছাড়িয়া বার বৎসরের মধ্যে একদিনও মঠের বাহিরে যান নাই, তিনি মাদ্রাজে প্রচার-কার্য্যে বাহির হইলেন। অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সারদানন্দ এবং অভেদানন্দ ইতিপূর্ব্বে প্রচারের উদ্দেশে ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। লোকহিতে ব্রতী 'মিশনের' প্রকৃত ভিত্তি এইবার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল।

আমেরিকা হইতে স্বামীজী যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন, মঠ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে তাহাদ্বারা পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। অথচ এই মঠ ও সেবা-সংস্থার এই ভিৎটিকে গোড়াতেই তিনি

কিন্তু প্রয়োজনবোধে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন প্লেগের মহামারী শুরু হইয়াছে জনগণ আতঙ্কে অস্থির। মঠের কর্ম্মীদের স্বামীজী সেবাকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন প্রশ্ন তোলেন, প্রচুর অর্থ ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু সে অর্থ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে?

মহাবৈরাগী বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "প্রয়োজন হলে এখনি মঠের সবটা জমি বিক্রি করে দেবো, কাজ চালিয়ে যাবো। আমরা ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করে আর গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা জমি বিক্রয় করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তবেই তো এসব সার্থক। নইলে কিসের এই জায়গা, কিসের জমি?" সারা জীবনের আদর্শকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করার এমন সাহস ও মনোবৃত্তি কয়জনের আছে? ভাগ্যক্রমে সেবাব্রতীদের কর্ম্ম উদ্‌যাপনে এই চরম ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই।

সেদিন বিবেকানন্দ এক ভক্তকে বেদান্ত পড়াইতেছেন। এমন সময় গিরিশ ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। স্বামীজী তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া রহস্যচ্ছলে কহিলেন, "জি-সি, তুমি তো এসব কিছুই পড়লে না, শুধু কেষ্টো বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!"

গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন—"স্বামীজী, ওসবে তোমারই বেশী প্রয়োজন। কারণ, তোমাকে দিয়েই ঠাকুর লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।"

তারপর গিরিশচন্দ্রের কৌশলে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হইল। গিরিশ মুচকি হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আচ্ছা নরেন, তুমি তো বেদবেদান্ত ঢের পড়েছ, কিন্তু তাতে অগণিত দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদ, আর পাপাচারগুলো নিবারিত হয় কি?" সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান নাট্যকার তাঁর অনবদ্য ভাষায় দুঃখ দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাস্তব জগতের এক দুঃসহ, বীভৎস চিত্র আঁকা শুরু

করিলেন। স্বামীজীর হৃদয় ততক্ষণে বেদনায় বিক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। নয়নের উদ্‌গত অশ্রু গোপনের জন্য তিনি দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যান। গিরিশ তখন উপস্থিত ভক্তটিকে যে কথাটি বলিলেন, বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের তাহা এক চমৎকার ভাষ্যস্বরূপ। বলিলেন, "দেখলি তো তোর গুরুর হৃদয়টা! এই যে পরের দুঃখে এমন অশ্রুমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা—এই জন্যই আমি তাঁকে বড় বলে মানি, তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির জন্য নয়! দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা যেই শোনা, অমনি বেদ-বেদান্ত ফেলে উঠে যাওয়া। সমস্ত বিদ্যে-বুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গলে গেল। তোদের স্বামীজী যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক।"

১৮৯৮ সালের জুলাই মাস। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার পর স্বামীজী অমরনাথ দর্শনে রওনা হইলেন। সঙ্গে রহিয়াছেন স্নেহধন্যা শিষ্যা নিবেদিতা। বৃটেন-কন্যা মিস্ মার্গারেট নোবল একদিন স্বামীজীর আত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন এবং স্বামীজীকে গুরুরূপে বরণ করেন। তারপর গুরুর মাতৃভূমি ভারতের সেবায় নিজেকে করেন নিবেদন। নাম হয় তাঁর নিবেদিতা। এ সময়ে স্বামীজীর শিক্ষা ও প্রেরণায় সাধিকা নিবেদিতার আত্ম-নিবেদনের সার্থকতম রূপটি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যারূপে ঘটিতেছে তাঁহার আত্মপ্রকাশ।

নিবেদিতার আগে কোন পাশ্চাত্য রমণী হিন্দুধর্ম্মের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে নাই। এদিক দিয়া তিনি অনন্যা। এই পাশ্চাত্য-শিষ্যার জীবনে যেটুকুও বা ভাবালুতার স্পর্শ বর্ত্তমান ছিল স্বামীজীর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সাধন-নির্দ্দেশ তাহা নিষ্করুণভাবে মুছিয়া দিয়াছিল।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, নিবেদিতা হিন্দু নারীদের শিক্ষায় ব্রতী হোক্, কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী হিন্দু নারীরূপে গড়িয়া উঠুক। এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দ্দেশও দিয়াছিলেন—"তোমার এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে। তোমার জীবনকে

এখন ভিতরে বাইরে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। যদি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায় ঠিক জুটিয়া যাইবেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলিতে হইবে--এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত তুমি রাখিতে পারিবে না।”

নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর চরণে উৎসর্গীত পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। গুরু তাঁহার এই শিষ্যাকে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের সেবায় এক যোগিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

অমরনাথে যাওয়ার কালে দেখা যায় স্বামীজীর এক অদ্ভুত রূপান্তর। অদ্বৈতবাদের পতাকাবাহী সেই যোদ্ধা সন্ন্যাসী আর নাই। এখন তিনি এক তীর্থচারী ভক্ত সাধক, প্রভু অমরনাথের নিষ্ঠাবান উপাসক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি-আপ্লুত সত্তাখানি যেন তাঁহাতে এবার সঞ্চারিত হইয়াছে। গুরুদেবের এই নতুন মূর্ত্তি ও দিব্য কমিনীয়তা দর্শনে সেদিন শিষ্যা নিবেদিতার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

স্নানান্তে অমরনাথের তুযার-লিঙ্গের সম্মুখে স্বামীজী সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। গুহামধ্যে শত শত ভক্তের কণ্ঠে উদ্‌গীত হইতেছে স্তবগান। এই স্তবগানের অনুরণন চলিয়াছে আগ্রহাকুল দর্শনার্থীদের হৃদয়ে। শিব বিগ্রহের দর্শনে ভাগ্যবান সাধকেরা লাভ করিতেছেন দিব্য অনুভূতি।

প্রভু অমরনাথের দিব্য দর্শন পাইলেন স্বামীজী, ধ্যানাবিষ্ট দেহ হারাইয়া ফেলিল বাহ্যজ্ঞান। বহুক্ষণ পরে চেতনা ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, চোখ মুখ স্বর্গীয় আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত।

সঙ্গীরা বার বার প্রশ্ন করেন, অতীন্দ্রিয় লোকের কোন্ দর্শন কোন্ অভিজ্ঞতা স্বামীজীর হইয়াছে। কিন্তু উত্তরে তিনি কোন কিছুই সেখানে প্রকাশ করিলেন না।

উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ মহলে স্বামীজী এই প্রসঙ্গে বলিতেন—স্বয়ং অমরনাথ তাঁহাকে কৃপা করিয়া এই সময়ে দর্শন দেন এবং প্রভু

তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যুর বরও প্রদান করেন। সমাধিমগ্ন মহাযোগী শঙ্কর চিরদিনই বিবেকানন্দের উপাস্য। তাঁহার দিব্য দর্শন সেদিন স্বামীজীর সর্ব্বসত্তায় আনন্দময় অনুভূতির তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। অন্তর্লোকে 'শিব শিব' ধ্বনি নিরন্তর ধারায় স্পন্দিত হইতে থাকে।[১]

অমরনাথ হইতে নামিয়া আসিয়া বিবেকানন্দ আবার এক নূতনতর ভাবময় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। আদ্যাশক্তির ধ্যানে দেহ-মন প্রাণ তখন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, চারিদিকে জগজ্জননী মহামায়ার লীলা প্রকটিত, আর স্বামীজী যেন তাঁহারই অঙ্কের এক ক্ষুদ্র শিশুটি হইয়া রহিয়াছেন। মুখে নিরন্তর রামপ্রসাদী সুরের গুন্‌গুনানি, আর অন্তরে স্বর্গীয় আনন্দের উচ্ছ্বাস।

শিষ্যদের একদিন কহিলেন, "যে দিকে ফিরছি, কেবলই মায়ের বরাভয় মূর্ত্তি দেখছি। তিনি যেন আমায় ছোট ছেলের মত করে, নিজের হাতে ধরে নিয়ে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।"

মাতৃসাধকের অন্তরে তখন ভক্তির প্রবল প্রস্রবণ বহিতেছে। কাশ্মীরের ডাল-হ্রদের উপর হাউসবোটে অবস্থান করিতেছেন। মুসলমান মাঝির কন্যাটিও তাঁহার চোখে যেন আদ্যাশক্তির এক কল্যাণময়ী প্রকাশ। জননী উমা জ্ঞানে যখন এই বালিকা মুসলমান কুমারীটিকে তিনি অর্চ্চনা করিতে বসিতেন, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

ধ্যান-তন্ময়তার মধ্য দিয়া ক্রমে বিবেকানন্দের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ব্রহ্মময়ী মহাকালীর উপলব্ধি। 'জননী মহাকালী' নামক কাব্য-বন্দনাটি এই সময়ে তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হয়। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ইহা রচনা করিবার পরই স্বামীজীর বাহ্য চেতনা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী, বেদান্তকেশরী স্বামীজীর অন্তর এখন মাতৃধ্যানে

---

[১] সিস্টার নিবেদিতা : দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম্।

ভরপুর। আদ্যাশক্তির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির উপাসনা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এই সময়ে প্রায়ই বলিতেন, "ভীমার উপাসনা দ্বারাই যে ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর—লোলরসনা কালীকে ধ্যান কর। মা-ই স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁর আঘাত, অভিশাপও যে আশীর্ব্বাদ! হৃদয়টিকে শ্মশান করে ফেল। তবেই না মার দেখা পাবে!"

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামীজীর অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত এই সংহাররূপিণী তত্ত্বটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ—

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী,
সুখ বনমালী—তোমার ছায়া।
করালিনী কর কণ্ঠচ্ছেদ,
হোক মায়া ভেদ—
সুখ স্বপ্নে দেহ দয়া ॥

স্বামীজী সেদিন কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী দেবী-বিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কি এক দৈবী মায়ায় এই প্রাচীন বিগ্রহের প্রতি তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কয়েকদিন মায়ের মন্দিরে বসিয়া নিবিষ্ট হন পূজা ও ধ্যান-জপে।

একমনে সেদিন মন্দিরে বসিয়া জপ করিতেছেন। এক সময়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল ভগ্ন দেউলের উপর। বিধর্ম্মীর আক্রমণ ও অত্যাচারে স্থানে স্থানে ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। এক অব্যক্ত ব্যথায় সাধকের অন্তর বার বার গুমরিয়া উঠে। মনে খেলিয়া যায় চিন্তার ঝলক, "মায়ের ভক্তেরা মন্দির ও বিগ্রহের এই অত্যাচার অবমাননা কি করিয়া সহ্য করেছে? আমি সে সময়ে উপস্থিত থাকলে কিছুতেই এটা ঘটতে দিতুম না, নিজের প্রাণ আহুতি দিয়ে করতুম মায়ের মন্দির রক্ষা।"

সহসা শোনা যায় এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর!—"ওরে, আমার মন্দির ভেঙ্গেছে, তোর তাতে কি? তুই কি আমায় সর্ব্বত্র রক্ষা করিস,—না আমিই তোকে রক্ষা করি? আমার ইচ্ছায় কি এখানে সাত-তলা স্বর্ণখচিত মন্দির এখনি গড়ে উঠতে পারে না?"

বিবেকানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। এই দৈববাণীর আঘাত তাঁহার অন্তর-সত্তায় তুলিল প্রচণ্ড আলোড়ন। সত্যই তো। আদ্যাশক্তি, জগজ্জননী যিনি, সর্ব্বশক্তির উৎস যিনি, তাঁহার শক্তিকে এমন সীমিত বলিয়া তিনি ভাবিবেন কেন? কেন তাঁহার এই ধৃষ্টতা? মায়ের নিরাপত্তা বিধান তিনিই করিবেন, কেনই বা তাঁহার এই অংহবোধ? মায়ের সংসার মা-ই তো চালাইয়া থাকেন। পরাশক্তি তিনি—তাঁহার শক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত। গ্রহ-তারা দল তাঁহারই প্রেমের সূত্রে গাঁথা। তাঁহারই জ্ঞানে সর্ব্বসৃষ্টি চৈতন্যময়, স্পন্দিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে, ক্ষুদ্র অঙ্গনে ক্রীড়ারত শিশু, এই বিবেকানন্দের শক্তি সত্যই কতটুক?

ক্ষীরভবানী মন্দিরের অলৌকিক অভিজ্ঞতা স্বামীজীর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া দেয়। শ্রীনগরে যখন ফিরিলেন, সঙ্গীরা তাঁহার চোখে মুখে দিব্য জ্যোতির আভা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

দেবী ভবানীর প্রসাদীফুল সকলের মাথায় ঠেকাইয়া, ভাব গদ্‌গদ স্বরে, বিবেকানন্দ বলিলেন, "ওরে, এখন আর 'হরি ওঁ' নয়। এখন আমার শুধু—'মা' আর 'মা'। মা যে নিজে আমায় বৃহত্তম সত্যটি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর সংসার তিনি নিজেই দেখছেন, আমার কেন একে রক্ষা করবার এমন স্পর্ধা? তবে স্বদেশের ভাবনা ভাব্‌বারই বা আমার কি দরকার? ব্রহ্মময়ী মায়ের কোলে আমি যে একটি ক্ষুদ্র সন্তান মাত্র!"

তারপর বিস্ময়াবিষ্ট শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর যা

কিছু বলবার ব্যাপার আছে—তা প্রকাশ করতে পারছিনে। বলার আদেশ নেই!"

সকল মায়িক আবরণের ঊর্দ্ধে নিজের অধ্যাত্ম-সত্তাকে প্রসারিত করিয়া দিতে বিবেকানন্দ এবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনের চারিদিকে বহুতর কর্ম্মের তন্তু জড়ানো। ক্ষীর-ভবানীর কল্যাণ-বাণী আজ সেগুলি শিথিল করিয়া দিল।

অন্তরের অন্তস্তলে স্বামীজী উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন, আর তিনি কোন ধর্ম্মান্দোলনের স্রষ্টা নহেন, জননেতা নহেন, তিনি এখন সর্ব্ব মায়ামোহ-ছিন্ন সন্ন্যাসী—জগজ্জননীর কোলে উপবিষ্ট তিনি এক বৈরাগী বালক!

ধ্যানতন্ময় স্বামীজী এই সময়ে প্রায়ই একলা থাকিতে পছন্দ করিতেন। ভাবাবেশে মাঝে মাঝে কোথায় কোন্ সুদূরে যেন অদৃশ্য হইয়া যাইতেন।

একদিন সঙ্গীরা বিস্মিত হইয়া দেখেন, কোথা হইতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া এক দীন সন্ন্যাসীর বেশে তিনি আসিয়া উপস্থিত। মুখে স্বরচিত—'জননী মহাকালীর' শ্লোকগাথা। মায়ের প্রলয়ঙ্করী শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছ্যাখ্, এর প্রত্যেকটা কথা সত্য। আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি। ছ্যাখ্ আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।"

মায়ার সূক্ষ্মতম আবরণ তিনি দূর করিয়াছেন, সর্ব্ব বন্ধন-জাল করিয়াছেন ছিন্ন,—এই কি তাঁর মৃত্যুবরণ?

বেলুড়ে সেদিন মঠ স্থাপনের উৎসব দিবস। গঙ্গাস্নান করার পর স্বামীজী ঠাকুরের ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্র আধারটি শিরে বহন করিয়া চলিলেন। নূতন মঠে করা হইল ইহার প্রতিষ্ঠা।

এই সময়ে তিনি এক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর আমায়

বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাবো, সেখানেই থাকবো—সে গাছতলাই কি আর কুঁড়ে ঘরই কি ?' সেজন্যেই আজ আমি নিজেই এই আত্মারামের কৌটা মাথায় বয়ে নিয়ে এলাম।"

মঠের ব্রহ্মচারী শিষ্যদের অন্তরে সন্ন্যাস জীবনের ত্যাগপূত মহিমা স্বামীজী সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতেন। জীবসেবার মূল তত্ত্বটিও তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। তাঁহার তেজোগর্ভ বাণীতে তরুণ শিষ্যদের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিত ত্যাগ ও আত্মবিশ্বাসের অগ্নিশিখা।

উৎকর্ণ হইয়া তাহারা শুনিত স্বামী বিবেকানন্দের অভয় বাণী, "ওরে, ভয় পাস্‌নে। জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলো আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাস। প্রকৃত বিশ্বাসই ভেতরকার দৈবীশক্তিকে জাগ্রত করে তোলে।···মনে রাখিস্, গুটিকয়েক শক্তিমান লোক জগৎ টলমল করে ফেলতে পারে !"

স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাঁহার গুরুর নামাঙ্কিত মঠ ও মিশন ছিল জীবসেবা ও ঈশ্বরোপলব্ধির পবিত্রভূমি। ইহাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গৌরবকে কোন মতেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। এ বিষয়ে একদিন দৃপ্তভঙ্গীতে তিনি তাঁহার মতবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন—"গ্যাখো, মঠের ব্যাপারে কিন্তু গৃহস্থদের কোনই কর্ত্তৃত্ব চলবে না। সন্ন্যাসীরাও টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখবে না। গরীবদের সাথেই তাদের কারবার। গরীবদেরই যত্ন করবে, ভালবাসবে ও যথাসাধ্য সেবা করবে। এ দেশের অধিকাংশ মঠ ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বড় মানুষের দাসত্ব করেছে—তাদের দয়ার উপর নির্ভর করেছে, তাই তো তারা উচ্ছন্ন গেছে। প্রকৃত সন্ন্যাসী তাদের ত্রিসীমায় যাবে না। কাম-কাঞ্চনের দাস যারা, তারা কি করে কাম-কাঞ্চনত্যাগীর প্রকৃত শিষ্য, প্রকৃত বান্ধব হতে পারে ?"

তরুণ ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস নিষ্ঠার প্রতি বিবেকানন্দের দৃষ্টি ছিল

সদা জাগ্রত, শাসন ছিল অতি কঠোর। তিনি বলিতেন, "একথাটা যেন ভুলো না। যখন দেখবে সন্ন্যাস-আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়ছ, এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অনুপযুক্ত, তখন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা বরং ভাল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করা অনুচিত। সকালে উঠবে, ধ্যানজপ করবে, আর খুব তপস্যা লাগাবে। স্বাস্থ্য আর সময়মত খাওয়া-দাওয়ার উপর নজর রাখবে। আর কথাবার্ত্তা কইবে শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে। সাধনাবস্থায় এমন কি খবরের কাগজ পড়া বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাও সমীচীন নয়।"

সাধনার্থী তরুণ ব্রহ্মচারীদের জন্য এমন কঠোর বিধিনিয়মই এ সময়ে তিনি প্রবর্ত্তন করিয়া যান।

সে-বার কাশ্মীরের তীর্থদর্শন হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী দেখেন একটি তরুণ ব্রহ্মচারী মা-সারদামণির আশ্রমে কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিতেছে। ব্রহ্মচারীটি সৎ এবং শুদ্ধসত্ত্ব, কিন্তু স্বামীজী কাহারো কথায় নিবৃত্ত হইবার পাত্র নন। তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীমায়ের আশ্রমে নারী ভক্তগণ বাস করিতেন, শ্রীমাকে দর্শনের জন্যও মহিলাদের সমাগম ছিল। ব্রহ্মচারী ভক্তদের পক্ষে এই নারী সান্নিধ্যকে স্বামীজী ক্ষতিকারক মনে করিতেন। এমনই ছিল তরুণ সাধকদের সম্পর্কে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের নৈষ্ঠিক বিধান। এই ভর্ৎসনার পর অবিলম্বে মায়ের আশ্রমের কাজে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকেই নিযুক্ত করা হয়।

'শিববোধে জীবের সেবায়' মঠের কর্ম্মীদের বিবেকানন্দ সদাই অনুপ্রাণিত করিতেন। ভাবময় উদাত্ত কণ্ঠে কহিতেন,—"ওরে, সর্ব্ব-জীবের সমষ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানেই আমি বিশ্বাস করি। সকল জাতির যারা দুর্ব্বৃত্ত, দরিদ্র ও নিপীড়িত তারাই যে আমার ভগবান। এই ভগবানের জন্য আমি বারে বারে জন্মাতে চাই; এজন্য জন্ম জন্ম দুঃখ পেলেও আমার খেদ নেই।"

যুগ যুগ ধরিয়া এদেশের নরম মৃত্তিকায় ভাবালু ও কোমল

মানুষের জন্ম হইয়াছে। কঠোর সংযম, নিষ্ঠা ও শক্তির অভাবে অনেক কিছু মহতী প্রচেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে। তাই নবীন সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী তাঁহার সতর্ক বাণী বার বার উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

আজীবন বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখিয়াছেন; সে স্বপ্ন সফল করার জন্য করিয়াছেন জীবনপণ। তিনি চাহিয়াছেন, আত্মত্যাগী সর্ব্বস্ব-পণকারী শত শত তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহাকে করিবে অনুসরণ। ভারতের আত্মিক উজ্জীবনে, তাঁহার ধ্যানের ভারত গঠনে তাহারা করিবে জীবনপাত। সে স্বপ্ন তাঁহার সফল হয় নাই, ধ্যানকল্পনা রূপায়িত হয় নাই। কিন্তু বিবেকানন্দের অভ্যুদয় কি ব্যর্থ হইয়াছে? তাহা তো হয় নাই। তাঁহার বিপুল অধ্যাত্মশক্তি ও কর্ম্মব্রতের মধ্য দিয়া ভারতাত্মা সেদিন জাগিয়া উঠে—ধর্ম্ম ও সমাজে উঠে নূতনতর প্রাণ-স্পন্দন। আর সমাজের সংস্কার ও ধ্বংসের পরিবর্ত্তে জাগিয়া উঠে সৃষ্টিধর্ম্মী দৃষ্টিভঙ্গী। সনাতন অধ্যাত্ম-জীবনের উৎস হইতে প্রাণশক্তি আহরণে জাতি প্রবৃত্ত হয়। এই জাগরণের পরোক্ষ ফলশ্রুতি বাংলার অগ্নিযুগের মুক্তিপ্রয়াস, তিলক ও গান্ধীজীর মুক্তি-সংগ্রাম। স্বামী বিবেকানন্দের আন্দোলনের ফলে ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যের বোধও সবার অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য নাগমশাই একদিন বেলুড় মঠে বিবেকানন্দকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। নাগমশাই ছিলেন ভক্তি ও দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। এই সাধক সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, "গ্যাখো, সারা পৃথিবীটা ঘুরে এলাম কিন্তু নাগমশাইর মত মহাপুরুষ চোখে পড়লো না।"

বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয়ের এই সাক্ষাতের পটভূমিকায় স্বামীজীর অধ্যাত্ম-পরিচয়টি ভক্ত ও দর্শনার্থীদের কাছে সেদিন স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

নাগমশাই স্বামীজীর চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত

হইলেন। "ও কি করছেন, ও কি করছেন,"—বলিয়া স্বামীজী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নাগমহাশয় করজোড়ে বলিয়া উঠেন, "আমি যে দিব্যচক্ষে দেখছি—আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষুধা একেবারে দূর হয়ে গেল। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ! জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ!"

বেদান্ত পাঠ নিরত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের স্বামীজী আহ্বান করিলেন। মুক্তপুরুষ নাগমশাই ঠাকুরের কথা আজ ইহাদের কিছু শুনাইবেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। কিন্তু অহং-বোধ বিরহিত সাধু নাগমশাইকে দিয়া এসব বলানো সুকঠিন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি আর কি বোলবো, আমি আর কি বোলবো? আমি এখানে শুধু দেখতে এসেছি—ঠাকুরের লীলার সহায়ক মহাবীরজীকে দেখতে এসেছি। জয় রামকৃষ্ণ!"

কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর নাগমহাশয় আবার কহিলেন, "আপনাকে কে বুঝবে? দিব্যদৃষ্টি না খুললে তো চেনবার যো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে, তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কিছুই বোঝে না।"

সিংহবিক্রম, ভুবনবিজয়ী যোদ্ধা সন্ন্যাসী মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মহিমার উন্নত শিখর হইতে নামিয়া আসেন। বালকের সরলতা ফুটিয়া উঠে চোখে মুখে। বিনয় নম্র বচনে প্রবীণ গুরুভাইকে বলেন, "নাগমশাই, কি যে কর্‌ছি, কি না কর্‌ছি—কিছুই বুঝতে পারছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, আর সেই মত কাজ করে যাই। এতে ভাল কি মন্দ হচ্ছে—কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, "মনে নেই? ঠাকুর যে বলেছিলেন, চাবি দেওয়া রইল। তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝা মাত্রই যে লীলা ফুরিয়ে যাবে!"

গুরুর চরণে নিবেদিত-প্রাণ নাগমশাই ছিলেন এক সিদ্ধপুরুষ। দৈন্য ও আত্মগোপনতার আড়ালে অবস্থিত এই মহাপুরুষকে

বিবেকানন্দ ভালরূপেই চিনতেন। তাই স্বীয় আরব্ধ কার্য্যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ সেদিন তিনি চাহিয়া নিলেন।

১৮৯৯ সালের মধ্যভাগে স্বামীজীকে আর একবার আমেরিকা ও ইউরোপে যাইতে হয়। পাশ্চাত্য-বিজয়ের সে পূর্ব্বতন উৎসাহ উন্মাদনা এবার নাই। এবার শুধু কর্ম্মকেন্দ্রসমূহের তত্ত্বাবধান ও সংগঠনের পালা। পাশ্চাত্যের দ্বারে আগের বার যে আশা পোষণ করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন, অনেক দিন হয় সে আশাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃত স্বরূপ আজ তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত। ইহারই উল্লেখ করিয়া স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন,—"পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা যেন এক অট্টহাস্যের মত—কিন্তু তাহার তলায় রয়েছে মর্ম্মভেদী কান্না। এর পরিণতিও কান্নাতেই। হাসি, ঠাট্টা তামাসা যা কিছু সব রয়েছে উপরিভাগে, কিন্তু ভিতরটা এর বড়ই করুণ। আর ভারতে উপরেই যত বিষাদ, যত কান্না—ভিতরে আছে নির্ব্বিকার এক পরম চেতনা, আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ!"

মহান কর্ম্মযোগী বিবেকানন্দের ব্রত উদ্‌যাপনের সময় যেন নিকটতর হইয়া আসিয়াছে। রামকৃষ্ণের জ্যা-মুক্ত তীর কি এবার তাহার গতিবেগের শেষ প্রান্তে আসিয়া পোঁছিতেছে? স্বামীজীর ভক্ত শিষ্যা মিস্ ম্যাকলিয়ডের নিকট লিখিত পত্রে তাঁহার তৎকালীন মানসিকতা কিছুটা বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন—"আমি ভালই আছি। লড়াই-এ হার জিত দুই-ই হলো, পুঁটলী-পোঁটলা বেঁধে সেই মহান 'মুক্তিদাতার' প্রতীক্ষায় বসে আছি। অব্ শিব পার কর মেরে নাইয়া—হে শিব, আমার তরী এবার পারে নিয়ে যাও, প্রভু!···যতই যা হোক, আমি যে এখনও পূর্ব্বের সেই বালক বই আর কেউ নই—যে বালক দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি তলায় শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী অবাক হয়ে শুনতো, আর বিভোর হয়ে

যেতো। সেই তো আমার সত্যিকারের স্বভাব! কর্ম্ম আর অপরের কল্যাণ, সেগুলো আমার বহিরাবরণ মাত্র। এবার আবার তাঁর ডাক শুনতে পাচ্ছি, সেই চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর—যা স্মরণ হলেই মন আনন্দে নেচে ওঠে।—বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মমতা উড়ে যাচ্ছে, কর্ম্ম আজ বিস্বাদে ভরা। জীবনের মোহ কেটেছে—রয়েছে তার স্থলে কেবল আমার প্রভুর আহ্বান ধ্বনি। যাই প্রভু, যাই। ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতের দলই করুকগে, তুই ও সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু পিছু চলে আয়।' যাই প্রভু যাই!"

"হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক চলেছি। সম্মুখে অনন্ত শান্তিময় নির্ব্বাণ সমুদ্র! মায়ার এতটুকু তরঙ্গভঙ্গ তার শান্তি বিঘ্নিত করছে না!···সেই শিক্ষাদাতা, গুরু নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ কিন্তু আজ আর নেই। পড়ে আছে শুধু পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর চির-শিষ্য, গুরু চরণাশ্রিত চির-ভৃত্য!···এতদিন আমার কর্ম্মের মধ্যে মান-যশের ভাব উদ্‌গত হত, ভালবাসার মধ্যে পাত্রাপাত্র বিচার আসতো, পবিত্রতার পশ্চাতে থাকতো ফলভোগের সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা। আমার নেতৃত্বের ভেতর প্রভুত্বের স্পৃহাও আসতো। এখন সে সব অন্তর্হিত হয়েছে—আমি উদাস প্রাণে ভেসে চলেছি। যাই মা, যাই। তোমার স্নেহ কোমল কোলে উঠে, তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছো সেই চির-নীরব অরূপ অজ্ঞাত রাজ্যে। অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে, কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত সরে যেতে আমার আজ আর কোন দ্বিধা নেই।"

বিশ্ববন্দিত পরাক্রমশালী আচার্য্যের, যোদ্ধা সন্ন্যাসীবীর বিবেকানন্দের এ কোন্ দুর্জ্ঞেয় পথযাত্রার সঙ্কেত! রামকৃষ্ণের সেই প্রহেলিকাময় "চাবী" কি পরাশান্তির তোরণ-দ্বার আজ উন্মুক্ত করিতে চাহিতেছে?

স্বামীজী স্বদেশে বেলুড় মঠে এবার ফিরিয়া আসিলেন। কর্ম্মমুখর

জীবনের গতি আজ স্বর্গীয় আনন্দেরও চির প্রশান্তির দ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মঠের হাঁস, গরু, ছাগলছানা মটরু আজ তাঁহার খেলার সাথী, কুকুর 'বাঘা' তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর। এ যেন দিব্যসত্তায় মণ্ডিত এক মানব শিশু, অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পরিপক্কতার ফলে ইহা পেলব, নিটোল ও রসমধুর। ব্রহ্মচারীর দল ও গুরুভ্রাতারা তাঁহার আননের স্বর্গীয় আভা দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকেন।

ক্লান্ত দেহে রোগের প্রকোপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। শেষের দিনটি সমাগত—তরঙ্গায়িত দুর্ব্বার নদী এবার মহাসাগরে আত্মবিলুপ্তির জন্য প্রতীক্ষমান। স্বামীজী যেন তাহার পরম সত্তার সহিত মুখোমুখি পরিচয় সাধন করিয়াছেন, প্রশান্ত হৃদয়ে বসিয়া আছেন মহামিলনের প্রতীক্ষায়। সেবারত ভক্তের সাহায্যে পঞ্জিকার কি একটা বিশিষ্ট দিন তিনি দেখিয়া রাখিলেন। অপরাহ্নে একদিন মঠের ময়দানে ধীরপদে বেড়াইতেছেন। সহসা থামিয়া যান, গম্ভীর স্বরে সঙ্গী ভক্তকে একটি বিশেষ স্থান অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলেন, "তোরা ঐখানেই আমার দেহের সৎকার করিস্।"

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই। বিবেকানন্দের প্রতীক্ষিত দিবসটি আসিয়া গিয়াছে। এবার তাঁহার বিদায়ের পালা। ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইলেন মহাসমাধিতে।

মনীষী রম্যাঁ রলাঁ সেদিনকার এই মহাপ্রয়াণের মধ্যে দেখিয়াছেন এক নূতন সম্ভাবনা, নূতন কল্যাণের ইঙ্গিত। অনুকরণীয় ভাষায় তিনি বলিয়াছেন ঃ

"বিবেকানন্দের নিকট জীবন ও সংগ্রাম ছিল একার্থ বাচক। তাঁহার জীবনের দিনগুলিও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। রামকৃষ্ণের ও তাঁহার এই মহান শিষ্যের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ষোল বৎসর। কিন্তু এই অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিবেকানন্দ প্রজ্বলিত

করেন অগ্নিময় উদ্দীপনা। তারপর চল্লিশ বৎসরেরও কম বয়সে এই মহান যোদ্ধা চিতা-শয্যা গ্রহণ করেন।

"কিন্তু সে চিতাগ্নি আজিও নির্ব্বাপিত হয় নাই। প্রাচীনকালের ফিনিক্স পক্ষীর মতই তাঁহার চিতাভস্ম হইতে নূতন করিয়া উত্থিত হইয়াছে ভারতের বিবেক—এ যেন কিম্বদন্তীর আর এক ইন্দ্রজালময় পক্ষী। এ বিবেকময় বাণী উত্থিত হইয়াছে ভারতের শাশ্বত, সাধনময় জীবন হইতে, মনুষের আশা ও প্রত্যয় নিহিত রহিয়াছে ইহাতে। এই বাণীর কথা ভারতের প্রাচীন ধ্যানী ও দ্রষ্টার দল বৈদিক যুগ হইতে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন। এই বাণীর নিহিতার্থ আজ ভারতবাসীকে উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে, ছড়াইয়া দিতে হইবে অবশিষ্ট মানবজাতির মধ্যে।"
